নীল সায়রের শালুক

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ · শ্রাবণ ১৩৭২

প্রকাশক ঃ
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ প্রণবেশ মাইতি .

মুদ্রাকর ঃ
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি, রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

নীল সায়রের শালুক

এক

পাতার ঘর, বাঁশের খুঁটি

ছোট্ট এই খালটির ওপরে কংক্রিটের ব্রিজটা আগে ছিল কাঠের সাঁকো। দেশভাগের কিছু কাল পর থেকে, সব জিনিসের মত কাঠ মহার্ঘ হতে, মাঝে মাঝেই তক্তাগুলো চুরি হয়ে যেত। কয়েকবার নতুন করে লাগাবার পর, বোধহয় হয়রান হয়েই এটা কংক্রিটের করা হয়েছে। মনে আছে, এটা কংক্রিটের হওয়ার বছরই আমি এদেশ ছেড়েছিলাম। রাস্তাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই ব্রিজটা বেশ পোক্ত করেই করা হয়েছিল। আগে রাস্তাটা কাঁচাই ছিল। বেশ কয়েক বছর হলো অ্যাসফল্টের হয়েছে নাকি। এখন ছোটো খাটো গাড়িটাড়িও চলাচল করে। বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদিও এসে গেছে। রাস্তাটা এ দিগড়ে যত গ্রাম আছে, সেগুলোর সঙ্গে শহরের এবং বাকি দেশের যোগাযোগ রক্ষা করে। সবচেয়ে কাছের যে শহরটায় গিয়ে রাস্তাটা মিশেছে; সেটা এখন জিলা সদর হয়েছে এবং ক্রমাগত আশপাশের গ্রামগুলো গিলে গিলে তার গতর বাড়াচ্ছে। আমাদের ছোটবেলায় সেটা ছিল একটা গঞ্জ, আমরা বন্দর শহর বলতাম! কতই যে পরিবর্তন হয়েছে! অনেক অনেক আগে, আমার চৌদ্দ পুরুষ এই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল, আমিও। অথচ আজ আমাকে, এই সকালে ব্রিজটার ওপর দাঁড়ানো দেখে, আসা-যাওয়া পথের মানুষেরা কেউই চিনতে পারছে না। শুধু প্রশ্নভরা চোখে খানিক তাকিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার ব্যাপারটা আলাদা। মনে হচ্ছে, সবাইকেই চিনি, কিন্তু নাম পরিচয় মনে নেই।

প্রায় চার সাড়ে চার দশক পর এখানে এসেছি। মাঝে দু-একবার এসেছি, তবে সে সামান্য সময়ের জন্য। তাকে ঠিক আসা বলা যায় না। ঠিকমত ভেট মোলাকাত বা আড্ডা না হলে কী তাকে আসা বলে?

শহর থেকে হাঁটা পথেই আসছিলাম। ভোর ভোর তাই বেড়িয়ে পড়েছি। ছোটবেলায় এরকমই অভ্যাস ছিল। এখন অন্য উপায় থাকলেও ইচ্ছে হলো না। তাই ছোটবেলার পায়ে হাঁটার চলার ইচ্ছেটা চাখ্‌তে চাখ্‌তে তখনকার স্মৃতির

সঙ্গে আজকের রাস্তা, গাছপালা, খানাখন্দের মিল খুঁজতে খুঁজতে প্রায় মাইল তিনেক রাস্তা পাড়ি দিয়ে এখন এই ব্রিজটার ওপর। রাস্তাটা এখন দিব্য হয়েছে, কিন্তু সেদিনের আত্মীয়তটা বোধ করছি না। এরকমই নিয়ম। এরকমই হয়ে থাকে।

ব্রিজটায় ওঠার ডান হাতি নীচের দিকে নামার একটা সরু পায়ের তৈরি পথ প্রায় খালটার গা ঘেঁষে। এই গ্রামটার নাম আদোকাঠি। এখানকার বেশিরভাগ গ্রাম নামের উত্তরপদ কাঠি বা কাটি। জঙ্গল কেটে আবাদ করে গ্রামগুলোর পত্তন হয়েছিল বলে কাটি। 'পাশা' কথাটিও আছে। সঠিক মানে জানি না। তবে চাঁটগাঁয়ের লোকেরা গাঁয়ের প্রান্ত বোঝাতে 'পাশা' শব্দটা ব্যবহার করে। বোধহয় সেরকম কোনো অর্থ হবে। যাক্‌গে। 'আদো' অর্থে আধা। মনে হয় গ্রামটি পত্তনের সময় আধাআধি জঙ্গল সাফ হতে না হতেই, পাশের বড় গ্রামটি বেশি এলাকাটা গিলে নিয়েছিল, ফলে এটি আর প্রমাণ মাপের হয়ে উঠতে পারেনি। এখনো কেউ একে একটা পুরো গাঁয়ের হিসাবে ধরে না। বলে, খান চাইর পাচ্‌ বাড়ি, আদোকাডি আবার এট্‌টা গেরাম, হুঁ! হেলেতো এই বাজারডারেও শহর টাউন কইতে হয়।

ব্রিজের খাড়াই থেকে পথটা ধরে সমতলের প্রথম বাড়িটাই ছিল নিরঞ্জন বৈদিকের নতুন বাড়ি। বাড়িটা নেই। কিন্তু ভিতটা খানিক আছে বলে, আমার মনটা গভীর এক বিষণ্ণ স্মৃতির অতলে ডুব দিল। বিশেষ করে মনে পড়ল নিরঞ্জনের বিয়ের দিনের কথা। এই ঘরটির সঙ্গে তার বিয়ের একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। ওর বিয়েটা আমরাই ঘটিয়েছিলাম। ঘরটা ছিল সে কারণে যৌতুক। সে অনেক কথা। গল্প সেটাই। অথবা, সঠিক বললে, গল্পটা মূলত তার বৌ সন্নর বিষয়ে।

যখনকার কথা বলছি, তখন আমাদের সদ্য শিঙ ওঠা যণ্ড বয়স। সেটা গত শতকের একষট্টি বাষট্টি, কী তার এক আধ বছর আগের কথা, ঠিক স্মরণ নেই। হিন্দু গেরস্ত শূন্য গ্রামগুলোর অবস্থা তখন যারপরনাই নিস্তরঙ্গ। উদ্যম, আনন্দের ছিটে ফোঁটাও প্রায় নেই বলা চলে। গরীব মুসলমান চাষিদের গ্রামগুলোও তথৈবচ। তাদের আমোদ আহ্লাদওতো এইসব হিন্দুগ্রাম নির্ভর ছিল। নইলে তাদের আর আলাদা আমোদ আহ্লাদ কী? ঈদ আর বকরিদ্‌ অবশ্য ছিল। কিন্তু তখন এই হত দরিদ্র মানুষ গুলি কতোটাই বা তাঁর আয়োজন করতে পারত। ভদ্রশিক্ষিত পরিবারগুলো দেশ ছাড়া, গ্রাম ছাড়া হওয়ায় বার মাসের তেরো লোকাচার প্রায় লুপ্ত। আমরা তখন সবে মেট্রিক পরীক্ষা শেষ হতে পোড়ো বাড়িতে যেন ছাড়া গরু। বয়সোচিত উত্তেজক কিছু না থাকায় সদা ছট্‌ফটানি। বছর কয়েক আগেও আশপাশ গ্রামগুলোতে বেশ কিছু বুড়োবুড়ি ছিল। ফি বছরে

দুচারটে মড়া পোড়ানোর দিব্যি মওকা জুটে যেত। তাছাড়া কলেরা বসন্তের মরশুমে এই জনসেবাটাতো দেদার জুটত। একটা শেষ হতে না হতে, আরেকটা হাজির। দেশে কলেরা ইনজেকশান, টীকা এবং টিউব-ওয়েলের কল্যাণে সে দিকটাও কানা। থাকার মধ্যে আছে বর্ষা, শীতের রাতবিরেতে ডাকাতির হিড়িক। তাও ইদানীং বোমা বন্দুকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের ক্ষাত্রবীর্যে ভাটা পড়েছে। এককথায় নিষ্কর্মার ধাড়ি হয়ে বসে থেকে থেকে হাড়ে জঙ্ ধরে গেছে। বয়সে যারা একটু বেশি ডাঙর, তাদের অবস্থা আরো খারাপ। উপযুক্ত বয়স্থা পাত্রী না থাকায় বে'থা হচ্ছে না। নিদেন প্রেম পিরীতিরও সুযোগ নেই, উঠতি ছুকরিরা সবাই বয়সে সেই বঙ্কিমের 'রাধারাণী'। ফলে, সেগুলো সব এঁচড়ে পাকার হদ্দ। তাদের দোষ নেই। মধুর অভাবে গুড়কে মধু হিসাবে ব্যবহার করলে, গুড়ের মধুভাব প্রকট হবে, এতো স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বত্রই একটা অ-তৃপ্তির বাতাবরণ।

এরকম একটা সময়েই আমরা নিরঞ্জনের বিয়েটা ঘটিয়েছিলাম। স্মৃতিচারণটা তাহলে খুলেই করি। বলাটা একটু হয়তো ছ্যাদ্‌রানো হবে, তবু পুরোনো কথাতো, তার আলাদা একটা সোয়াদ, আমেজ থাকেই। আসলে এই গোটা আলেখ্যেই বিয়েটা একটা বড়ো ব্যাপার। সেসব একেকটা একেক ধরনের। তবে নিরঞ্জন-সন্নের বিয়েটাই আসল।

রমণী ঠাকুরের বাড়িটা ছিল একটু তফাতের যৌশর গ্রামে। সন্ন তার বড় মেয়ে। বয়স বছর পনেরো হয়েছে কী হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে এমন হৈচৈ শুরু হয়ে গেছিল যে রমণী ঠাকুর তার বিয়ে দেবার জন্য একেবারে হন্যে। কিন্তু এ ব্যাপারে তার দুটো সমস্যা ছিল। অর্থ সামর্থ্য এবং উপযুক্ত পাত্রের অভাব। পেশা হিসাবে প্রধান ছিল ভিক্ষে করা, আর কালেভদ্রে এলাকার একমাত্র রাঁসুয়ে বামুন ভজন চক্কোত্তির অ্যাসিস্ট্যান্টগিরি। একসময়ে গঞ্জের বিখ্যাত নাথ কোম্পানি যাত্রা পার্টির বিবেকের গান গাইত। তখন অবস্থা খারাপ ছিল না। এখন আর সামর্থ্যে কুলোয় না। বয়স হয়েছে। তাই ভিক্ষেই সম্বল। যাত্রার দলটারও অবস্থা মন্দ যাচ্ছে। কাঠ মোল্লাদের দাবড়ানিতে প্রায় উঠে যাবার জোগাড়। তাছাড়া উদ্যোগী মানুষেরও অভাব। সিনেমার ছড়াছড়ি, তবু ভাগ্যে গলাটা ছিল, আর গানের পুঁজি ছিল ঢের, তাই ভিক্ষেটা খারাপ মিলত না, কিন্তু ক্রমশ হিন্দু গ্রামগুলো আরও নিশূন্য হওয়ায়, এখন ভিক্ষে পাওয়াটাও দুর্লভ। ব্রাহ্মণ সন্তান, মুসলমান গ্রামে ভিক্ষে করতে যাওয়াটা জাতধর্মের ব্যাপার। তাছাড়া ওরা ভিখারিকে খয়রাতি বলে ডাকে। রমণী ঐ ডাকটা একেবারেই পছন্দ করে না। কারণ হিন্দুরা, বিশেষত, বামুনরা ভিক্ষেটাকে যেমন একটা মহৎ

কর্মের স্তরে স্থান দিয়েছে, মুসলমানেরা ততটা দেয়নি। অথচ ভিক্ষে দেওয়ার মতো হিন্দুও নেই। এমন মানুষের মেয়ের বিয়ে দেবার উপায় কী? কিন্তু সন্ন যেরকম বে-এক্কেলে বাড় বেড়ে উঠছিল, তাতে কবে যে কী কেলেঙ্কারী ঘটে যাবে সেই চিন্তায় রমণী বড়ই ক্লিষ্ট ছিল। ঐ সময়টায় আবার যেসব বাড়িতে একটু ডাগুর মেয়েবৌ থাকত, সেখানেই ডাকাতি হতো বেশি। টাকা পয়সা না থাকলেও। এই সময়কার ডাকাতরা পয়সার চাইতে যুবতী, আধাযুবতী মেয়েদের লোভেই বেশি ডাকাতি করত। সুতরাং সেও একটা চিন্তা। ডাকাতি ব্যাপারটা ও দেশে কোনো কালে কম হতো না, কিন্তু সেকালের ডাকাতরা নাকি মেয়েদের খুব সম্মান-করতো, মা বলে ডেকে গয়নাগুলো চাইতো। বেশ একটা আবদেরে ব্যাপার ছিল সেটা। সেদিন আর নেই।

গ্রামে তখন কুল মেল অনুযায়ী স্ব-জাতীয় পাত্রের বড় অভাব। কারণ সবাই প্রায় দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে। যারা আছে তারা রমণীর মতোই হয় ছন্নছাড়া অথবা অন্য জাতের। তখনও অসবর্ণ বিয়ের চল তেমন নেই। শহর নগরে দু একটা ঘটলেও গ্রামে তা কেউ চিন্তাও করে না। জাত, সমাজ ইত্যাদির দাপট, তা নিয়ে ঘোঁট তখনও বেশ প্রবল। তাছাড়া রমণী ঠাকুর ভিক্ষে করলেও, জাতের ব্যাপারে বেজায় খুঁতখুঁতে। কথায় বলে, ফ্যালাইয়া ছড়াইয়া বাওন। নচেৎ সন্নকে বিয়ে করার জন্য আগ্রহী পাত্র একেবারে যে পাওয়া যেত না, এমন নয়। তার দুএকজন প্রেমিকও ছিল। তারা ভিন্ন জাতের বলে রমণীর কাছে প্রস্তাব করার কথাই ভাবেনি। জানত, লাভ নেই। রমণী বলতো, মোরা হইলাম শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বাওন, বেজাতে কইন্যা দিমু?

রমণী শেষ পর্যন্ত জেরবার হয়ে, মেয়ের বিয়ে ঠিক করল গঞ্জ ছাড়িয়েও কয়েক ক্রোশ দূরের গ্রাম 'ষাইট পাইক্যার' এক বাষট্টি না পঁয়ষট্টি বচ্ছরের ঘাটের মড়া দীনু ঘোষালের সঙ্গে। দীনুর নাকি তিন তিনটে ছেলে, যাদের বয়স তেত্রিশ থেকে তেতাল্লিশ। তারা সবাই বিবাহিত এবং প্রত্যেকেরই সন্তানাদি বেশ ডাগুর ডাগুর। কিন্তু ব্রাহ্মণী গত হওয়ায় দেহে মনে সুখ নেই। ছেলে, বৌ এরা নিজেদের আর তাদের পুষি পোনাদের নিয়ে ব্যস্ত। ভেবেছিলেন সঙ্গতি যখন আছে আরেকটা বিয়ে করলে কেমন হয়। কিন্তু ছেলে, বৌদের 'কু-আচার' 'কুচরিত্তিরের' জন্য কিছুতেই তা হয়ে উঠছিল না। একবারতো একটি বেশ 'কড়ে কাচা' দেখে রাড়িও রেখেছিলেন। তা সে ব্যাপারটা তখনও এ অঞ্চলে যথেষ্টই জলচল ছিল, অবশ্য সঙ্গতি থাকলে। নয়তো আওয়াজ খেতে হতো, 'আপনা কইতে নাই ঠাই, কেডি পালেরন বগ্গা!' কেডি অর্থে কুত্তি। পুষতেই যদি হয় তবে, তা হতে হবে স্ত্রী জাতীয় প্রাণী। তা রাড়ি পোষার ব্যাপারে যে ছেলে

বৌদের কোনো বিরোধ ছিল এমন নয়। 'থাক্ বুড়া তুই রসে মজইয়া, তোর রাড়ি লইয়া, হেথে মোগো লোমা। বরং হে ব্যাফারডা বেয়াক দিক দিয়াই উপকারী। অন্তত, বুড়ইয়ার স্যাবাযত্তনের লইগ্যাতো চিন্তা থাকপে না। কিন্তু বেজাত হলে চলবে না। ঐ রাড়িটি জাত্যংশে ভুঁইমালি। ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা। একটা অচ্ছুৎ জাতের মাগী, তাকে নিয়ে রসাচার? ক্যান, দ্যাশে কী একটাও বাওন টাওনের কাচা রাড়ি নাই। অবশ্য এটা তাদের অন্যায়। রাঁড়ি রাখার ব্যাপারে জাত সমস্যা হবার কথা নয়। সেক্ষেত্রে 'স্ত্রীরত্নম্ দুষ্কুলাদপি।' সর্ব শাস্ত্রে আছে।

গ্রামের নাম যাইট পাইক্যা, মানে ষাটজন পাইকের নাকি বসতি ছিল একদা ঐ গ্রামে। তো সেই গ্রামের সম্পন্ন ব্রাহ্মণ সন্তান যে সাতিশয় বীর্যবান বরকন্দাজি মনুষ্য হবেন, এতে আর বিচিত্র কী? তবে বয়সটা—, কিন্তু ঋদ্ধিযুক্ত, অর্থশালী মানুষের বয়স আহাম্মক ছাড়া আর কেউ বিচার করে, এমন শোনা যায় না। তারপর রমণী 'দীন-ভিখাবি' এবং দীনু ঘোষাল তাকে রোক্কা পাঁচ পাঁচশো টাকা দিয়েছে। রমণী অতএব এসব কথা পাঁচকান না করে, কারুর সঙ্গে পরামর্শটর্শ তেমন না কবেই ব্যবস্থা পাকা করে নিয়েছিল একেবারে। কাছে পিঠে যারা জেনেছিল, তারা বলেছিল, "অমন সুন্দার ছেমড়িডা, ঠাহুর তুমি ঐ বুড়ইয়ার লগে ঠিক করলা, আর পাত্তর জোড়লে না?" রমণী বলেছিল, "জোড়ুলে কৈ? আর জোড়্লেই অইলে, মুই ভিক্ষুত বাওন, খরচা দেবে কেডা?"

দীনু ঘোষালের সমস্যা হয়েছিল তাঁর গৃহবিপ্লব। ছোটছেলের বৌ একদিন ভুঁইমালিনী রাড়িটিকে নাকি গো-বেরানে বেরিয়ে পাড়া ছাড়া করেছিল। কারণ, ঐ রাঁড়ি নাকি ছোট বৌয়ের তিন বছরের 'গেদিকে' শেখাচ্ছিল, 'ও মনু, মোরে এটটু ঠাহুমা করইয়া ডাহোনা'। আব্দারটা সম্পর্কের খাতিরে অন্যায় ছিল না, কিন্তু ছোট বৌ উজিরপুরের কুলীন 'ভট্টাইজ্জ্য' ঘরের 'মাইয়া'। সুতরাং তার মাথার মধ্যের জাত-মনসা ফোঁস করে উঠেছিল। লোকলজ্জার খাতিরে দীনু অন্তরে কুপিত হলেও, প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারেননি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, খাড়অ, তোর ভট্টাইজ্য গিরি বাইর করতে আছি। তোর পোলা মাইয়ারে যদি নতুন করইয়া ঠাহুমা না আনইয়া দি তো মোর নাম দীনু ঘোষাল না। সুতরাং অতঃপর এই ব্যবস্থা। কিন্তু কথাবার্তা, ব্যবস্থাদি হয়েছিল অতিগোপনে। এসব কথা আমরা বিয়ের আগের দিন জেনেছিলাম।

যীশুকাকা নামে একজন যণ্ডা যুবক আমাদের দলের সর্দার ছিল। বেশ কয়েকবার মেট্রিক ফেল মারার পর যখন সে আমাদের সহপাঠী হল, আমরা মিটিং করে কাকা থেকে তাকে দাদাস্তরে নামিয়ে এনে যীশুদা বলে ডাকতে শুরু করেছিলাম। যীশুদার স্বভাবটা এমনিতে বেশ সোজা সরল। সবাই বোকাই বলত।

ছোটবেলা মা হারিয়ে তার স্বামী পরিত্যক্তা সৎ দিদির কাছে মানুষ। পৈত্রিক সূত্রে কিছু জমিজমা ছিল বলে তাঁর বৈমাত্রেয় দাদা এই দায়িত্বটা পালন করতে আপত্তি করেননি। শুধু তাঁর স্ত্রী—তবে সেকথা এমন কিছু নতুন নয়। স্ত্রী-বুদ্ধি, এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিকের চাইতে বেশ কিছুটা অধিক প্রলয়ঙ্করীই হয়। ফলে যীশুদা বরাবরই বড় স্নেহ ভালবাসার কাঙাল ছিল। কিন্তু সে অনেক কথা, যথা সময়ে বলব। এখন সন্নর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা একটু বলেনি।

অনাথ আতুর ছেলেমেয়েদের ওপর তার এন্তের দয়ামায়া। বাজারি গার্জেনরা বলতেন যে, সময়ে বে'থা না হলে দামড়া ছেলেদের নাকি অমন হাতবুলানি ভাব হয়। জানিনা সেই ভাব থেকেই কিনা, সন্নকে যীশুদা একটু বিচিত্র রকমেই ভালবাসত। শুনতে যেমনই শোনাক, ঐ সময়টায় আমাদের অঞ্চলের যুবকদের যৌন এবং অন্যান্য অসহায়তা ছিল ভীষণই করুণ। সে অসহায়তা কর্মহীনতার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের, পারিবারিক ক্ষয়িষ্ণুতার, অপস্রিয়মাণ গ্রামীণ গার্হস্থ্য মূল্যবোধের এবং সর্বোপরি এসবের কোনকিছুরই প্রকৃত কারণ বিচার করার মতো শিক্ষাদীক্ষার অভাব। এজন্যে হিন্দু যারা, তারা দায়ী করত মুসলমানদের, মুসলমানেরা হিন্দুদের, আর উভয় পক্ষই দগ্ধ হতো নিজেদের অক্ষম ক্রোধ, তলহীন হতাশা আর নিরন্তর বিরক্তিতে। এসব ছাপিয়ে যীশুদায়েরা চূড়ান্ত নাজেহাল আর অপদস্ত হতো তাদের উপায়হীন যৌন তাড়নায়। আমরা তখন সবে বড় হচ্ছি, সবটা না বুঝলেও এসব কিছু কিছু অভিজ্ঞতায় এসে যাচ্ছিল। সন্নর বয়স তখন তেরো কী চৌদ্দ। তথাপি ঐ বয়সী মেয়েদের যীশুদাযেরা কামনার চোখেই যেন দেখতে বাধ্য হতো। কারণ, ঐ অস্বাভাবিক অবস্থায অন্য উপায়তো ছিল না। তখনকার সমাজ পরিস্থিতিটা ছিন্ন ভিন্ন এবং ছন্ন হয়ে যাওয়া একটা দেশের যা অনিবার্যতা ঠিক তাই। জীবনের সব আনন্দ, সব বিনোদন এইসব গ্রামীণ প্রেক্ষায় কেন্দ্রীভূত হতো এক অসুস্থ, অস্বাভাবিক ক্লেদাক্ত যৌনতায়। কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা রুচি ঔচিত্য অনৌচিত্যের ব্যাপার বা শোভন অশোভনের কথা কেউ চিন্তা করত না। নৈরাজ্য, বিশেষ করে চিন্তার ক্ষেত্রের নৈরাজ্য এমনই তমসাচ্ছন্ন ছিল যে তার মধ্যে এক ফোঁটা আলোর চিহ্ন মাত্রও ছিল না। সেই তমসায় অস্তিত্ববান ছিল যেন শুধু অন্ধ সরীসৃপের মতো অসুস্থ ক্ষুধা আর ক্লেদাক্ত কাম। এবং তা কোনমতেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহমনের স্বাভাবিক ধর্ম ছিল না। যীশুদা, যেমন আগে বলেছি সন্নকে একটু বিচিত্রভাবে ভালবাসত। আবার এই যীশুদা, আমাদেব কিশোরকালের সরল, সাদামাটা, গরীব যীশুদা, সামান্যতম গার্হস্থ্য আবেগের কারণ ঘটলে ঐ সন্নকেই হয়তো ডেকে বলত, এক গেলাস জল দে দেহি মাগো, বড় পিপাসা পাইছে এবং তার আবেগের মধ্যেও

কোনো মিথ্যে থাকত না। এইসব বিপরীত আচরণ তখন বুঝিনি পরে বুঝেছি যে সন্নকে যৌনতায় কামনা করা আর বাৎসল্যে অভিষিক্ত করা দুটোই তার ক্ষেত্রে সত্য এবং সে অর্থে স্বাভাবিকও। অল্পবুদ্ধির মানুষ সে। অতি শৈশবে মাতৃহীন। ফলে সারাজীবন হেলাঘেন্নার জীব। নিজের বলতে সে অর্থে কেউ নেই। একটু ভালবাসা, দু-একটা ভালকথা বা সামান্য একটু গুরুত্ব পেলেই যীশুদা বর্তে যেত। লোকের জন্য প্রাণপাত খাটতে তার কখনো আলস্য দেখিনি। বলত আমার জীবনে তিনখান্ হাউস আছে। এউক্কা হারমনিয়াম, এউক্কা রেডিয়ো আর সন্নর মতো ফস্সা গোলগাল লক্ষী লক্ষী লগইতের এউক্কা বৌ। আর কিছু চাই না।

একদিন এখানে জমিদার বাড়িটার পিছনের পুকুরঘাটের পাশে একটা ঝোপের আড়ালে যীশুদা আর সন্নর বেশ মিষ্টি একটা কাণ্ড দেখেছিলাম। মিষ্টি বলছি এজন্য যে, অন্তত এই ব্যাপারটা তৎকালীন ছোঁচা-বেড়ালের কাণ্ডের মতো নিঘিন্নে ছিল না। সুযোগী যৌন ছোঁচামির থেকে তার মধ্যে বেশ খানিকটা পার্থক্য ছিল। সন্ন মুখ গোঁজ করে বসে আছে। মনে হয় কোনো কারণে তার রাগ হয়েছে। যীশুদা তার সামনে হাঁটু গেড়ে, হাতে একটা পাকা পেয়ারা। তফাতে থেকেও শোনা যাচ্ছিল যীশুদা অনুনয়ের সুরে বলছে, সন্ন আমি এই গোইয়াডা বিলের বাগান থিকা লইয়া আইছি কষ্ট করইয়া। তুই এডা খা। তুই যদি এডা না খাও, তয় বুজুম তুই আমারে এটটুস্‌ও ভালোবাসো না। তুই আমার উপর রাগ অইছ।

--রাগ অইছি নাতো কী? রাগ হওনের কাম করলেই মাইন্‌সে রাগ অয়। —সন্নর নাকের পেতলের নাকছাবিটার উত্থান পত্তন যে তার রাগের সপক্ষে, তা বোঝা যাচ্ছিল। যীশুদা বেশ কাতর হয়ে জিজ্ঞেস করল, ক্যান্ সনুমনা, তোমার রাগ অইছে ক্যান্? মুই কী কিছু দোষঘাট করলাম?

--কর নায় তয়?

—কী, কী করছি?

কী করছি? তুমি এহন আচুক্কা মোরে হাবডাইয়া ধরইয়া যে চুম্বা চাডা খাইলা, এহানে ওহানে হাত বুলাইলা, হেডা এটটা অসোইব্য কাম না? আববিয়াতোরা ওয়া করে?

—ক্যান্ তোর ভাল লাগে নায়?

—ভাল লাগলেই অইলে? তুমি আমি কী এক জাইত? আমাগো কী বিয়া অইবে?

—অইলে দোষ কী? এই বাড়ির সাজইয়া বাবুতো কামারের বিধবা মাথারিরে বিয়া করছেলে, হেতে হ্যার কী কিছু অইছে?

—অইছে না? কী রোগে হে মরলে দ্যহনায়? হে রোগ তো ঐ পাপে।

—হেয়াতো হেনায় খারাপ পাড়ায় যাইতেন হ্যার লইগ্যা।

—কিন্তু হেনারা অইলেন বড়লোক। হেনাগো ওসবে দোষ অয় না। মুই ভিক্ষুত বাওনের মাইয়া। মোর আরো দুইডা বুইন আছে। হ্যারাও ডাঙ্গোর অইয়া ওঠথে আছে। মোর যদি কোনও পিরীতইয়া কলঙ্ক অয়, বাপে হ্যারগো বিয়া দেবে ক্যামনে?

—তয় তুই আমারে বিয়া করবি না? তোর ভালবাসাটাসা বেয়াক মিথ্যা?

—না। কিন্তু বিয়াডা অইবে ক্যামনে, হেয়া ভাবছ?

—পলাইয়া যাইয়া।

—কোথায়?

—কইলকাতায়।

—হেহানে কেডা আছে তোমার? থাকপা কোথায়? খাবা কী?

যীশুদা এতসব ভাবার মানুষই নয়। সে এতসব ভাবতেও পারে না। কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড, ঐটুকুন মেয়ে সন্ন কিন্তু বেশ সচেতনভাবেই বাস্তব সমস্যাগুলো নিয়ে প্রশ্ন করছিল। শিশুকাল থেকে সে বাপকে ভিক্ষে করতে দেখেছে। পারিপার্শ্বিক অন্য দশজনের মতো তাদের গেরস্থালি নয়। সুতরাং নিজের মন পছন্দ বিয়ে থা হওয়ার উপায় যে তার নেই, তা সে ভালই বোঝে। সে এও জানে যে এরকম ভাব-ভালবাসা গ্রাম দেশে হয়, কিন্তু হাজারে একটা ক্ষেত্রেও বিয়ে পর্যন্ত তা গড়ায় না। এক্ষেত্রে তো জাত একটা ব্যাপার। যীশুদায়েরা ভিন্ন জাত, বাওনদের চাইতে 'নীচা'। তার বাপ ভিখিরি ঠিকই, কিন্তু বেজাতে মেয়ে বিয়ে হোক সে কোনোমতে তা মেনে নেবে না। আর সন্নর আকাঙ্ক্ষা— যেখানে খুব দারিদ্র্য নেই অন্তত নিত্য অন্নাভাব নেই, সেইরকম ঘরে তার গতি হোক। দোবেলা পেটের অন্নের জন্য তার বাপের মত একজন উঞ্ছ মানুষ যেন তার না জোটে। কিন্তু এতসব কথা যীশুদাকে বলা নিরর্থক। নিরর্থক যে কোনো মুগ্ধ পুরুষের ক্ষেত্রেই জীবনের যে দুর্ভোগগুলো সন্নকে এই বয়সেই বাস্তব জ্ঞানে পোক্ত করেছে, যীশুদার বয়স তার চাইতে দ্বিগুণ হলেও, তেমন বোধ তার নেই। তার অন্নের জন্য উঞ্ছতার দরকার হয় না। মোটা ভাত কাপড়ের জন্য তার ব্যবস্থা আছে, যদিও তা পারিবারিক কারণে কিছু বিশৃঙ্খল। তার সমূহ সমস্যা প্রেম এবং যৌন তাড়না। সেদিন আড়াল থেকে তাদের আলাপ আলোচনা এবং আচরণে এই ব্যাপারটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম। সন্ন এরকম মোক্ষম একটা বাস্তব প্রসঙ্গ তুললে যীশুদা তা এড়িয়ে তাকে তুমুল আদর করতে শুরু করেছিল আবার। কিন্তু তা প্রকৃতই আদর। এবং তা প্রেমেরই।

এইসব শারীরিক ব্যাপার স্যাপারকে আমরা পাড়া গাঁয়ের লোকেরা 'অসোইব্য' 'কু-আচার' বুঝতাম, যদিও তৎসত্ত্বেও এসব যে কমবেশি ঘটত না এমন নয়। বিবাহিত দম্পতি ছাড়া এরকম আচরণ পাপ এমনই আমাদের ধারণা এবং শিক্ষা ছিল। সন্নরও। সে যীশুদার আদরের জবাবে বলছিল, যাও, তুমি বড় অসোইব্য।

—ক্যান, তোমার এসব ভাল লাগে না? আমি কী কিছু খারাপ করছি, না কইছি?

—জানিনা, যাও। খালি কু-আচার কথা। এসব আমার পছন্দ না।

কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে ব্যাপারটা সে আদৌ অপছন্দ করছে। সে যীশুদার বুকের ভেতর একটা পোষা মেনি বেড়ালের মতো ওম্ খাচ্ছিল। ঐদিন একটা জিনিস বুঝেছিলাম যে যীশুদার মধ্যে সন্নর প্রতি দৈহিকতার অধিক একটা কিছু আছে। ঐসব দিনে ভালবাসা বাসি করা বলতে আমরা দৈহিকতাই বুঝতাম। প্রেম বলতে আমাদের ধারণাটা ছিল অনেকটা পদাবলি কীর্তনের সুরের মতন। যা ধরা যায় কিন্তু ছোঁওয়া যায় না। যীশুদা আর সন্নর আচরণেও সেদিন আমি পদাবলির আখরের ছন্দ পেয়েছিলাম। সেটা সাময়িক হলেও মিথ্যে ছিল না।

সেই সন্নর বিয়ে হতে চলেছে একটা ঘাটের মড়ার সঙ্গে। সংবাদটা জানালো যীশুদাই। তার গলায় যেমন একটা আসন্ন বিচ্ছেদের সুর ছিল, তেমনই ছিল সন্নর এই অসম বয়সী পাত্রের সঙ্গে বিয়ের জন্য উদ্বেগ। ভাবটা এরকম, তার সঙ্গে বিয়ে যদি সন্নর নাও হয়, তবু যেন সে সুখী হয়। তার যেন একটা সুন্দর বিযে হয়।

দুই

সন্নর এরকম একটা বিয়ে হবে, তা আমাদের ভাবনারও অতীত ছিল। তার বাপ ভিখারী ছিল বটে কিন্তু সন্নর গড়ন-লগইত, বর্ণ মুখশ্রী এবং আনুষঙ্গিক আয়োজন প্রকৃতই একটা তোলপাড় করার মতো ব্যাপার ছিল। বলতে গেলে ইজের পড়া ছেলে-ছোকড়া থেকে অন্তর্জলীর শিট্‌কে বুড়োটা পর্যন্ত সকাতরে তার দিকে তাকিয়ে লালা না ঝরিয়ে পারত না। সে তুলনায় যীশুদা ছিল তার কাছে আকৃতিগতভাবে একটা মূর্তিমান দানব বিশেষ। গুলি পাকানো অষ্ট্রাল আকৃতির সঙ্গে মোঙ্গল চোখমুখ। নিগ্রোদের মতো কোঁকড়ানো চুল এবং গালের এখানে

ওখানে ওরকমই দাড়ি, খাপছাড়া খাপছাড়া। কিন্তু হলে কী হবে, মানুষটার হৃদয়টা ছিল বড় নরম, আর তা বোঝা যেত তার মুখে লেগে থাকা সর্বক্ষণের হাসিটা দেখে। সবসময়ই সে যেন সন্নর সঙ্গে লাসা, ডাইয়ার মতো লেগে থাকতে চাইতো। সন্নকে দেখলেই, তার সারা গা দিয়ে যেন অকারণেই পুলক ঝরতো। আমার এমনও মনে হয়েছে যে, সন্নর মতো সুন্দরী মেয়েরা, এইরকম হাসি এবং ঠিক তার বিপরীত কদাকার মাংসল চেহারা দেখেই বোধহয় আকৃষ্ট হয়। আর আমরা এরকম বেহিসাবি ব্যাপার স্যাপার নিয়ে হিসাব মেলাতে হিম্‌সিম্ খাই।

সে যাহোক, যীশুদাই ঠিক বিয়ের আগের দিন খবরটা পেয়ে, তৎনগদ আমাদের একটা জরুরী মিটিংএ তলব করল। সে এবং তারই সমবয়সী এবং একই কারণে আমাদের সহপাঠী মঞ্জুদা মিটিংএ জোরালো বক্তব্য পেশ করল। মঞ্জুদা স্বল্পভাষী এবং সম্পর্কে সন্নর কাকা বিধায় প্রথমেই জানিয়ে রাখল যে সে যদিও সব বিষয়েই আমাদের সঙ্গে সহমত হবে, আমরা যা বলেবো, তা নিয়ে কোনো বাহাস করবে না। ক্যান? না জ্ঞেয়াতির তুল্য শত্তুর নাই। 'জ্ঞেয়াতির ঘরের ব্যাপার', সুতরাং খুব একটা প্রকাশ্যে কথা বলতে পারবে না। যীশুদা বলল, শুনছিলাম সন্নর বিয়া দেতে চায় হ্যার বাপে। তোমরা বেয়াকে জানো যে সন্নরে আমার সাইদ্যের পছন্দ আছেলে। কিন্তু জাতে মেলে না বলইয়া মুই চুপ করইয়া গেছি। এখন শোনলাম যে পাত্তর অইছে ঐ ষাইট পাইক্যার দীনু ঘোষাল। সন্ন হ্যার নাতনীর চাইয়াও ছোডো। জানি হ্যার বস্তা বস্তা ট্যাহা আছে। কিন্তু বয়স যা হেথে আইজ বিয়া বইয়া কাইলই হয়ত সন্ন রাঁড়ি অইয়া ফিরইয়া আইবে হ্যানে। তহন কী হে, বা হ্যার বাপে ঐ ট্যাহার থিহা একটা পয়সাও আদায় করতে পারবে? তহন সন্নর অবস্তা কী অইবে? হে কারণ, আমাগো কিছু এট্টা করণ আবইশ্যাক। আর হেসব যদি ঠিকঠাক না অয়, তয় মুই কিন্তু সন্নরে লইয়া পলাইয়া যামু।

সুতরাং কিছু একটা করা নিশ্চয়ই 'আবইশ্যাক', একশ'বার আবইশ্যাক, সে ব্যাপারে একমত হতে আমাদের কিছুমাত্র সময় লাগলো না। তখনকার ঐরকম একটা নিস্তরঙ্গ পল্লী জীবনে ব্যাপারটা যারপরনাই উত্তেজক। তার ওপর মেট্রিক পরীক্ষা তখন শেষ, হাতে কোনও কাজ নেই, যেকথা আগেই বলেছি। ঐসব সময়েই সাধারণত সমাজ সেবামূলক কাজ, অন্যায়ের প্রতিকার ইত্যাদির জন্য গ্রাম্য যুব সমাজ সে যুগে হেদিয়ে মরত। অতএব, মিটিংএ সিদ্ধান্ত এ বিয়ে অত্যন্ত অন্যায়। কিছুতেই এটা হতে দেওয়া যাবে না। এটা বন্ধ করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। সেটা অভিভাবক তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একেবারে শুরুয়াতের যুগ। সুতরাং আমরা খুবই উত্তেজিত।

বিয়ে ভণ্ডুল করাটা কিছু কষ্টসাধ্য ছিল না। মঞ্জুদার মাথাটা ছিল আমাদের সবার চাইতে পাকা। সে বলল, বোজলাম। কিন্তু হ্যারপর কী? খালি ঐ বুড়ইয়ারে মারইয়া ধরইয়া খ্যাদাইয়া দেলেই অইবে? হ্যার বদলে পিড়িতে বওয়াবি ক্যারে?—যীশুদা বোধহয় ভেবেছিল, এইসব হুড়াঙ্গামায যদি তার কিছু সুবিধে হয়। সিনেমা থিয়েটারেতো এরকম আকছার ঘটেই থাকে। মঞ্জুদা ব্যাপারটা খানিক আচ করতে পেরে আগেই বলে উঠল, এয়া লইয়া যীশ্‌উয়া য্যানো আবার ফাউকাইয়া উডিসনা। তোরা কৈলোম বৈদ্য। বৈদ্যরা য্যাতোই 'দ্বিজেষু বৈদ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ' কইয়া বাওন অইতে চাউক। বাওনরা হেডা মানে না। (মঞ্জুদা কীভাবে যেন শ্লোকটা শুদ্ধ উচ্চারণে বললো।) বাওনরা কৈলোম তোগো নীচাই ভাবে। হেসব খোয়াব বাদ দে, এহন মোগো ঠিক করতে অইবে যে যদি দীন্‌উয়ারে খ্যাদাইয়া দি, পাত্তর পামু কই?

হক আর জব্বারও আমাদের দলে। কিন্তু এটা হিন্দুর বিয়ে। 'শ্যাহের' পরামর্শ কাজে লাগবে না। তবু হক বলল, তোগো হিন্দুগো ফ্যাতো আনাড়া নিয়ম কানুন। মোগো শ্যাহেগো অত ক্যাচাল নাই। তাছাড়া যীশুদা যদি সত্যিই সন্নকে নিয়ে ভেগে যায়, সে এক ভীষণ কেলেঙ্কার হবে।

সময় হাতে আছে মাত্র এক দিন। দীনু ঘোষাল মহা কারিগর মানুষ। পাছে তার ছেলেরা টের পায়, একারণে নাকি জনা পঁচিশ তিরিশ বুড়া, আধবুড়া, বরযাত্রি নিয়ে, একটু তফাতে আমাদের এই বাজারের মোতাহার কাকার বাড়ির সামনের বড় খালটাতে, খান কযেক নৌকা নিয়ে থানা গেড়েছে। মোতাহার কাকা ব্যবসায়ী মানুষ, আবার আমাদের স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের 'পিরসিডেন্ট'। রমণী নাকি তাঁর কাছে সব বলে কয়ে কাজ উদ্ধারের জন্য সহায়তা চেয়েছে। কাকা মানুষটা সজ্জন। রমণীর আর্জিতে রাজিও হয়েছেন। তবে পাত্রের বয়স, সেঁ কে, তার আগের পক্ষে পোলাপান্ কড়ি, এ বিষয়ে রমণী কিছু বলেনি। শুধু জানিয়েছে যে পাত্তর দোজবর, অবস্থাটবস্থা ভাল, বেশ বড়সড় বেম্মোত্তর সম্পত্তি আছে, বচ্ছরে খালি ধানই গোলায় ওডে পাশশো বুদা। এছাড়া তেজারতির আয় যে কত হেয়ার কোনো হিসাবই নাই। কাকা 'অল্‌হম্‌দুল্লিল্লাহ বলে জানিয়েছেন যে, একাম উত্তম কাম। আল্লাতায়লা, এইসব নেক্ নেক্কর কামের লইগ্যাই হ্যার ল্যাহান্ বান্দাগো পয়দা করছেন।' রমণী নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। এইসব সংবাদই বলা বাহুল্য, যীশুদার সংগ্রহ। শুনে মঞ্জুদা বলল, হেইডা মুইও শুনছি। হেইডডাই অইছে আসোল মুছিবত। এ একছের গোড়াঘাডে পাইন মারইয়া রাখছে।

এডা কোনো মুছিবতই না। কাকায় মানুষটাতো জলের ল্যাহান। হেনারে এটটু বুজাইয়া, বেয়াক গল্প কইয়া চেতাইয়া দিলেই হ্যানে অইবে। হেনার লগে আবার জেডামণির মানে বড় রায় মশায়ের ঘোনো দোস্তালি। এই দুই জোনারে যদি ক্যাওরে দিয়া আইডমতন কায়দা করণ যায় তো আর দ্যাহন লাগবে না।—কেষ্ট সার পরামর্শ দেয়। ফিচেল হলেও ওর বুদ্ধি বেশ পরিষ্কার। কিন্তু ঐ দুই মরুব্বির মোকাবিলা করবে কে? মোতাকাকা, মানে মোতাহার কাকার কাছে যে কেউ যেতে পারে। শান্ত, দিলদার মানুষ সেটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু 'জেডামণি'? মঞ্জুদা স্বল্পভাষী কিন্তু রগড় ছাড়া কথা বলতে পারে না। বলে, মোগো মইদ্যে এমন কেউ বাচ্চা পাডা ছাগল আছে যে নিজের ইচ্ছায় হাড্ইয়া যাইয়া বাবা দক্ষিণরায়ের সামনে খাড়ইয়া কইবে, মোরে খায়েন? আছে এমন কেউ?

—আছে। তয় হে পাডা ছাগল কিনা ঠিক জানি না। খালি জানি যে হে গ্যালে, হ্যারে খাইবে না। এটা কেষ্ট আর হক দুজনেরই মত।

—কেডা?

কেষ্ট খুব নির্লিপ্ত ভাবে আমাকে দেখিয়ে বলে, ওরে খুব ভাল পায়। ওর বাবায় হেনার ছোডো কালইয়া দোস্তো কিনা। —কথাটা সত্য, তবে এরকম একটা ব্যাপার নিয়ে যাবার মতো সাহস যে আমারও খুব একটা ছিল এমন নয়। কিন্তু সভা তা নিয়ে কোনো ওজর শুনতে নারাজ। ঠিক হলো আমাকেই যেতে হবে। আমি কাটান দেওয়ার চেষ্টায় একটা মোক্ষম প্যাঁচ মারলাম। বললাম যে যদি তাঁরা জানতে চান যে 'বদলে কে', তো জবাবটা কী হবে? আমাদের কী আগেভাগে একটা যেমন তেমন 'পাত্তর' ঠিক করে তাঁদের কাছে যাওয়া উচিত হবে না? মঞ্জুদা বলল, এইডা যা কইছো হেয়ার উপার কতা নাই। পাত্তর ঠিক না করইয়া ঐরহম মাইন্যমান মুরুব্বিগো দরবারে গ্যালে একছের বব্ধারম্ভে লঘুক্রিয়া—মঞ্জুদা আমাদের ইশকুলের পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ব্যাকরণতীর্থ মশাই-এর কীরকম যেন লতায় পাতায় ভাগ্না। তাই কথার মধ্যে প্রায়শই দু একটা তৎসম বাক্‌বিন্যাসের প্রচেষ্টা থাকতই, যদিও সংস্কৃতে কোনোদিনই তিরিশের বেশি নম্বর উঠত না তার। কিন্তু পাত্তর, তাও আবার আনকোড়া বাওন পাত্তর তৎকালে বড়ই দুর্লভ। একেকজন উল্টাপাল্টা এর ওর নাম করতে, যীশুদা রেগে কাঁই। বলল, দৈবজ্ঞ, গোণোক, অগ্‌গরদানি এরা যদি বাওন অয়, বৈদ্যেরা দোষটা করলে কী? মঞ্জুদা বলল, রাইগ্যোনা। রাইগ্যা লাভ নেই। বৈদ্যেরা বাওন কিনা হেয়া লইয়া খেউড় কোম অয় নায়। এমনকি কেডা য্যানো একখান তালপাতার ল্যাহাও দেহাইছেলে যে, 'দ্বিজেষু বৈদ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ' (এই বাক্যটি মঞ্জুদা আবার বললো এবং কী করে যেন শুদ্ধ উচ্চারণ এবং বানানে বলতে পারল)। কিন্তু

বাওনারা মানে নায়। —যীশুদা নিজে বৈদ্য, বলল, তয় ? শাস্তর আছে, তমো যদি ন মানে, হেডা ধম্ম অয় ?

শেষ পর্যন্ত কেষ্টা বলল, হইছে বাওন কাশী যাওন, ঐ বৈদিক বাড়ির দুইডা দামড়া আছে, হ্যার এট্টারে ঠিক কর। যীশুদার লগে হওনের পইদ্য নাই। তয় ওগো ছোডোডার লগে অইবে না কিন্তু। যীশুদা বলল, ওডা রোজ দুফইরে অতুল গোণোকের বৌএর ধারে যায়। ঐ সোমায় গোণোকে বাড়ি থাহে না কিনা। তয় মাজইয়াডা এ্যামনে খারাপ না, খালি বাজারইয়া যাত্রাপার্টিতে যুবরাজ সাজে বলইয়া হ্যার বড়দায় বাড়ির থিহা খ্যাদাইয়া দেছে। কোনো কামকাজ করে না তো বাড়ির। বড়ভাইডাও আছে বজ্জাত।

—থাহে কোথায় ? খায় কী করইয়া ? মঞ্জুদা জিজ্ঞেস করে।

—খায় বাড়িথেই। মায় আছেতো, আর হ্যার নিজের ভাগ আছে না ? তয়, থাহে এহানে ওহানে। বড ভাই বাড়িথে থাকতে দে না। ঘর উডাইছে হে নিজে। বা পৈতি না। কয়, নিজে ঘর উডাইয়া থাহ। এ ঘর মুই বানাইছি। ভাড়উয়ার পোয বেবাক সম্পত্তি একলা খাইতে চায়।

—তয় বৌরে উডাইবে কোতায় ?

—হ্যার লইগ্যাতো মোতাকাকা আর বড় রায় মশায়রে ধরতে কইলাম। —কেষ্ট বলে, হ্যারা যদি এট্টা মিটমাট্ করইয়া দেন, তয় কোনো লাং-চুনির পোযের কিছু কাওযার থাকবে না। ঘাড়ে কল্লাতো এ্যাট্টাই, না কী ?

—কতাডা ঠিক। তয় তুই যাইয়া হ্যারগো বুজাইয়া দাখ্। কদ্দুর কী করণ যায়। বলে মঞ্জুদা আদেশ জারি করে।

জেডামণির দন্তহীন মুখ, বিস্তৃত টাক এবং লোমহীন ভুরু এবং সদাঘূর্ণিত কিন্তু অন্তর্ভেদী চোখ দুটোর কথা স্মরণ করে শিরদাঁড়াটায় কেমন যেন লত্পতে একটা অনুভূতি হচ্ছিল। এমনিতে তিনি আমাকে যথার্থই স্নেহ করতেন, কিন্তু তার মধ্যে 'আস্কারা' বলতে যা বোঝায় তার চিহ্নমাত্র ছিল না। ঐ বয়সে, যাত্রা দেখতে যাওয়া, গঞ্জে নাইটশো'এ সিনেমা বা সার্কাসে যাওয়া, শীতের রাতে খেজুড় রস চুরি করে, মুরগী, পায়রা বা পাঁঠা 'গাব' করে 'ফিষ্টি' করার মতো কোনো বদমায়েসীই তাঁর চোখ এড়িয়ে কোনোদিন করতে, পারিনি। আমাদের ছোটবয়সে একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জেডামণির টাকের গোটা এলাকাই চোখ-ভরতি। সামনে পিছনে দুপাশে বা উপরে যা কিছু ঘটুক সবই তাঁর নজরের মধ্যে। সেই হেন জেডামণির সামনে আমাকে সন্নর বিয়ের 'রায়বারি' করতে যেতে হবে। হে মা সিদ্ধেশ্বরী, প্রাণটা বাঁচিয়ে রেখো মা। মঞ্জুদা উপদেশ করলো, যাওয়ার আগে বাইম্যডা একবার সারইয়া যাইস, কওয়াতো যায় না, যদি আচুক্কা প্যাডে মোচড় মারে ?

তিন

জানতাম দিনে মানে ঐ দুই মুরুব্বির দেখা পাওয়া সম্ভব হবে না। সন্ধে হতে আর তেমন বাকি ছিল না। ঐ সময়টায় মোতকাকার আদর্শ মুসলিম বস্ত্রভাণ্ডারের পিছনের একটি দোচালা ঘরে দুজনের মৌজ মৌতাতের 'ডুয়েট' চলে। জায়গাটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। যে দুএকজন ভাগ্যবান ও সময়ে ওখানে ঢোকার অধিকারী আমি তার মধ্যে একজন। তাও খুব জরুরী কোনো দরকার পড়লেই। নচেৎ 'জেডামণি' তেড়ে আসবেন। জেডামণির একটু পানভ্যাস এবং ইত্যাদির সঙ্গে একটু 'ইশের'ও ব্যাপার আছে। বড়দের তাতে অবশ্য দোষ নেই। তার ওপর বিগত পত্নীক শোকাতাপা মানুষ, এজন্য কেউ কিছু মনে করে না। মোতাকাকার বিবি বর্তমান। তাই তার 'ইশের' ব্যাপার স্যাপার নেই। শুধু ডাক্তারের নির্দেশে স্বাস্থ্যের কারণে একটু আফিম খাওয়ার দরকার হয়, আর তার তরিবৎ করেন মিঠে কড়া 'কাচা গাইট' তামাকের ধোঁয়ার হাতুড়ি মেরে। মানুষটা সোজা সবল, যাকে আমরা বলতাম 'ছাফ দেল'। ইসলামের নেশা হারাম, তবে, গাঁজা, আফিং বোধ হয় একটু কম হারাম। বিশেষ, তখনো আমিমটা তখনো. ডাক্তার-চল্।

ভেতরে গিয়ে বুঝলাম, সঠিক সময়টিতেই এসেছি। তাঁরা সবে ওপরের দিকে একটু একটু উঠছেন। এর থেকে বেশি দেরি করলে ব্যাপারটা জেডামণির তরলের মত তরল, অথবা কাকার ধোঁয়ার মতো ধোঁয়াটে হয়ে যাবে। যা বলার চট্‌জলদি বলতে হবে।

আমাকে দেখে দুজনেই খুশি। জেডামণির মেজাজ শরীফ থাকলে, আহ্লাদ করে আমাকে 'পাডার পো পাডা' বলে ডাকেন। তাতে বাপ-ছেলে দুজনকেই যথেষ্ট খাতির করা হয় বলে তাঁর বিশ্বাস। মোতাকাকা বড় জোর 'পাডাডা' বলবেন। বাবা তাঁর অগ্রজ প্রতীম, সুতরাং এর উপর তিনি উঠবেন না। জেডামণি দেখামাত্রই জিজ্ঞেস করলেন, কোনো বিশেষ কাম আছে মনে অয়?

—আইজ্ঞা হ।

—কী, শতকাডি যাত্রা দ্যাহনের হাউস অইছে, না কমলা টকিজে 'সাদি কী রাত'?

—আইজ্ঞা না। এটটু গুরুতর কথা আছে।

—গুরুতর? ও মোতা কয়কী, কয় বোলে অর নাকি মোগো লগে গুরুতর কথা আছে। তয় কইয়া ফ্যালায়েন কী গুরুতর কথা আছে আপনের। আপনেতো আবার মোর মুরুব্বি।

-আইজ্ঞা রমণী ঠাহুরের মাইয়া সন্নর কাইল বিয়া। হের কারণে—

--জানিতো। হে মোতারে, আমারে সব জানাইয়াইয়া গেছে। তো হ্যার মাইয়ার বিয়া হেথে তোর বাপের কী? তোর কী বিয়া করণের হাউস অইছে? নাকী তোর বাপের? কিন্তু জাতে মেলবে নাতো। তখনকার পিতৃবন্ধুদের কথাবার্তার ধরন এমনই ছিল:

--না, মানে পাত্তরের বয়সটা আপনেগো ল্যাহানই। আমরা খবর লইছি। ঐ ঢ়ক মাইয়া, ও রহম বিয়া হওনডা তো অন্যায়, আপনারা যদি কিছু না করেন, তো-- ।

—ও মোতা, কয়কী? পাত্তর যে আমাগো বয়সী, রমণীতো হেকথা কয়নায? খালি কইল যে পাত্তরেব অবস্থাটবস্থা ভাল, তয় দোজোবর, হেকারণ বয়সটা এটটু বেশির দিকে। দোজোবরে আপত্তির কিছু নাই। আমি নিজেও তো- কিন্তু হেডাওতো টেকলে না। যাউক গিয়া। কিন্তু বয়সটা-ও মোতা— ? এয়ার এহন করমুই বা কী? এডার লগেতো দেওন যাইবে না, জাতে আটকাইবে। তোরা কী বদলা কেউরে ঠিক করছ?

—আইজ্ঞা, বৈদিক ঠাহুরের মাঝইয়া পোলা নিরঞ্জনইয়ারে যদি আপনেরা কয়েন, তয বোধায় এটটা মানান সই অইতে পারে।

--হ্যার লগে কথা কইছ? হে রাজি আছে?

—আইজ্ঞা আপনেগো পারমিশন না লইয়া হেয়া করি কী করইয়া। তয়, ঐ বুডইযা পাত্তরের বড় পোলারে খবর করছি, আপনেগো লগে দ্যাহা করণের লইগ্যা। হে কাইল সকালে আইবে হ্যানে।

এ কামডা ভালই করছ। এবার মোতাকাকা মুখ থেকে সটকাটা সরিয়ে দাঁড়ির ফাঁক দিয়ে বললেন। হেডার লগেই না অয় বদ্‌লি পাত্তর করইয়া কামডা সারইযা ফ্যালান যাইতে পারে, কী কয়েন দাদা?

--কিন্তু হেতো বিয়াতইয়া, হ্যার মাইয়াওতো সন্নর চাইতে ডাঙোর। আমি জানাই।

—তযতো হেডা এটটা মুছিবত। দাদায় কী কয়েন?

—না, ঐ নিরঞ্জনইয়ার লগেই অইবে। ছ্যামড়ারা ঠিকই বাছছে। তয় এটটা সোমোস্যা, হ্যার বড় ভাই হ্যারে দেছে খ্যাদাইয়া। হ্যার এটটা নিজস্ব বাড়িঘর দরকার। তুই এক কাম কর, তুই এক দৌড়ে যাইয়া হ্যারে ডাইক্যা আনছেন।

আওনের সোমায় দেইখ্যা আইছি পোলের উপার খাড়ইয়া খাড়ইয়া পাট মুখুস্থ কইতে আছে পোলাপানগো সামনে। যাইয়া কানে কানে কবি, আমি ডাকছি।

নিরঞ্জনকে পাওয়া গেল। আদেশ জানাতে একটু ঘাবড়ে গেল। বড়ো রায় মশায় তলব করছেন, না জানি কী দোয আবার নজরে পড়েছে 'হেনার'। আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করতে বললাম, হেয়া জানিনা, তয় মনে অইল সাইদ্যের জরুরি। এহনই চলো।

—ভয়ের কিছু বোজলা? মাইনে হেনার থোব্‌ড়াডা ক্যামন দ্যাখলা?

—হেনার মুখ দেইখ্যা প্যাড়ের কথা কেউ কোনদিন বোজছে?

নিরঞ্জন বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে আমার সঙ্গে এলো। জেডামণি কোনো ভূমিকা না করে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, দিন দিন বয়স বাড়তে আছে, না কোমের দিকে যাইতে আছে? ছাড়া-দামড়ার মতো হারাদিন টোটো করইয়া ঘোরোন আর সখের যাত্রা পালা করইয়াই দিন কাডাবি? তুই যে মোগো পুরোইত বংশ হে কথাডা ও ভুলইয়া গেছ?

—আইজ্ঞা না। এহন থিকা ভাল অইয়া যামু ঠিক করছি।

—ঘর সোংসার, বিয়া টিয়া করবি, না লাথি পিছা খাইয়া এইরকমই চলবে?

—আইজ্ঞা ঘরই নাই। য্যার ঘর নাই হ্যারে মাইয়া দেবে কেডা?—বিপদ নেই বুঝে নিরঞ্জন সাহসী।

—ঘর পাইলে বিয়া করবি? ধর মুইই তোর ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করাইয়া দেলাম। তুইতো মোগো পুরোইত বংশও।

—কতায় কয়, খয়রাত্‌ইয়া, ভাত খাবি? না, আচামু কোথায়। তো মোর অবস্থাতো আপনে জানেন। মুই বিয়া করতে চাইলে হেডা এ্যাট্‌টা হাইস্যতা অয়না? আপনের কতা হন্‌ইয়াতো মোরই হাসোন্ পাইতে আছে।

—তয় শোন্, কাইল তোর বিয়া। ঘরের ব্যবস্থাও কাইলই করইয়া দিমু হ্যানে। কাইলই বৌ লইয়া সোজা নিজের ঘরে উড্‌বি। কী কইছি কথাডা বোজজো? আর আইজ মোর লগে মোগো বাড়ি যাবি, ওহান দিয়াই কাইল বিয়া করতে যাবি।

—বড়ভাইরে কওন লাগবে না? হ্যারাতো কিছু জানলেনা। আবার যুদি দোয ধরে?

—ওয়া যা কওয়ার আমিই কমু হ্যানে। এ ব্যাপারে এহন আর কিচ্ছু কমু না. তুইও ক্যাওরে জানাবি না কিছু। যা করাব আমিই করমু। এহন যা, আবার যাইয়া ছ্যামড়াগো 'পাট' শোনা। আর শোন, বিয়াটিয়া মিডাইয়া গ্যালে মোর লগে একদিন গঞ্জে নাথ মশায়ের ধারে যাবি। যাত্রা যদি করতেই অয় নাথ কোম্পানিতে চাকরিই কর। বৌরে খাওয়ানডাতো এটটা দায়িত্ব না কী?

'জেডামণি' কে যে এ অঞ্চলের ইতর ভদ্র সব লোকই হুনিয়ার বলত, সে কিছু বাড়াবাড়ি কথা নয়। প্রকৃতই তাঁর রক্তে হুণদের গুণাগুণ প্রবল ছিল। চেহারা এবং অবয়বেও। আমরা সদলবলে যা মিটিং টিটিং করে সারাদিনে করতে পারিনি, তিনি তার চারগুণ কাজ ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সেরে ফেলেছেন। নিরঞ্জন সব শুনে টুনে প্রায় বোবা। একসঙ্গে ঘর, ঘরণী, চাকরী? এ একছের য্যান্, বুড়া শিব স্বযং লামইয়া আইছেন মঠের থিহা। আবেড্ডহাতি!

দুজনেই একেসঙ্গে বোরোতে যাচ্ছি, জেডামণি বললেন যে আমারও ওদিন বাড়ি ফেরা চলবে না। কাউকে দিয়ে বাড়িতে খবর পাঠাতে হবে যে আমি তাঁর কাছে আছি। গ্রামের দুএকজন তখনও বাজারে ছিল। তাদের একজনকে বলে দিলাম। খানিক্ষণের মধ্যেই আবার জেডামণির দরবারে ফিরে যেতে হবে, এমনই আদেশ। নিরঞ্জনকে তাড়াতাড়ি রায়বাড়িতে যেতে বলে দিলাম। রাস্তায় নিরঞ্জন বলল, এয়াকী হাচাইও, না হপ্‌পন্? মুইতো কিছুই 'উদা' পাইতে আছি না, ক্যারেই বা বিয়া করমু, ঘরই বা দেবে কোন হানে। মোটমাট এডার পইদ্যাডা কী?

পাঠক-স্বার্থে টীকা প্রয়োজন। হাচাইও অর্থে সত্য, 'হপ্‌পন্' মানে স্বপ্ন আর 'উদা' অর্থে উদ্দেশ্য। 'পইদ্য' কথাটির সঙ্গে পাঠকের হয়ত পূর্বপরিচয় থাকা সম্ভব, তথাপি জানাই অস্যার্থ 'পদ্ধতি'। আমার পাঠকেরা যথার্থ বিদগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সবাই এই ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজটির ব্যাপারে সড়গড় নন, সুতরাং টীকা। স্পর্শকাতর পাঠক মার্জনা "কোর্বেন"।

বললাম মানা আছে, তোমারে এহনই কিছু কওন যাইবে না। অন্য কোনো দাবি দাওয়া আছে কিনা, হেইয়া কও। জেডামণি, মোতাকাকারে কইয়া দ্যাখথে পারি। তয়, বেশি কিছু কইওনা, মাইয়ার বাপে কৈলোম পেরায় খয়রাতইয়া।

—কিন্তু ঘড়ি, আঙ্গুট আর এউক্কা ট্যানজিস্টার, হেয়াতো দেতেই অইবে। যাই অই, জামাইর এট্টা সম্মান নাই? বংশের দিক্ দিয়াওতো কইতে পারো, কুলিনই।

—ঠিক আছে, কইযা দেখমু হ্যানে। তয়, খুব এট্টা সুবিধা অইবে বলইয়া বাসি না। এসব সোমাজের মাইন্যতার ব্যাফার।

—তয় কৈলোম মুই হাডা দিমু। মুই কৈলোম খুব উচা বাওনের ঘরের পোলা। রায় মশায়রে কথাডা কইয়া দিও। এসব খালি অডার করলেই অয় না।

আচমকা তার এই বামনাই গোঁ দেখে খুব যে অবাক হলাম এমন নয়। বিয়ের ব্যাপারে এমন হয়। পাত্রদের তবে ভয় হলো, ব্যাটা সত্যিই কিছু বেমৎলব চালবাজি না করে। বললাম, ঠিক আছে। তুমি এহন রায় মশায়ের বাড়ি যাও,

আমি ব্যাপারডা বুজইয়া আইতে আছি। অন্য কোনোহানে যাইও না যেনো। বললাম বটে, তবে ওর ভাবসাব আমার সুবিধের বোধ হল না।

জেডামণির দরবারে এসে সব জানাতে মোতাকাকা এবং তিনি প্রায় সমস্বরে বললেন, তুই এহনই অর পিছে পিছে যা। হারামজাদা য্যানো ঘাপটি না মারে। কী বুজইয়া কী করবে, কওয়া তো যায় না। কাইল পর্যন্ত চোক্ষে চোক্ষে রাখফি, না পলায়। আর শোন, যাওয়ার পথে ছোডো মোতারে এটটু ক্যাওরে দিয়া খবর পডাইয়া যাইস, য্যান এই হানে অবশইশ্য দেহা করে এহনই। খুব জরুরী। হ্যারে ছাড়া কাম আউগগাইবে না।

'ছোডোমোতা' বলতে মোতাহেদ। আমাদের ঐ সময়ের নামকরা কাহার। লাঠিয়াল ছাড়াও ডাকাত হিসাবে খ্যাতি আছে। কিন্তু তাকে কেন? তাহলে কী বিয়ে করতে যারা এসেছে, তাদের ঠেঙিয়ে বিয়ে করার কথা ভাবছেন এই মুরুব্বিরা? অবশ্য ছোডোমোতাকে নানান কাজেই এঁদের দরকার হতে পারে। কিন্তু এসব নিয়ে প্রশ্ন করা চলবে না। যা জানিনা, তা জিজ্ঞেস করাও চলবে না। শুধু যা যা এঁরা বলবেন, চুপচাপ তামিল করে যেতে হবে। কিন্তু সে যা হোক, দলের সবাইকে না বলে তো যাওয়াটাও ঠিক হবে না, তাই তাদের উদ্দেশ্যেই আগে গেলাম। কিন্তু সেটাই ছিল মারাত্মক ভুল। ছোডো মোতাকে খবর দিয়ে, দলের সবাইকে সব কথা বলে, যখন রায়বাড়িতে ঢুকব, রাস্তার মুখেই তাঁদের 'পরবাস্যা' কাম্‌লা খাদেম একটি চিরকুট আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, মাজইয়া ঠাহুরে আপনেরে দেতে কইছে। অনিশ্চিত সম্ভাবনায় বুকের ভিতরে একটা কাঁপন ধরল। আলোতে গিয়ে চিরকুটটা পড়ে কাঁপুনিটা দশগুণ বেড়ে গেল। তাতে লেখা, যা যা চাইলাম, সেয়া যদি না পাই তবে বিবাহ করিতে আপইত্য আছে। খবর খাদেমের নিকটে বলিবা। আমি তাহার নিকটে জানিয়া লইব। তার মানে জেডামণি এবং মোতাকাকার আশঙ্কা সঠিক। কিন্তু সে পালালো কোথায়? খাদেমেব কাছ থেকে সে জেনে নেবে। মানে? মানে খাদেম জানে সে কোথায়? খাদেম সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলের পরবাস্যা অর্থাৎ পরবাসীয়া মরশুমী কামলা। স্বভাব ভীরু। প্যাঁচঘোঁচ বোঝে না। একটু কযে ধমক দিয়ে জেডামণির ভয় দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে বলল যে সে ঠিক কোথায় তা খাদেম বলতে পারবে না বটে, কিন্তু ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে মীরাকাডির ঠোডায় তাকে দেখা করতে বলেছে। শুনে, সোজা আড্ডায় গিয়ে যীশুদাদের বললাম। ভাগ্যিস তখনও তারা ওখানে ছিল। যীশুদা জিজ্ঞেস করল, রায়মশায়গো খবর করইয়া আইছ?

—নিরঞ্জনইয়ারে না লইয়া? খ্যাপ্‌ছো? আগে হ্যারে পাই।

ঠিক হলো এরা সবাই 'মীরাকাডির ঠোডায়' গিয়ে নিরঞ্জনের আসার অপেক্ষায় ঘাপ্‌টি পেতে থাকবে। খাদেম তার সময় মতই যাক্‌। আমি রায়বাড়িতেই থাকব। জেডামণির সব কাজকর্ম সেরে ফিরতে ফিরতে রাত হবে ঢের। এর মধ্যে নিরঞ্জনকে নিয়ে যদি এরা ফিরে আসে ভাল, নচেৎ আমি জেডামণির কাছে ভাল মানুষ সেজে বলব, নিরঞ্জন এখানে আসেইনি।। চিরকুটের কথাটা চেপে যেতে হবে। আর যদি তাকে ইতিমধ্যে পাওয়া যায় তো যা ব্যবস্থা নেবার মুরুব্বিরাই নেবেন। পরিকল্পনায় কোনো 'তিরুডি' রইল না। মঞ্জুদা শুধু বলল যে সে বাড়ি যাবে এবং তার বোন ফুরকুতিকে নিয়ে যথাসম্ভব সন্নকে খানিক তালিম দিয়ে তৈরি করে রাখবে, যদিও আসল বৃত্তান্ত গোপনই থাকবে। তার দৃঢ়বিশ্বাস, নিরঞ্জনইয়া পলাইয়া বাচতে পারবে না। রায়মশায়ের দিষ্টি শনির দিষ্টি, এয়া এড়াবার সাইদ্য কোনো মনুষ্যের নাই।' তার একটাই হাউস 'সন্নরে দিয়া বিয়ার আসরে ঐ বুড়ইয়া হালার পো হালারে হে বাপ ডাহাইয়া ছাড়বে। সন্ন সভার মইদ্যে বড় গলায় কইবে আপনেরে মুই বিয়া করতে পারুম না। আপনে মোর বাপ।' সবই ঠিক, কিন্তু যদি জেডামণি জানতে চান যে নিরঞ্জন যে আসেনি, তা তাঁদের জানাইনি কেন? বুকের মধ্যে যেন মেঘ গুড়গুড় করতে লাগল।

চার

মনে একরাশ ভয়। 'জেডামণি' কে মিথ্যে বলে পার পাওয়া প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার! নিরঞ্জনকে পাওয়ার আগেই যদি তিনি বাড়িতে এসে পড়েন, প্রথম ধাক্কাটা তো আমার ওপর দিয়েই যাবে। তিনি হয়ত মোতাকাকা এবং আরও সব সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে এতক্ষণে বদল বিয়ের আরও অনেক আয়োজন সেরে ফেলেছেন। এমতাবস্থায় বদল পাত্তর যদি 'পলাপলি' খেলা শুরু করে কোন্‌ মুরুব্বির মট্‌কা ঠান্ডা থাকে? যাও একটা কাজ দিলেন, নিজের দোষে দিলাম তার ভুষ্টি নাশ করে। হঠাৎ করে যাতে সামনে না পডতে হয়, সেজন্য বাড়ির মধ্যে না থেকে বড় খালটার এক নির্জন কিনারে গিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলাম। এর ঠিক উল্টোপারের খানিক দূরে সন্নদের বাড়ি। ওখান থেকে গানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তখনও গ্রামের বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষ্যে মেয়েরা গান করত। সুরের ধরনে বুঝতে পারছিলাম গানের কথা, নইলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছিল না ঠিক, কোন্‌ গানটা গাইছে মেয়েরা। তারা কনের বয়ানে গাইছিল,

এখন কেন কান্দরে বুইন
খেলার সাজি লইয়া

যখন লইয়াছ কড়ি
গুনিয়া বাছিয়া।

আবার কনে সাজাবার গানও গাইছে তারা—

আয়লো 'ডলি' সাজাবো তোরে
চেয়ারে বসাইয়া
আয়লো ডলি সাজাই তোরে
হলুদ মাখাইয়া। ...

এইসব গান, কখনো 'হলুদ মাখাইয়া', কখনো 'ছোনো মাখাইয়া' কখনো বা আলতা পড়াইয়া হচ্ছিল। কিন্তু গান কী আর মরমে ঢোকে তখন। মন রয়েছে উৎক্ষিপ্ত। একবার ডানদিক, একবার বাঁদিক তাকাচ্ছি। ডানদিকের থেকে কারুর সাড়া পেলে ভাবছি যীশুদায়েরা নিরঞ্জনকে বন্দি করে নিয়ে আসছে বোধহয়। বাঁদিক থেকে জেডামণির আসার কথা। খাদেমের কথামত নিরঞ্জনের ওখানে আসার সময় হয়ে গেছে মনে হয়। কিন্তু কারুরইতো পাত্তা পাচ্ছি না। শুধু ভাবছি, এতসব কাণ্ড করে কী শেষ পর্যন্ত বদনামের ভাগী হব।

হঠাৎ ডানদিক থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে ছুটতে ছুটতে খাদেম এসে উপস্থিত। আমাকে ওখানে দেখবে আশা করেনি। বলল, ধরা পড়ছে, ধরা পড়ছে। ওনারা ব-মাল আইতে আছেন। কোনো চিন্তা নাই, এহন বাড়ি লয়েন। খাদেমকে ওরা অগ্রদূত করে পাঠিয়েছে আমার কাছে, যাতে জেডামণি এসে পড়লে আমাকে উপরে কন্টক হেঁটোয় কন্টক দিয়ে নেড়ি কুত্তার ভোজ না খাওয়ানো হয়। ডালকুত্তা এতোদ্দেশে দুর্লভ বলেই শুধু নয় নেড়িরা বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে সময় নিয়ে খায় কিনা! কিন্তু সে যা হওয়ার হতো, তখন খাদেম শুধু জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছে, ও ন্যা ভাই, হেনায়তো মানুডা ভালো। তয়, ওরহম বান্দ্‌লে ক্যা? চুরিটুরি করছে নাহি? আর যেরহম ধাবাড় টাবার দেতে আছে, মোনলয় কিছু চুরি করছে। কী চুরি করছে? ও ন্যা ভাই? হাস না মুক্‌রা (মুরগি), নাকি ট্যাহা পয়সা? অনেক কষ্টে সেদিন তাকে বোঝাতে হয়েছিল যে সেসব কিছু নয়, তবে তার চাইতেও বড় একটা অন্যায় কাজ সে করেছে। কিন্তু খাদেম শুধু বিড়বিড় করেই চলছিল। ইস্, একখান মুহি যা হ্যারে মারছে যীশুদাদায়, মোর পেরাণডা একছের ফাড্‌ইয়া যাওনের যোগার। কী সুন্দর পাট কয় মানুডা, আহা! —কাণ্ড কী একটা? সব ঘটনা বলতে গেলে খেই রাখতে পারব না। পুরোনো স্মৃতির সায়রে হঠাৎ যেন ঢিল পড়েছে। সব ছবি আর কাহিনিগুলো জড়াজড়ি করে একসাথে উঠে আসতে চাইছে। উপলক্ষ্য একটাই, এই ব্রিজ আর নিরঞ্জনের সেই কাঁচা বাঁশের ঘরের ভিত্‌টা। যাহোক, এবার মোদ্দা গপ্পটুকুন বলে কথা শেষ করি।

রাতে সেদিন সভা বসেছিল রায়মশাই-এর বাড়ির বিস্তীর্ণ উঠোনে। মোতাকাকা প্রথমেই প্রস্তাব দিলেন, ছ্যামড়াগো হারাদিন 'পেহার' গেছে ম্যালা। মিডিং শেষ অইতে তো হেই রাত্তির কাবার। তো, মুই কই কী? কই বলে, খাওন দাওনের ব্যবস্থাডা এহানেই হউক। খাদেম যা, মোর বাড়ি গোনে বড় খাসিডা জবাই করইয়া বেয়াক গোস্তোডুক লইয়ায়। বাকি এহানে বাড়ির মইদ্যের এ্যাঁরা করবেন হ্যানে। কী কয়েন দাদা? দাদার তখন রসাবস্থা মধ্য গগনে। শুধু ঘাড়টা কাৎ করে সায় দিলেন। সবার মধ্যে উত্তেজনা যেন চারগুণ বেড়ে গেল। রাত কত, সেটা এখানো কোনো প্রশ্ন নয়? আগামীকাল সন্নর বিয়ে। তার বাপ খয়রাতি মানুষ কী করেছে না করেছে জোগাড় যন্ত্র, জানা নেই কারুর। সুতরাং জেডামণি তার রসাবস্থা কাটাতে দুর্গামণ্ডপের পিছনে চলে গেলেন। ওখানে তেঁতুল গোলা জল আছে রাখা। যীশুদা কানে কানে বলল, বইমি করতে গ্যাছে, না অইলে তো হাউলকা অইয়া কামের কতা কইতে পারবে না। বইমিটইমি করইয়া, পুহইরে হাতমুখ মাথায় জল দিয়া, হ্যাষে আরাম্ব করবেন সভাডা। অবইস্য বস্তু চলতেই থাকপে। ও বস্তু ছাড়া বড় রায় মশায় এর বুদ্ধি সরে না।

মোতাকাকা ইতিমধ্যে ছোডোমোতাকে বললেন, তুই তোর দলবল লইয়া তয় যা। বাশ যে কয়ডা লাগে মোর বাড়ির থিহা কাড যাইয়া। বড় গ্যাদারে কইস যে মুই অডার দিচ্ছি। আর নাইরখোলের বাইল এ বাড়ির থিহা কাডা। কাত্তিকইয়ার দোকানডা খোলা রাখতে কইস, দড়িটড়ি যা যা দরকার লিষ্টি করইয়া নিবি। কাম কাইল সয়ন্দ্যার মইদ্যে খতম হওন চাই। আর হ, বেড়াডা য্যান হোগোলের অয় বাইল পাতার বেড়া দুইদিনে পচ্ইয়া যায়।

—হোগোল দেবে কেডা? ছোডোমোতা জানতে চায়।

--গেদু মেঞার গোলায় আছে না?

—হেহানে দরমা বাশের বেড়া আছে, হোগোল নাই। দরমই বালো অইবে।

- তয়, হেইয়ারই হউক আরও পোক্ত অইবে হ্যানে। ছ্যাম্ড়ার নছিবডা বালোই কী কও? খরচাডা ডবল পড়বে, তয়, কইলি যহন হেইয়াই দে।

—চাচা?

—কী?

—দুলা দুলাইনের লইগ্যা একখান বাঁশের ছাপ্পরখাড বানামু নাহি বাহারইয়া? আসলে সাদি, বিয়ার ব্যাফারতো, হাউস রসও তো থাহে মাইনসের। না-কী কয়েন?

—হেয়াতো খুবই বিবেচনার কথা কইলি। না, ডাহাইত অইলেও তোর দিলডা বড় ভাল। আল্লামাবুদ তোর ভাল করবে। তয় যা এহন। এক ফাঁকে দলবল

লইয়া খাইয়া যাইস্। আল্লাহ্ তোমার শোকর গুজার করি, কামডা মিডাইয়া দেও সহি সলামৎ।

রায়মশাই অন্তরস্থ বদরস বের করে দিয়ে সুস্থ হয়ে এসে কাকাকে জানালেন যে ক্যাওরে এট্টু মেথর বাড়ি পাডান লাগবে, দইব্য শ্যায। কাগজ কলম নিয়ে, অতঃপর জেডামণি বসলেন হিসাব পত্তর কযতে। কী কী দরকার, কতজন লোক খাবে, নিরঞ্জনইয়ার দাবি দাওয়া খাস-খাইসলত কী, কোন্ কোন্ দোকান থেকে সেসব নেওয়া হবে এবং তার দাম দস্তুরের টাকা পযসা কীভাবে জোগাড় হবে সবই লেখা হলো। স্থির হলো বাজার কমিটিকে এর জন্য চাঁদা তুলতে হবে। সর্বশেষ বিবেচনা নিরঞ্জনের বিষয়ে। জেডামণির স্টক ততক্ষণে এসে গেছে। সুতরাং তাঁকে আবার মণ্ডপের পিছনে যেতে হলো। যাওয়ার আগে আদেশ, ঐ হারামজাদারে মজলিশে লইয়ায়। হারামজাদা এখানে নিরঞ্জন।

পিঠমোড়া বাঁধা অবস্থায় তাকে সভায় আনা হলে সে বড় করুণ কাতর বিলাপ জুড়ে দিল। 'ও মাআগো, মোরে মারইয়া ফ্যালাইলে এ্যারা, মুই বাড়ি যামু। মুই মায়ের ধারে যামু, মোরে আপনেরা ছাড়ইয়াদেন। মুই বিয়া করমু হ্যানে,'— ইত্যাদি বলে তার করুণ আকুতি অবশ্য আমাদের মজাই বাড়াচ্ছিল। কিন্তু— মোতাকাকার দযার শরীর। বললেন, যীশু অরে ছাড়ইয়া দেও বাপ, মাইনে বান্দোনডা খুলইয়া দেও। আহা, কাইল পোলাডার শাদি মোবারক আইজ এতো পেহার, হেডা উচিত না। আল্লায় ওথে নারাজ হয়েন। হিন্দু কও আর শ্যাক কও, শাদি এ্যট্টা ফরজের কাম, হেহানে এই সব কাম একছের না-পাক্! তুমি বাপ কান্দইও না।

তুই পলাইলি ক্যান্? জিজ্ঞেস করতে করতে জেডামণি সভায়। নতুন করে চার্জড হয়ে এসেছেন গলায় একটু উদার স্নেহভাব। আমি জানালাম, আইজ্ঞা ও ওইসব না পাইলে বিয়ার পিড়িথে বইবেই না কইছে। এট্টা ট্যানজিস্টারও নাকি দেতে অইবে। গান শোনবে।

ঘড়ি আঙ্গুট পাইবে হ্যানে। ট্যানজিস্টার না কী, হেডা অইবে না। জিগা রাজি কিনা। যদি রাজি না অয়, মোতা, বাউকাডিতে এট্টা ছ্যামড়া আছে না, ঐ কী যেন নাম?

মোতাকাকা উত্তরদেবার আগেই নিরঞ্জন কাঁইমাঁই করে বলে উঠল, না রায়মশায় মুই রাজি একছের রাজি, এই সভাস্থ কইতে আছি, মুই যদি বিয়া না করি মোর নামে কুত্তুর পুষইয়েন। খালের পেরিব তলায পুতইয়া রাইখ্যেন। মুই একছের রাজি।

ব্যস্ তারপরের কথা আর কী। পরদিন গোধূলিতে শ্রীমতী সন্নলতার সঙ্গে শ্রীমান নিরঞ্জন উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। কিন্তু কথা হলো, কাজটা খুব নির্বিঘ্নে হলো না। আমাদের আব্দারে হোক, অথবা মোতাকাকা আর জেডামণির চক্রান্তে, 'বুড়ইয়া' বর আর বরযাত্রীদের সেদিন বেশ কিছুটা আক্কেল সেলামি দিতে হয়েছিল। রমণী ঠাকুরের কাছে টাকা ফেরৎ চাইতে সভার মধ্যেই সন্ন বুড়ইয়াকে বলেছিল আপনে মোর বাপ। মাইয়ার বিয়ায় টাহা দিয়া কেউ ফেরৎ চায় ? তবে মোতাকাকা তাদের না খাইযে যেতে দেননি। বিযেবাডি থেকে কেউ না খেযে যায় ? ছিঃ। বিশেষ করে খাওনোটাতো হযেছিল তাদেরই পয়সায। বাড়তি খরচও কিছু হয়েছিল। শুনস্য 'শুনিয়াব' জেডামণি সেটাও নাকি বুড়ইযা বরের কাছ থেকে আদায করেছিলেন। তবে সেটা সরাসরি নয। সকালবেলা বুড়ো বরের বড় ছেলে আমাদের ব্যবস্থা মতো এসে গিয়েছিল। তার সঙ্গেই কীসব বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন জেডামণি। তাকে অবশ্য চেঁচামেচির সময় বিয়ের আসরে আনা হয়নি। সব শেষ হলে সে এসে তার বাপকে বলল, বাবা বাড়ি চলেন। বুড়োর আর কথা সরেনি। মঞ্জুদা বলেছিল, হেই ভুঁই মালি রাড়ি মাথারিও নাকী আইছে ?

সবকিছুই ঠিকঠাক মতো মিটে গিয়েছিল। নিরঞ্জন আর সন্নকে ঐ রাতেই একদিনের মধ্যে তৈরি এই বাড়িতে বাসর বাস করিয়েছিলাম আমরা, ছোডো মোতার তৈরি মেজের মধ্যে পোতা পায়া-অলা বাঁশের ছাপ্পর খাডে। অপূর্ব সেই পালঙ্ক। গোটা রাত বাসর জাগার সেই স্মৃতি এখনও আমার চোখের সামনে যেন ভাসছে। শুধু একজনই সেদিন সেখানে ছিল না। সে যীশুদা। হুল্লোড়ের মধ্যে কেউ তার খবরও রাখেনি সেদিন। ব্যাপারটা একটু বেশি মাত্রায় মেলেড্রামাটিক হযে গিয়েছিল। কিন্তু তখনকার আমলে পাড়া-গাঁয়ে এটাই ছিল বাস্তব।

কতক্ষণ ব্রিজটার ওপর দাঁড়িয়ে আন্‌মনা এইসব ভাবছিলাম খেয়াল নেই। বেলা চডতে শুরু করেছে। এবার এগোতে হবে। প্রথমে বাজারটাতে খোঁজ নেব। বহুকাল বাদে দেশে এলাম। কাকে পাব, কাকে পাব না জানি না। তবে যারাই থাকুক, বাজারে তাদের সবাইকেই পাব। জানি তো, কাজ থাকুক, না থাকুক, কেনা কাটা, সওদা-পাতির দরকার হোক না হোক, কোনো না কোনো চায়ের দোকানে একবার অন্তত, আড্ডায় তারা উপস্থিত হবেই।

খানিক আনন্দ-প্রত্যাশা এবং অনেকটা স্মৃতির বিষণ্ণতার ভার বুকে, মাথায় নিযে, ব্রিজটা থেকে মাটির রাস্তায় নেমে এলাম। রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটা বুড়ো কডাই গাছ থেকে এক রাশ পাতা সারা শরীরে ঝরে পড়তে মনে হল, আমি যেন একটা দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। যাঁরা নগর বৃত্তে বরাবর বাস করছেন, তাঁদের আমার এই বিবর্ণ পাড়াগেঁয়ে ছেলেবেলাকার কথা ভাল লাগার

কারণ নেই। সে প্রত্যাশাও আমার নেই। তবে সব মানুষের মনের কোনো একটা অলিন্দে থাকে বোধহয় এমন একটা জায়গা যেটা অবস্থা গতিকে সময়ে অসময়ে সামনে বড় প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। সেই জায়গাটিতে থাকে একটা শান্ত নিবিড়তা। সেখানে যে কত মানুষের ভীড়, তার আর শেষ নেই। এবং আশ্চর্য তারা কোনোদিন তাদের অবয়ব বা প্রকৃতি পাল্টায় না। সেইসব মানুষ এবং তাদের নিয়ে যে সব পরিপার্শ্ব, বা সেই সময়টা, তখনকার নিসর্গ, তাদের সামগ্রিকতা নিয়ে যখন মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, তখন বড় হুলুস্থুলু লেগে যায়। এরকম ব্যাপার স্যাপার তখনই হয় যখন আমার মতো শিকড়ছেঁড়া মানুষ অকস্মাৎ বা সেই শিকড়ের কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়। ছেঁড়া শিকড় জোড়া দেওয়া সম্ভব নয় জেনেও, আমার মতো মানুষেরা খ্যাপার মতো ছোটাছুটি করে সেই প্রচেষ্টায়। তাতে শুধু ভেতরে ভেতরে রক্তাক্তই হতে হয় বেশিটা। তবে তাকে তুচ্ছ করে, অতিরিক্ত যেটুকু পাওয়া যায়, তার আয়ু স্বল্প দৈর্ঘ্যের হলেও, বড় কম দামি নয়। অন্তত আমার কাছে। অতিরিক্ত যেটুকুর কথা বললাম, তা মানুষ নামক গাছপালার রূপকথা। রূপকথা, তবে তার সবটারই সুখ-সমাপ্তি নেই। দুঃখের ভারে তা বড় বিষণ্ণতায় নুয়ে পড়া। তবু তা উত্তীর্ণ হওয়ার অলৌকিক স্পর্ধা আছে এদের।

মানুষ নামক সেই গাছপালাদের কথারই আরও কিছু স্বরলিপি নিয়ে আমার অতঃপুরের পথ চলা। যার মধ্যে সন্নর কথাই প্রধান। আরো অনেকেরই কথা সেই সঙ্গে, যাদের কাছে এসেছি।

পাঁচ

মেঠো পথ এবং সেদিনের বান্ধবেরা

আপাতত কিছুক্ষণ বিক্ষিপ্তভাবে হলেও, বেঁচেবর্তে থাকা দু-চারজন বাল্য বান্ধবদের নিয়ে প্যাচাল পারব।

ব্রিজটার যেদিক থেকে এসেছি, আগেই বলেছি সেদিকটা অ্যাসফল্টের। সামনের দিকটা এখনো মাটিরই রয়েছে। আসার পথে দুএকটা গাছ বা নালা, কিম্বা পুরোনো খয়াটে খর্বুটে মঠের অবশেষ সামান্য স্মৃতি-আলোড়ন তুলেছিল বটে। তবে তা যথেষ্ট মন খারাপের কারণ হয়ে ওঠেনি। ব্রিজটার উপর ওঠে দাঁড়াতেই তার আশপাশের ঝোপঝাড় জঙ্গল, সামনের মাটির রাস্তাটার অকস্মাৎ উদ্ভাস এবং অবশ্যই ব্রিজের নীচে বয়ে চলা খালটা আমার অতীতকে যেন একেবারে সাক্ষাৎ জীবন্ত করে তুলেছিল। স্মৃতির জগতে এভাবে আচমকা ঢুকে পড়ায় একটা দ্বিমাত্রিক বোধ একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল হলো। সেটা, বলাই বাহুল্য, বিষাদ এবং মধুরতার। মনে হচ্ছিল, ব্রিজের এই কংক্রিট অংশটুকু পেরোলেই আমি যেন সেই আশ্চর্য জগতে ঢুকে পড়তে পারব। সেখানে যীশুদা, মঞ্জুদা, কেষ্ট, ধলু, বিলায়েৎ, রজ্জাক, সন্ন, হেলেন, হক এবং আরো আরো সবাই অপেক্ষা করে আছে। যেন তারা সবাই আজও সেই বয়সটাতেই স্থির হয়ে আছে। কালের চাকা তারপর থেকে একটুও গড়ায়নি। এবং না গড়ানোটাই কালের একমাত্র নিয়ম। এবং অত্যন্ত গভীর এক হ্রদের তলদেশের স্থিরতার মতই তা অচঞ্চল। প্রবাহটাও শুধু উপরিস্তরের। যেন প্রবাহ ব্যাপারটা একটা মায়া মাত্র। স্থিরতাই সত্য একমাত্র এবং তার কোনোই ব্যত্যয় নাই।

মাটির রাস্তাটায় পা পড়তেই সারা শরীরের আবেগ প্রায় দশ গুণ। চরিত্রগত ভাবে আমি শৈশব থেকেই ভীষণ আবেগপ্রবণ। কারণে অকারণে, খালি চোখ ফেটে জল আসে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। শরীরে রোমাঞ্চ হয় এবং এমন সব ইচ্ছা বুকের মধ্যে। মনের মধ্যে, দাপাদাপি করে যে তার সামান্য কিছু মাত্রও যদি কাজে প্রকাশ করে ফেলি, লোকে আস্ত পাগল ছাড়া কিছু বলবে না। যেমন,

এক্ষুনি আমার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে যে মাটির এই রাস্তাটার ধুলোর মধ্যে একবারটি গড়াগড়ি দিয়ে উঠি, আশপাশ কিনারের ঘাসের ঝুঁটিগুলি আঁকড়ে ধরে চুমো খাই, আর বলি, আমি তেমনই আছি। আমার মাথার চুল সাদা হয়নি, গায়ের চামড়া কোঁচকায়নি, মুখে কোনো বলিরেখা নেই। আশ্চর্য, অ্যাস্‌ফল্টের রাস্তায় আমার এমন আদৌ মনে হয়নি। তখন মনে হচ্ছিল, আমি বহু বহুকাল পরে এখানে এসেছি। সব কিছু কেমন পাল্টে গেছে। আমি নিজেও নিশ্চয় অনেকই পাল্টে গেছি। বুড়ো হয়েছি। এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, নিরঞ্জনের বিয়ে এই কয়েকটা মাত্র দিন আগেই না দিলাম। সেদিন আমরা কয়েকজন, কাজ কম্ম সারা হলে, এই রাস্তায় আহ্লাদে গড়াগড়ি খেয়েছিলাম। অতীত আর বর্তমান কেমন যেন মিশে যাচ্ছিল। আমি কালহীন এক বোধের মধ্যে যেন হারিয়ে ফেলছিলাম নিজেকে। এই কথাটা অর্থহীন মনে হলেও আমার এরকমই একটা অনুভব হচ্ছিল তখন।

আপনে কেডা ?

খেয়াল করিনি, লোকটি কখন থেকে এসে আমাকে লক্ষ্য করছিল। চেক্‌কাটা লুঙ্গি এবং সাদা কাজ করা পাঞ্জাবি পরণে। গোঁফহীন দাড়ি, বেশিটাই সাদাছোপ্, বয়সটা আমারই মতন। মাথায় কিস্তির টুপি। চোখ দুটি দেখে চেনা চেনা মনে হলো। তবে এখানকার সবাইকে দেখেই আমার তা মনে হয়েছে, যতক্ষণ দুচার জনকে আসা যাওয়া করতে দেখেছি। অবশ্য অন্যমনস্কভাবেই।

পরিচয় বললাম বাড়ির সূত্রে। নামটা বললাম না। দেখি, নিজের থেকে কারুর কথা যদি জিজ্ঞেস করে।

'হ্যারাতো পেরায় চল্লিশ বছর দ্যাশ ছাড়ছে। তয় মনে আছে, হ্যার গো কতা। মোর একজোন দেলের দোস্তো আছেলে ওই বাড়ির পোলা। আপনের নামডা যানো কী ?—'যানো' কথাটা এখানকার নিজস্ব ধরণ। হঠাৎ শুনলে ওর ব্যবহারটা অকারণ মনে হয়। নাম বলতে মিঞার বয়স কমে গেল তিরিশ বছর। 'তয় হেইয়া ক'। মুই ভাবি বেভ্‌ভুলা মানুডা কেডা ? আরে মালাউনের পো মালাউন মুই জব্বার, জব্বারইয়া, হ, যবন জব্বারইয়া। কবে আইলি ? ওঠ্‌ছো কোথায় ? তুই তো হেই মুক্তি যুইদ্দের পর একবার আইছিলি না ? জব্বার আমাকে মালাউন বলতো আর আমি তাকে যবন।

হ, কিন্তু একবার ক্যান্। আমি তো বেশ কয়েকবারই আইছি। তয়, এক আধদিন থাইক্যা শহরে যাই গিয়া, হ্যার লইগ্যা বেয়াকের লগে দ্যাহা সাক্ষাৎ হয় না।-বস্তুত, আমার আকাঙ্ক্ষা থাকে যে এখানে এসে গ্রামেই বেশির ভাগ দিনগুলো কাটাব। কিন্তু নানা কারণে, তা আর হয়ে ওঠে না। প্রধান কারণ, বুদ্ধিজীবী বান্ধবদের নগর পারের হাতছানি।

কিন্তু জব্বারইয়া, তুই? বললাম—তুই দেহি একছের মুছুল্লি অইয়া গেছ? চোহারাডারে এয়া করছ কী? বাহাত্তের সালেও তো তোরে কী সুন্দার দেখছিলাম।

—শ্যাহেরা বুড়া অইলে এই রহমই অয়। নিজেরও তো ছুরাৎ একছের বাইয়া পড়তে আছে। যাউক, ওঠ্‌ছো কোতায়?

এহনও ওড্‌লাম কই? আইছি তো কাইল রাইতে। গঞ্জে আছেলাম হকের বাসায়। বেয়ানে উড্‌ইয়া হাডা দিছি, যেহানে যাইয়া ঠেহি। হৌর বাড়িও যাইতে পারি, হ্যারাতো আছে এহন তামাইত এহানেই।

না, হেয়া অইবে না। আইজ মোর মাইয়ার শাদি মোবারক। মুই ঘণ্টা কয়েকের লইগ্যা এট্টু গঞ্জের দিকে যামু। এই রাস্তায় খাড়ইয়াই তোরে দাওয়াত দিলাম। এই ফাকে তুই হৌর বাড়ি, বাজার, যেহানে যেহানে দেল চায় ঘুরইয়া আয়। শ্যাষ ম্যায ধল্‌উয়ার দোকানে থাহিস্, ফেরার পথে লইয়া যামু হ্যানে। মোর আইথে সযন্দ্যা পেরায়। ম্যালা কাজ আছে।

হৌর বাড়ির থিহা যদি না ছাড়ে? এদ্দিন পর আইছি।

হেয়া অবইশ্য ঠিক। তয় ধলুর ও হানেই থাহিস। রাইতটা আমার। অনেক কতা আছে পেরানের, হুন্‌বি হ্যানে।

জব্বার প্রায় হুকুম জারি করে চলে যায়। যতক্ষণ কথা বলছিলাম, বেশির ভাগ সময়টাই হাতে হাত ধরা, বা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরা চলছিল। পুরোনো পরিচিত এবং বন্ধু বান্ধবদের কথা যতটুকু জানতে চেয়েছি। তারা কেউ কেউ মারা গেছে, কেউবা দেশ বা অঞ্চল ছাড়া। ধলু আছে। ক্লাশ ফাইবে ওর সাথে পড়েছিলাম। সেই একবছরই। তারপর আর পড়েনি ও। গরীব ধোপার ছেলে। পরে অনেক কষ্টে একটা মুদি দোকান দিয়ে বাজারে বসেছিল। সেটা তাহলে আছে। ইশ্‌কুল ছেড়ে দিলেও যতদিন দেশে ছিলাম, ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। যতই বাজারের দিকে এগোচ্ছিলাম, মনের মধ্যে আকুলি বিকুলি, কাকে দেখব, কাকে দেখব না। অ্যাস্‌ফল্টের রাস্তায় এসব চিন্তা মাথায় ছিল না। এখন একে একে কতজনের কথাই না মনে পড়ছে! জীবনটা যে কত পাকে পাক খাইযে আবার এই উৎসে নিয়ে এলো! মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন একটা ভবঘুরে। উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, ছন্নছাড়ার মতো কোন্ সুদূর কাল থেকে ঘুরে মরছি। পথে প্রান্তরে কত মানুষ, মানুষী, প্রাকৃত মন্ডল নিরন্তর আমাকে বাঁধতে চাইছে। আমিও চাইছি বাঁধা পড়তে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্ব জুটছে না আমার কপালে। ব্যক্তি নয়, পরিবার নয়, সমাজ নয়, রাষ্ট্র নয়, এমন কী, কোনো আদর্শও নয়, কারুর বন্ধনেই বাঁধা পড়ি না আমি। অথবা সবাই আমাকে বাঁধে বলেই, বিশেষের বাঁধন আদৌ স্থায়ী হয় না।

জানিনা অন্য মানুষেরও এমন হয় কিনা, অথবা এটা একমাত্র আমার মতো মানুষেরই রোগ বিশেষ, যারা সংসারে সব কিছুই অকারণে ভালবাসে।

ধলু আমাকে সহজেই চিনল। অবশ্য প্রথমে আমিই নিজের নামটা ঘোষণা করেছিলাম। আমার চিনতে অসুবিধের কথা ওঠে না, কারণ, আমিতো ওদের কাছেই আসব বলে, স্মৃতিকে সতেজ আর কুয়াশামুক্ত করতে করতেই অতদূরের পথটা পাড়ি দিয়ে এসেছি। ধলুর দোকানে একজন সাধারণ চেহারার, ধুতি পাঞ্জাবি পরা মানুষকে কৌতূহলী চোখে তাকাতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিংশতি উপসর্গের সংজ্ঞা-শোলোকটা মুখুস্থ অইছে? —সে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, হেয়া তোর এহনও মনে আছে? উঃ হে যে কতদিনের কথা। এবং পণ্ডিত মশায়ের স্মৃতিচারণা। ও 'প্র পরা অপসম' ইত্যাদি মুখস্থ বলতে না পারার জন্য পণ্ডিত মশাই ওকে শালগ্রাম শিলা নাম দিয়েছিলেন। বলতেন, তোমার তো শোওন বওন কাইত্তার হতন একোই অবস্থা। ওর পদবি নাটুয়া। পণ্ডিত মশাই বলতেন, বাবা নাড়ুয়া, এটটু খাড়ুয়া হও, শালগেরাম শিলা হইয়া থাকলে তো হারা জীবন পাড়ুয়া ঘষতে ঘষতেই যাইবে। 'পাড়উয়া' বা পাড়ুয়া অর্থে নিতম্ব, মানে শুদ্ধ অপশব্দে বললে পাছা। কিন্তু নাটুয়া একটা জাতি বাচক পদবি। নমশূদ্র। সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মশাইএর তাকে তার জাত নিয়ে কুৎসিৎ রগড় করার হক সে যুগে ছিল। জানলাম, সে এখন একটা ইস্কুলের হেডমাস্টার। এই রকমই এক আধজনের সঙ্গে দেখা হতে লাগল এবং সেই সাথে স্মৃতি-সংলাপ। এক্ষেত্রে যেটা গোটাই বিষণ্ণতা মণ্ডিত। ভালবাসার স্মৃতিও স্মৃতি, অসম্মানের স্মৃতিও স্মৃতিই।

কিন্তু এসব আর কত বলব। যতজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে সবার সাথেই তো অনেক কথা অনেক খবর বলার আছে। বলছিও। তার বিবরণ শেষ হবার নয়। ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে যে স্মৃতিরোমন্থন করছিলাম, তার রেশ এখনও যায়নি। কিন্তু যীশুদা, মঞ্জুদা, নিরঞ্জন এদের কাউকে তো দেখছি না। জেডামণি বেঁচে নেই। হিসাব মতো থাকার কথাও নয়। তবে মোতাকাকা আছেন, শুনলাম। বাজারের পিছনের দিকের গগন গণকের বাড়িটা কিনেছেন। সেখানেই থাকেন আজকাল। গগন বাংলাদেশ যুদ্ধের ঠিক আগেই পশ্চিম বাংলায় চলে গিয়েছিল; পরে একবার এসে বাড়ি জমি সব বিক্রি করে দিয়ে গেছে মোতাকাকাকে।

সন্ন আর যীশুদার কথাই জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল বেশি করে। কাউকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল যীশুদা বোধহয় সন্নকে না পাওয়ার দুঃখে বিবাগী হয়ে গিয়েছে। এখানে তাকে আর পাওয়া যাবে না। যখন তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়, তার বয়স ছিল বছর তিরিশ বত্রিরিশ। তাহলে এখন

যীশুদার বয়স পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন—এইরকম হবে। তাহলে তো সে প্রৌঢ়ত্বও অতিক্রমের পথে। ধূর আবার আমার বয়স ভুস্কুল শুরু হয়েছে। আমিও যে এখন একটা টেকো আধবুড়ো—সেকথা খেয়াল হচ্ছে না। কেন যে মানুষের বয়স বাড়ে। অবশ্য সেটা এখনকার আফশোস। সেসব দিনে ভাবতাম, কেন যে ছাই বড় হচ্ছি না! কোনো অবস্থাতেই মানুষ যেন সন্তুষ্ট নয়। বয়স ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত স্বভাবের। নিত্য গড়াবে, প্রতি মুহূর্তে, কিন্তু মন তার দ্রুততম গতি নিয়েও হামেশা যেন তার পেছনে হ্যাংলার মতো ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে, হাত পেতে, ক্যাঙ্লার মতো কচিটি থাকার আবদার জানাতে থাকবে। সন্ন, নিরঞ্জন এতদিনে নিশ্চয় গণ্ডা কয়েক ডাঙর ডাঙর ছেলেপুলের মা-বাপ হয়ে, কাচা-পাকা চুল, কোচ্কানো চামড়া, এ রোগ সে ব্যাধি নিয়ে জেরবার। কিন্তু আমার মনে তার কোনো ছবিই ভাসছে না। সেদিনের বিয়ের চেলি, বর পোষাকে মোড়া ছবিটাই সেখানে শাশ্বত হয়ে আছে। শাস্ত্রে কী সাধে বলেছে, কালস্য কুটিলা গতি।

ছয়

হেলেন, মোতাকাকা এবং মোঃ আল্‌হজ্জ শওকাতউদ্দিন নেছারাবাদির বৃত্তান্ত

ধলুর দোকান থেকে চা, পান, সিগারেটের শ্রাদ্ধ করে বেড়োবার মুখে দেখি হক গঞ্জ থেকে চলে এসেছে। ওর আসার কথা ছিল না। গত রাতে হঠাৎ প্রায় অযাচিতভাবে ওর বাসায় যখন উপস্থিত হয়েছিলাম, ও একেবারে থ'। 'কাল আসার পথে ওর কথাই বেশি মনে পরছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের বন্ধুদের বেশির ভাগইতো দেশছাড়া। ওর কথা মনে পড়ার আর একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে, মুক্তিযুদ্ধের পরে যখন এসেছিলাম ওই বেশিটা সঙ্গ দিয়েছিল। এতকাল বাদে ইশ্‌কুল জীবনের একজন সাথীকে পেয়ে আমরা এমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম যে, সে অভিজ্ঞতা কাউকে বলে বোঝানো যায় না। যারা আমার মতো, পাকে চক্রে দেশত্যাগী হতভাগা, তারাই এর মর্ম বুঝতে পারবে, ওর বিষয়ে পরে অনেক কথাই বলতে হবে, আপাতত জানাই যে হক মতাদর্শগত ভাবে কিছুটা মৌলবাদীই ছিল, সেসব দিনে। মোতাকাকার ছেলে সে। মোতাকাকা পাক-আমলে মুসলিম লিগের অনুসারী ছিলেন বটে, তবে চরিত্রগত দিক দিয়ে আদ্যন্ত উদারপন্থী। কাল রাতে নানান কথাবার্তায় জেনেছি, বাপ ছেলের সম্পর্ক ইদানীং সরল নয় খুব একটা। কিন্তু সে সব কথা পরে, এখন যে কারণে সে তার কাজ কামাই করে গাঁয়ে এসেছে, তা হলো, তার জবানে বললে, তুই ভোরবেলা বাইর হইয়া আইলি, নাশ্‌তা পানি করলি না, 'নছিফা' কইল, হে এক কাপ চা খাইয়াই হাড়া দেছে। মুই তহন ঘুমাই। কাইলতো রাইত আড়াইডা তামাইত বাহাসে কাড়লে। বৌ কইল আইজ ছুট্‌টি লয়েন। মুইও ভাবলাম, ধুচ্ছাতা, গোলামির ক্যাথায় আগু- এ্যাদ্দিন পর আইলি। হে কারণ আইয়া পড়লাম। আব্বুজানের লগে দ্যাহা করছনি?

না এহনও যাই নাই।

যাও নায়? তয় তো হোগা মারইয়া রাখছ। ভাববে হ্যানে আমি তোরে মানা করছি। তুই এহনই যাইয়া আগে হেনার লগে দ্যাহাডা সারইয়া ফ্যালা। আর হোন, নতুন বাড়িডা চেনোতো?

গগন গণকের বাড়িডাতো? আগের বারে শোনছেলাম ওডা এহন তোগো।

হ। তয় ওঁডা কিন্তু আব্বু ন্যায্য দামেই কেনছে, জবর দখলদারি না। ভাবিস না যে কাড়ইয়া কুড়ইয়া, হ্যারগো খ্যাদাইয়া দখল করছে। হেয়া না কিন্তু। সবই একরমই আছে। মায় তুলসি মঞ্চডা তামাইত্।

ভাল। তুলসি পাতা কাশির ভাল অষুদ। কিন্তু জবর দখলের কতাডা যে কইলি হেরহম কী এদ্যাশে অয়নায়, না এহনও কোনোহানে অয়না?

অয়। অইছেও। তয় এয়া লইয়া হিন্দুরা যত কয়, বেয়াক কী সয়ত্যো? যে দ্যাশে গেছ, হেয়ানে অয়নায় এসব? না, এহন অয়না? হুনিতো কত কিছু। গেছিও তো কয়েক বার। নজরে অনেক কিছুই পড়ছে। এই যেমন, তুলসি মঞ্চের কতাডা কইলাম, তুই কইলি হেয়ার রসে কাশি ভাল অয়। মুই কিন্তু অন্য কিছু বুঝাইতে চাইছিলাম।

দ্যাখ, এদ্দিন পর আইয়া এইসব কথা আলোচনা করতে ইচ্ছা করে না। ও রহম কাম তুইও করো নায়, আমিও না। বেশির ভাগ মাইনসেই করে নায়। আবার যারা করছে, হ্যারা অমানুষের তুল্য কামই করছে। আমরা বাধা দিয়াও কিছু সুরাহা করতে পারি নাই। তয়—খালি এইডুক্ কই, ওহানের মুসলমান সমাজ কিন্তু এহানের হিন্দু সমাজের মতো এতডা অসহায় মনে করেনা নিজেগো। খারাপ ভাল সব জাগায়ই আছে। তয়, ওহানে যারা খারাপ, হ্যারা কিন্তু একছের পার পাইয়া যায় না। বাব্‌রি মসজিদের ব্যাপারডা বা আরও অনেক ঘডনাই আফশোসের, দুঃখেরও। কিন্তু হ্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন কিন্তু মুসলমানেরা হেহানে একলা করে না, হিন্দুরা সোমান ভাবেই অংশ নে। যাউক, এসব প্যাচাল ছাড়। ল যাই কাকার লগে দ্যাহা করইয়া আই। আরেকটা কথা, শোনতে খারাপ লাগলেও শুনইয়া রাখ। এহানের মতো ওহানের সংখ্যালঘুরা কৈলম যহন তহন শিকড় ছেড়া অয়না। হেড়া হেগো একলার গুণ না। যাউক, চল্।

না, আমি যামুনা। আমি এট্টু দোকানে বই, তুই ঘুরইয়া আয়। মোরে দ্যাখ্‌লেই বুড়ইয়া আইজকাইল খালি চেত্ইয়া যায়। আর এট্টা কতা হোন, ওহানে কৈলোম শওকত মেঞা গত পেরায় মাস চাইরেকের মতো তসরিফ রাখছেন। হেলেনও আছে। মুইতো খালি রাজনীতির সাখে মোছলমান, ও কৈলোম হুদা-শ্যাক্, মাইনে, হিন্দুগো নাম হোন্‌লেও হ্যার ম্যাজাক্ চিড়বিড়ায়। আব্বুজানে একছের চায়েন না যে ও এহানে আয়। কিন্তু কী আর করণ, দুলা। বাবরি লইয়া কতা ওডলে চুপচাপ থাহিস। অবইশ্য চুপ থাকতে যদি দে, তয়ই। ওডা এ্যাটটা জালিম।

হক দোকানে গিয়ে ঢোকে, আমি মোতাকাকার বাড়ির পথে চলতে চলতে হেলেনের কথা ভাবি। মেয়েটাকে, তার ছোটবেলায় বড় স্নেহ করতাম। দেশ ছাড়ার

পর, বাংলাদেশ কায়েম হলে ১৯৭২এ একবার এসেছিলাম দিন কয়েকের জন্য। হেলেনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে। শওকত তখন জেলে। সে মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন কুখ্যাত রাজাকার কম্যান্ডার ছিল, সে কারণে। হেলেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। খুবই কান্নাকাটি করেছিল সে তখন। মোতাকাকার এই বিয়েতে নাকি মত ছিল না। বিয়ের উদ্যোক্তা ছিল হক্। যুদ্ধের বছর দুয়েক আগেই হেলেনের সাদি সুদা হয়ে গিয়েছিল। বাহাত্তরে তার দুটি ছেলে দেখে এসেছিলাম। ছোট্ট ফুট্‌ফুটে। তখনও সে তার আব্বুর কাছেই। ছেলেরা এখন বড়সড়ো হয়ে কুয়েত বা আবুধাবিতে চাক্‌রি বাক্‌রি করে। শওকতকে প্রথম থেকেই তার না-পছন্দ। কিন্তু একে বাংলা দেশের পাড়া গাঁয়ের মেয়ে, তার ওপর মুসলমান জোলা পরিবারের সন্তান, তার পছন্দ-অপছন্দের ধার কে ধারে? শওকত খান্‌দানে আন্‌সারি, কিন্তু ক্ষমতা আর পয়সার হিসাবে আশরাফ্। তার পয়সা রোজগারের ফিকির নাকি বেশ গোলমালের। জেল থেকে অতএব, ছাড়া পেতে এবং জামাতের একজন মাতব্বর হিসাবে, যথাসময়ে নিজের পূর্বস্থান অধিকার করতে তার খুব একটা সময় লাগেনি। বরং সে এখন আরো অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। এরই মধ্যে হজ সেরে আল্-হজ্জ্ব হয়ে, পোষাকে, চেহারায়, বচন-বাচনে একজন পাক্কা শরীয়তী-হুকুম-আহ্‌কামি হয়ে উঠেছে। হেলেনকে এখানে রাখার কারণও পয়সা রোজগার। সুতরাং মোতাকাকার দহ্‌লিজে পৌঁছাবার আগে আমি যথেষ্ট সতর্ক হই। তাকে দেখিনি কখনো। ভয়, প্রথম বারের জন্য 'বোহ্‌নাই' সমাচারটা বে-শরিয়তি না হয়। হেলেনটার জন্য বড্ড কষ্ট বোধ হতে লাগল। কী জানি, হয়ত ওর সঙ্গে কথা বলাটাও শওকতের পছন্দ না হতে পারে। হক বলেছিল, লোকটা নাকি প্রকৃতই বে-আদ্‌দতি, বদ্ মেজাজি এবং বদমাইশও। লোকের সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করে। শ্বশুরকে ও নাকি রেওয়াৎ করে না। বড় রায়ের সুবাদে তাঁর বাড়ির সঙ্গে সৎভাব রাখার জন্য, শ্বশুরকে বে-দ্বীন 'কুফ্‌ফুর' বলে গাল পাড়ে প্রায় প্রকাশ্যেই। হকের আফ্‌শোস সম্বন্ধটা সেই করেছিল। কাকা সে কারণেই হকের উপর ইদানীং নারাজ।

মোতাকাকার পরিবর্তন স্বাভাবিক রকমেরই। বয়স অবশ্যই বেড়েছে। চুলদাড়ি ধবধবে সাদা। দেহে স্থূলতা বয়সোচিত। কিছু বৃদ্ধ লোক আছেন যাঁদের স্থূলতা দৃষ্টিনন্দন। ভেতরে ভেতরে অসুস্থতা দুর্বলতা ইত্যাদি থাকলেও, বাইরের থেকে সহসা বোঝা যায় না। এঁরা বেশির ভাগই খুব আমুদে স্বভাবের এবং ভাল মানুষ গোছের হন। মোতাকাকা সেই দলেরই একজন। কিন্তু এঁদের একটা ব্যাপারে ভীষণ রকমের গোঁ থাকে। শওকতের মতো মানুষদের সংস্পর্শে এলেই এঁরা একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে যান। তাঁদের তখন সমাজ সামাজিকতারও কোনো

বালাই থাকে না। মোতাকাকাকে তাঁর যৌবনান্ত কাল থেকেই আমরা দেখেছি। তখন তিনি মুসলিম লিগের সমর্থক ছিলেন বটে, তবে স্বভাব-সুন্দর, উদার মানুষ, শিক্ষা-দীক্ষা সাধারণ স্তরের, রাজনীতি নিয়ে খুব একটা মাতামাতি করতেন না। সেসব দিনে তাঁর শ্রেণির গ্রামীণ মানুষেরা, এখানে প্রায় সবাই মুসলিম লিগেরই সমর্থক ছিলেন। অন্যান্য স্থানের মতো, অমুসলমানদের প্রতি, সাধারণ ভাবে তাদের বিরূপতা আদৌ প্রকট ছিল না। এ কারণেই এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, লুঠ, ধর্ষণের মতো অপঘটনা কোনোদিনই ঘটেনি। ঘটার উপক্রম হলেও, তাঁরাই তা আটকে দিয়েছেন। এই সব মানুষেরা একদিকে ছিলেন লিগের সমর্থক, অন্যদিকে প্রতিবেশী হিন্দুদের প্রতি সম্ভ্রমশীল। তবে তাদের সমালোচনা করতেন না এমন নয়, এবং সেটা ন্যায্যও।

শওকত প্রকৃতই যে হার্মাদ গোছের মানুষ, হকের সাধারণ সচেতনীকরণে আমি বুঝতে পারিনি। বুঝলাম পরে। দহ্‌লিজে তখন মোতাকাকা আল্‌বোলা টানছেন। তামাক খাওয়ার চল এসময় প্রায় উঠেই গিয়েছে, কিন্তু পুরোনো দুএকজন অভ্যাস ছাড়েননি। সট্‌কা টানার সঙ্গে আভিজাত্য প্রকাশের একটা সম্পর্ক আছে। মুসলমান সমাজে যাঁরা তথাকথিত আতরাফ, তাঁরা এক সময়, বেমতলব আশরফির মালিক হলেই, এই ফার্সি আশ্‌রাফি চালটা প্রথমে রপ্ত করে তারপর বালাখানা নির্মাণে মন দিতেন। পয়সার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হলে, তখন খানদানি পদবি পছন্দ করে চালু করে দিতেন। এখানো অনেকেই এরকম দেন। এঁদের অনেকেই মূলত সাধারণ বর্গের তথাকথিত নিম্নজাতীয় মুসলমান। দেশ ভাগের পর সম্পদশালী হয়েছেন, নানা উপায়ে। এ নিয়ে রঙ্গ, রসিকতা, বিশেষত, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হতো মুসলমান এবং হিন্দু উভয় সমাজের তরফ থেকেই। বেশিটা নিজেরাই করতেন। আবার একটা সময় সমাজ তাঁদের কৌলিন্য মেনেও নিত। অর্থ সব সমাজেই কৌলিন্যের মূলাধার। প্রথম উদ্যোগী প্রজন্ম একটু চোখ কান বুজে থাকলে, পরবর্তী প্রজন্মগুলোর কোনো সমস্যা হয় না। মোতাকাকা এ ব্যাপারে প্রথম প্রজন্ম। তিনি অবশ্য স্ব-চেষ্টায়ই অবস্থা ফিরিয়েছেন। তবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে তাঁর কোনো হেলদোল দেখিনি কোনোদিন। তাঁর আগের বাড়িতে ছোটবেলায় তাঁদের আমরা তাঁত বুনতেও দেখেছি। মোতাকাকাই এই এলাকায় বস্ত্রবয়ন থেকে বস্ত্র বিক্রেতার স্তরে উঠেছেন প্রথম। এ এলাকায় তাবৎ মুসলমান গ্রাম চষে ফেললেও এক ঘর তথাকথিত খান্‌দানি মুসলমান পাওয়া যাবে না। এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরের একটি গ্রামে একঘর 'খান' পরিবার আছেন। একসময় তাঁদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর। এখনও যে একেবারে নেই তা নয়। তবে দিন কাল পাল্‌টে গেছে। সাধারণ বর্গ 'খানদানিদের' খুব একটা পরওয়া বা

খাতির দাবি করে না বটে, তবে একটা সমীহ ভাব থাকেই। কথায় বলে মরা হাতি লাখ-টাকা।

দহ্‌লিজে উঠে মোতাকাকাকে প্রণাম করলে, তিনি সট্‌কাটা সরিয়ে, বেশ খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে দেখলেন আমাকে। কিন্তু মুখে চিনতে পারার ছাপ দেখা গেল না। জিজ্ঞেস করলেন, কেডা? মোরে স্যাবা দেলে কেডা? পরিচয় দিতে, স্মৃতি হাতড়াতে লাগলেন। মুখে বললেন, ঠাহর পাইলাম না। তয় দোয়াকরি মুহে থাহ। ভাল অউক তোমার।

'স্যাবা' দেওয়া বা প্রণাম করার রীতি ইস্‌লামি আদর্শে স্বীকৃত নয়। কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে গুরুজনদের প্রণাম করতে অভ্যস্ত এবং মুসলমান বয়োজ্যেষ্ঠরাও স্বাভাবিক ভাবেই তা গ্রহণ করতেন। দু-একজন ছিলেন, যাঁরা অতিমাত্রায় শরিয়িতপন্থী। তাঁরা ইসলামি প্রথার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে স্যাবা দেওয়া বা প্রণাম করার রেওয়াজটির মধ্যে পৌত্তলিকতা বা বুত-পরাস্তির, অথবা আল্লাহকে অংশী করার গুনাহ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতেন। তবে তার মধ্যে কখনো প্রণামকারীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব লক্ষ্য করিনি। কোনো মুসলমান বালক বা যুবা অথবা অন্য বয়সেরও কেউ যদি হিন্দু মুসলমান কাউকেই প্রণাম করত, তারা সমালোচিত হতো। শরিয়তি মুরুব্বিরা তাদের এরকম আচরণ থেকে বিরত থাকতে অনুজ্ঞা করতেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা এর থেকে বিরত থাকত না। পারস্পরিক প্রভাব এবং পরম্পরাতো থাকেই।

তথাকথিত নিম্নজাতীয়রা গুরুজনদের প্রণাম করার সময় পা ছুঁয়ে সেই হাত জিভে ঠেকাতো। এই অভ্যাসটির সঙ্গে বৈষ্ণব ভক্তিভাবের বিশেষ প্রভাব আছে বলেই মনে হয়। ভক্তি ব্যাপারটা ভাল কী মন্দ তা নিয়ে কিছু বলার নেই। তবে এর বাড়াবাড়িটা অনেকের কাছেই বিরক্তিকর। তথাকথিত নিম্নজাতীয় মুসলমানরাও একই আচরণে যে অভ্যস্ত ছিল, কিশোর বয়সে আমি নিজের অভিজ্ঞতায়ই জানি। এমনও দেখেছি মুসলমান সমাজে কেউ কেউ তথাকথিত পীরদের ঘেয়ো পায়ে চুম্বন করছে, যদিও শাস্ত্রে তা নিষিদ্ধ। ব্যাপারটা ভাল মন্দ যাই হোক, অভ্যাসে ছিল সবারই, কিন্তু তা কোনোদিন ব্যাপক অশান্তির কারণ হয়নি। কিন্তু এবার হলো, অন্তত আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুলে বলছি।

মোতাকাকা পরিচয় পেয়ে ভীষণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বুকে জড়িয়ে, একেবারে সন্তান স্নেহে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। 'আহা, তোর মাথায় দেহি টাক পড়ছে তোর বাপের ল্যাহান। আহা, তোর চুলমুল দেহি পাক ধরেছে। আহা, এয়া কী করইয়া অইলে?—তাঁর এই আদর আপ্যায়নে আপ্লুত হয়ে প্রায় দমবন্ধ হয়ে ছট্‌ফট্‌ করছি। এ সময় হঠাৎ তাঁর পায়ে আমার পা লেগে যাওয়ায়,

অভ্যাস মতো আর একবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে মোতাকাকা যেন ভীষণভাবে চমকে উঠে উঠোনের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চোখ ফেরালেন। দেখলাম শওকত দলুজের প্রায় কাছাকাছি এসে ভুঁরু কুঁচকে আমাদের দিকে তাকিয়ে। মোতাকাকা চাপাস্বরে আমকে বললেন, খবরদার, আর কোনোরহম হিন্দুয়ানি যেন করিস না। জামাই পছন্দ করে না। পরে বেয়াক কমু হ্যানে। কথাগুলো শওকতের কানে যায়নি বটে, তবে সে যে আমার প্রণাম করাটা দেখেছে, তা মোতাকাকা আর আমার নজর এড়ায়নি। সে কারণেই কাকা একটু সজোরে প্রায় তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলতে শুরু করলেন, এই অইছে তোমাগো হিন্দুগো এট্টা সাইদ্যের না-পাক বেয়াধি। 'কদম্' ছুঁইয়া আদব জানাও। আরে, তুমিও মানুষ, মুইও মানুষ। 'সিজদা' খালি আল্লাহ্-মাবুদের পাওনা। কোনো আদম জাতের হেথে হক্ নাই। আয়ো, শওকত, আলাপ পরিচয় করাইয়া দিই। এই পোলাডির বাফে আমার বড় ভাইএর ল্যাহান, ঐ কয়কী, মাইনে, সাইদ্যের দোস্তো আছেলেন। আর, এই অইলে শওকত, মোগো হেলেনের খসম। জনাব আলহজ্জ শওকত নেছারাবাদি। জনাব আলহজ্জ পর্যন্ত বুঝতে অসুবিধে হয়নি, তবে 'নেছারাবাদি'র তাৎপর্যটা বুঝলাম না। এ ধরনের শব্দ ব্যবহার সাধারণত, অধিক শরিয়ত পন্থীদের মধ্যেই, দেখা যায়। স্থান নামকে স্বনামের সঙ্গে ব্যবহার করে তাঁরা এভাবে নিজ পরিচয় প্রকট করে থাকেন। কিন্তু নেছাহারাবাদ জায়গাটা এ অঞ্চলের ঠিক কোথায়, হাড়তে পেলাম না। হকের কাছ থেকে পরে জানতে হবে। ব্যাপার কোনো বিশেষ পীরের মুরিদ হলেও পীরের নাম অনুযায়ী এমন হয়।

শওকত দলুজে উঠে একটা চেয়ারে বসল। সারা চোখ মুখে একটা তীব্র অপ্রসন্ন ভাব। বলল, আস্-সালাম আলায়কুম। মোর পুরা নাম মোহম্মদ আল্হজ্জ শওকত উদ্দীন নেছারাবাদি। এর উত্তরে আমার বলার কথা ছিল, অ-সালাইকুম-আস্সালাম। সাধারণত তা বলেও থাকি, যদি ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে আসে। কারণ প্রথাটি জানা। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ইচ্ছে করেই বললাম, নমস্কার, আমার নাম শ্রী, আমি এখানকারই লোক ছিলাম। সে অনেক আগের কথা। এখন কোলকাতায় মানে পশ্চিমবঙ্গে থাকি। বহুদিন বাদে দেশে এসেছি। আসলে এই দেশটাই যে প্রকৃতপক্ষে আমার দেশ, সে কথা যেন ভুলতেই প্রাণ চায় না। তাই মাঝে মাঝেই আসি আপনাদের মতো আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে, আর দেশ গাঁ ঘুরে পুরোনো স্মৃতি একটু ঝালাই করতে। তাহলে আপনিই আমাদের হেলেনের বর ?

আমি লোকটিকে দেখা মাত্রই এবং যেটুক পরিচয় হকের কাছ থেকে পেয়েছি তাতে, তার টাইপটা বুঝে গিয়েছিলাম। তথাপি ইচ্ছে করেই অভ্যস্ত আদবেই

তার সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইলাম। Pusedo-non-communal-দের মতো মুসলমানি কেতায় কায়দা করতে গেলাম না, কিংবা হক বা মোতাকাকার চেতাবনিকেও পাত্তা দিলাম না। এবং এর অনিবার্য পরিণতি দাঁড়ালো বিতর্কে জড়িয়ে পড়া। বিতর্কটার শুরু হল এজন্যই যে আমি তাকে ইস্‌লামি আদবে প্রত্যাভিবাদন না করে, নমস্কার জানিয়েছিলাম এবং মোতাকাকা আর তাঁর পরিবারস্থ জনেদের স্বজন বলে অভিহিত করেছিলাম। শওকত বাংলাদেশকে আমার স্ব-দেশ বলে দাবি করা বা আত্মীয়তা দেখানোটাও বোধ হয় পছন্দ করেনি। এখানে ইদানীং কিছুসংখ্যক মানুষ 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বা 'স্বদেশ', 'জন্মভূমি', 'দেশের বাড়ি' ইত্যাদি কথাগুলো, যা আমার মতো চলে যাওয়া মানুষেরা হামেশাই বলি, পছন্দ করে না। তাদের এই পছন্দ না করার পেছনে বোধ হয়, তারা মুসলমান, তাই ভিন্ন জাতি, এরকম পুরোনো মনোভাবটি এবং তারা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক—এই নতুন জাতিসত্তার অহংকারটিই সক্রিয়। যাহোক, শওকত মিঞা প্রথমেই বিতর্ক তুলল এই প্রসঙ্গেই। বলল, আপনেরা কী মোগো রেহাই দেবেন না? আপনাগো হাত থিকা বাচতে মোরা, পাকিস্তান কায়েম করছেলাম, বাংলাদেশ পয়দা করাইয়া তো দেছেন হেয়ার পাইন মারইয়া, এহন আর চায়েন কী?

তার প্রথম উচ্চারিত প্রশ্নটিই এমন কর্কশ বাক্যে করবে, তা ধারণাই করিনি। মোতাকাকা বলে উঠলেন, আঃ শওকত, মেহমানরে কেউ ওরহম করইয়া কিছু কয়? এডা তোমার ক্যামন তরিকা? তুমি আলেম মানুষ, মেহমানের ইজ্জতটা আল্লাহ মকবুল তো সব চাইতে উচা রাখছেন। হেডা কী ভুলইয়া গেলা?

আপনে থামেন দেহি। ইনি যদি মেহমানই হয়েন, তয় এরহম উলডা পালডা কায়দা না করইয়া মেহমানের আদবে থাকলেই পারেন। অত আত্মীয়তা দ্যাহানোর দরকারডা কী? মোরা ওনার কিয়ের আত্মীয়? আর এহনো এনারা দ্যাশ দ্যাশ করেন ক্যালায়? এ দ্যাশে এনাগো আর কোন্ হকডা আছে? এডা এহন পুরাডাই এছ্‌লামি জাহানের, আর ক্যারো হক্ মানি না মোরা। পাকিস্তান হাসেলের পরতো মোরা এ্যারগো হাতথিকা মুক্তি পাইছি। মোতাকাকা তাকে থামাবার জন্য দুএকবার 'আঃ শওকত, আঃ শওকত,' করে কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু শেষতক্ তার উগ্র দাবড়ানি খেয়ে মাথা নীচু করে বসে রইলেন। এমনকী কলকেতে তামাক পুড়ে যেতে থাকলেও সট্‌কাটা টানার কথাও ভাবছিলেন না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর বুকটাও যেন ঐরকমই খাক্ হয়ে যাচ্ছে। বললাম, শওকত ভাই কী রাস্তায় কারুর সঙ্গে মেজাজ খারাপ করে এসেছেন? এত রেগে যাচ্ছেন কেন? শুনুন, আপনি বরং ভেতরে গিয়ে একটু

হাত মুখ ধুয়ে, নাশতা পানি করে, শান্ত হয়ে আসুন। আমি ততক্ষণ কাকার সঙ্গে কিছু বাতচিৎ করি। পরে না হয় আপনার সঙ্গে সব বিষয়ে বিচার আচার হবে। আমি ইসলামি সহবত একটু জানি। মুসলমান কারুর আত্মীয়তা ইনকার করে না। আপনার মুসলমানিটা আমার একটু ভেজালই মনে হচ্ছে।

প্রতিপক্ষকে ক্রুদ্ধ না করতে পেরেই হোক, অথবা ভেতরে ভেতরে নিজের উগ্রতার জন্য খানিকটা অস্বস্তির জন্যই হোক, শওকত উঠে ভিতরে চলে গেল এবং তাও অত্যন্ত অভদ্রভাবে, গজর গজর করতে করতে। লোকটা সত্যিই ভীষণ অসহিষ্ণু। বুঝলাম, হক্ আমাকে সামান্যই সাবধান করেছে। আমি মৌলবাদী মানুষ কট্টর মোল্লা পুরুত খুব কম দেখিনি। কিন্তু শওকতের মতো এরকম অ-ভব্য, স্বভাব দুষ্ট মানুষ, আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বিশেষত, এই বাংলাদেশে তো নয়ই। আত্মীয়তায় তারা দুনিয়ার সেরা, এটা প্রায় সবাই জানেন।

শওকত অন্দরের দিকে চলে গেলে মোতাকাকা আমার হাতদুটো ধরে বললেন, বাজান, মোরে মাফ্ করইয়া দেও। এদ্দিন পর আইলা, আর মোর কপালের দোষ দ্যাহ। এই আজরাইলের আজরাইল, দোজোখের পোক্ কী আরাম্ব করলে। আঃ আসছোস্! ঘরের পোলা ঘরে আইছে, বাইরের হুমান্ইয়া হ্যার এমন গীবত্ করে। এ্যারগো লইগ্যাই এ দ্যাশটা শ্যাষ অইয়া গ্যালে। এগুলান্ অইছে না মোছলমান, না বাঙালি। জার্উয়া কওন যায় এ্যাগো।

দহ্লিজের এই জায়গাটি অন্দরকে আড়াল করে বহির্বাটি বা বৈঠকখানার কাজ করে। কথাবার্তা স্বাভাবিক ভাবে হলে ভেতরে তার আওয়াজ পৌঁছোয় না। সম্পন্ন বা কিছুটা সচ্ছল মুসলমান পরিবারের এরকম আদতেই গৃহবিন্যাস এ অঞ্চলে। দহ্লিজের একপাশ দিয়ে অন্দরে যাবার পথ। পথের দুপাশে, দহলিজের পেছন দিকটা হোগোলের বেড়া দিয়ে ঘেরা। এই বেড়াটা প্রায় সব বাড়িতেই থাকে অবস্থা অনুসারে। কোথাও তা সুপুরি বা নারকোল পাতার, কোথাও করোগেটেড শিটের। অন্দরের আব্রু রক্ষা করা মুসলমানদের কাছে সুন্নত। শওকত দৃষ্টির আড়ালে, অন্দরে। মোতাকাকা এই সুযোগে তাঁর আফশোস্ এবং হুতাশ জানাতে লাগলেন। ক্রমশ তাঁর স্বর উচ্চপর্দায় উঠতে থাকলে, আমি তাঁকে শান্ত করার প্রয়াস করতে থাকলাম। কিন্তু ঐ যা আগে বলেছি, গোঁ চেপে গেলে ভিন্ন মানুষ। সুতরাং তাঁর পারদ আস্তে আস্তে চড়ছিল। আমি ভয় পাচ্ছিলাম তার শরীরের কথা ভেবে। হাইপার টেনশনের মানুষ। তাছাড়া বয়সটাও ঢের হয়েছে।

কাকা বলছিলেন, তুমি ঘরের ছাওয়াল, তোমারে কইথেতো শরম নাই, মোর অমন পেয়ারের মাইয়াডা। এই ইব্লিশের বাচ্চার হাতে পড়ইয়া কী লালাডিই যে

পাইছে, আর এহনও পাইতে আছে, কী কমু তোমারে। তোমার দোস্তে যে কী দেইখ্যা এডারে বোনাই বানাইলে। বেয়াকই মাইয়াডার নছিব ! আল্লাহ বিচার কর।

জিজ্ঞেস করলাম, কাজ কাম কিছু করে না ?

বড় কাম করে। দ্বীনের খেদ্‌মত। মাইনে, সালিশি মাতব্বরি, অর্থাৎ টাউট্‌গিরি। নিজেরে মনে করে মস্তো আলেম, প্যাডে ঢেহির মুষৈলের পাড় দিলেও এক ফোডা এলেম বাইর অইবে না। ঐ এক পদের আভোদা দ্যাশে পয়দা অইছে। এয়া শুরু অইছেলে অনেকদিন আগেই, খালি মুক্তি যুইদ্দের পরপর এট্টু কোমছেলে। এহন তো এ্যারা বেয়াকেই নিজেগো তালেবান আফগান মনে করে। বেয়াকেই য্যান্ বিন্ লাদেন। বেয়াকের নামের লগেই 'আল'। ওথে যে কোন বাল বোজায়, জানি না।

কাকার কাছে যা শুনলাম, অভিজ্ঞতায় তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। এখানকার সাধারণ মুসলমানেরা শতকরা পঁচানব্বই ভাগেরও বেশি চাষি। তার মধ্যে দরিদ্রতম চাষির সংখ্যা নব্বই ভাগ। পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশি আমল মিলিয়ে এই দীর্ঘ প্রায় ছয় দশকের শাসন কালে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন গ্রামাঞ্চলে একেবারে শূন্যেরও নীচে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের সামগ্রিক পরিস্থিতি এতই করুণ যে তা নিয়ে কোনো আলোচনাই চলে না। কথাগুলোর বাস্তবতা এখনও নিজের চোখে ভাল করে যাচাই করিনি। কাল রাতে হকের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা আর এখন কাকার আক্ষেপে খবর হিসাবেই শুধু জানাছি। কিন্তু সেসব বৃত্তান্ত এখন নয়। আপাতত শওকত চরিত্র নিয়ে মনমগজ ব্যস্ত রাখছি। কাকার আক্ষেপ শুনতে শুনতে ভাবছি। মানসিকতার দিক দিয়ে বিচার করলে মানুষ বোধ হয় সামান্যতমও সভ্য হয়নি। গোটা মনুষ্য সমাজের বিরাট প্রেক্ষায় ব্যাপারটা আলোচনা করার ক্ষমতা নেই। শুধু এখানকার বর্তমান মুসলমান সমাজ এবং পড়ে থাকা হিন্দুদের বিষয়টাই আলোচ্য। কিন্তু সে আলোচনাতো শুধুই হা-হুতাশই বাড়ায়।

মোতাকাকা বলছিলেন, মুই জোলা। মোর বাপ দাদা চোদ্দগুষ্টি বেয়াকে জোলার পো জোলা। সমাজে, হেয়া কী মোছলমান, আর কী হিন্দু, মোগো কোনোদিন কেউ মানুষ কইয়া বাবে নায়। তয়, য্যারগো এট্টু পয়সা কড়ি অইছে কহনও, হ্যারগো কতা আলাক্। পয়সা থাকলে জাইতের উচানীচা নাই। জাইতের কুআচার আগে য্যামন আল্হে এহন আর তেমন নাই। ঐদিক দিয়া এক পাও আউগগাইলেও মাইনসেরা এট্টু আউগ্‌গাইছে মনে অয়। তমো কই, ঐ যে হিন্দু মোছলমানে গো মইদ্যে একদল আছে য্যারা খালি জাইতে উচা অইতে চায়, কেউ কয়, মোর পরদাদার পরদাদার পরদাদায় বাওন আছেলে। খুব উচা বাওন,

আবার মোগো মইদ্যে কেউ কবলায় যে হ্যারগো র‍্যাত একছের আরব মল্লুক থিহা চুয়াইতে চুয়াইতে আইছে, হেইসব বাহাসে মোর দেমাগটা বড়ো চ্যাতে। মোর জামাই হইলেন হেই কেছেমের মাতব্বর। তোমারে কমু কী বাজান, ঐ হুয়ারের পোয় মোর হেলেনরে এমন পিডান পিডায় যে হাল্‌ইয়ারা খ্যাতে ঢুইক্যা পড়া পরের 'ছাড়া' গোরুরেও হেরহম পিডায় না। এহন যে পেরায়ই এহানে থাহে, হেতেও নিস্তার নাই। ক্যান্? না, হে হ্যারে তহজিব তরবিয়াত শেহায়। হেহানে কথা কওন বে-আদতি।

মোতাকাকাকে কোনোদিন দেখিনি তিনি কাকিকে প্রহার করেছেন বা কুৎসিত গালিগালাজ করেছেন। মোতাকাকার কেতাবি শিক্ষা দীক্ষা সামান্যই। তথাপি তিনি নিশ্চয় জানেন যে প্রত্যেক মুসলমানের স্ত্রীকে মৃদু হলেও প্রহার করার হক আছে। হাদিস শরিফে আছে, "স্বামী তার স্ত্রীকে কী জন্য প্রহার করেছে তা যেন কেউ জিজ্ঞাসা না করে।" অবশ্য গালিগালাজ করাটার বিষয়ে সুস্পষ্ট নিষেধ সেখানে আছে, যদিও প্রহারের সময় স্বভাবতই তা মানতে দেখা যায় না। 'হারামজাদির হারামজাদি', 'বান্দির বাচ্চা বান্দি' 'লোহাজি মাগি' এবং স্ত্রী মা, মাসির সঙ্গে অসম্ভব এবং অ-সামাজিক সম্বন্ধ পাতিয়ে নানা রকম বাক্য তখন উচ্চারিত হতে শোনা যায়। অনেক তালেব-এ বুজুর্গ, আলেম-এ মশহুরকেও অনুরূপ কর্মে লিপ্ত হতে দেখেছি। কিন্তু তাতে কী? হাদিসে স্ত্রীকে প্রহার করার বা তার ওপর যথেচ্ছ অধিকার কায়েম করার যেসব ব্যাপক 'হক' আদায়ের ব্যবস্থা আছে, তেমনি তাদের ওপর মানবিক কর্তব্য পালনের উপদেশও প্রচুর দেওয়া আছে। যেমন 'তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের ওপরও তাদের তেমনি অধিকার আছে। অতএব তাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও সদয় ব্যবহার কর', 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম ব্যবহার করে', 'কোনো মুসলমান তার স্ত্রীকে যেন ঘৃণা না করে'। 'একটা দোষের জন্য তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে, অন্য গুণের জন্য যেন সে তাকে ভালবাসে।' কিন্তু এইসব বা এর চাইতেও অনেক মূল্যবান হাদিসি উপদেশ শওকতেরা সাধারণত মনে রাখে না। তারা কোরআন এবং হাদিসের সেইসব আয়াত বা নির্দেশগুলোই বেশি অনুসরণ করে এবং প্রচার করে থাকে যেসব যা খুশি তাই করার সপক্ষে কাজে লাগানো যায়। অবশ্যই সেইসব আয়াত উপদেশের ব্যবহারিক তাৎপর্য সেই ঐতিহাসিক কালে কী ছিল, কেন এমন বলা হয়েছিল, বা কোন্ সামাজিক পরিবস্থায়, সেসব তারা বিচার করে না। এ ব্যাপারে দ্বীন-ই ইস্‌লামের নায়েবরা যেন বড় নিষ্ঠার সঙ্গেই বে-দ্বীন্ বুত্‌পরস্থিতওয়ালা হিন্দু সমাজ বিধায়কদেরই অনুসরণকারী। মোতাকাকার আক্ষেপ বচনে এরকমই আমার

মনে হচ্ছিল। পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে করে মনটা ভীষণ গুম্‌ড়ে গুম্‌ড়ে উঠছিল। আমি সেই সব দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাইছিলাম, যখন মোতাকাকা এই বাজারে কখনো এলে, সামনের মিষ্টির দোকানে আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে দোকানদারকে বলে দিতেন, অরে দুইডা রসগোল্লা খাওয়াইয়া দামডা মোর নামে খাতায় লেইখ্যা রাহ। —এইসব ছোট ছোট, সাধারণ, কিন্তু মমতামাখা দিনগুলো যদি কোনো যাদুমন্ত্রে এক্ষুনি ফিরে এসে, এই জঘন্য বর্তমানটাকে ঢেকে দিত ! কিন্তু তা হলো না। পরিবর্তে অন্দর থেকে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল। সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াতে, নিবাত নিষ্কম্প মোতাকাকা বললেন, ওয়া কিছু না, আগে যেয়া কইলাম হেইয়াই। শওকত নেছারাবাদি হেনার বান্দি আওরৎ হেলেনরে 'ছহবৎ' শিহাইতে আছেন। বোদায়, তুমি আইছ হুন্‌ইয়া তোমার লগে দ্যাহা করতে মনস্থ করছেলে তোমার বুইনডা। এয়া হেই হাউসের কারণেই ঘটছে। তুমি বাজান এহন আয়ো যাইয়া। পরে তোমারে একদিন সুযোগমত ডাকমু হ্যানে। আছো তো দিন কয়েক ?

—আছি দশ পনেরো দিন। কিন্তু কাকা— ?

—যাওয়ার আগে মোরে মাফ্‌ করইয়া যাইও। আল্লাহ্‌ মেহেরবান। রহমানের রহিম। এসব কিছু না। এয়া মোর কপালের ল্যাহা। মাইয়াডা শ্যাষ তামাইত হয়তো খুদকুশিই করবে। তয়, এয়াও তোমার কই এহানে হিন্দু মোছলমান বেয়াকেরই নিয়ত বড়ো দোজোখি অইয়া গেছে। নাইলে ইস্তিরি লোকের উপর এ্যাতো অইত্যাচার করে কেউ ?

—কাকায় কী আমারে ত্যাজ্য করইয়া দেলেন ? আওলাদেগো ধারে বাপ কাকা অইয়া 'মাফ'এর কথা কয়েন ? —আমি প্রায় খান্‌ খান্‌ হয়ে বললাম।

মোতাকাকা আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধু বললেন, দিন দুনিয়ার হকিকত্‌ আর আগের ল্যাহান নাই বাজান। এহন মনে খালি ডর আর ডর। মনে কোনো খ্যাদ্‌ রাইখ্যনা। আল্লা হাফেজ।

কথাটি বরাবর 'খোদা হাফেজ' শুনতেই অভ্যস্ত ছিলাম। বলতামও। কী কারণে জানিনা, ইদানীং দেখছি পাল্টে গেছে। ব্যাপারটার মধ্যে কী আরব ইরানের মধ্যেকার কোনো প্রাচীন সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব পরম্পরায় সম্পর্ক আছে ? টিভি, রেডিয়োতে পাকিস্তান, বাংলাদেশ কখন থেকে যেন আল্লাহ হাফেজ বলা শুরু করেছে। খোদা মূলত প্রাচীন ইরানীয় দেবতা। ফান্ডামেন্টালিস্টরা কী 'খোদা' শব্দটির মধ্যে 'শেরেকি'র তাৎপর্য নতুন করে পাচ্ছেন ? শিয়া-সুন্নির দ্বন্দ্ব ? অসম্ভব নয়। কিন্তু 'আল্লাহ'ও কী ইসলামপূর্ব-কালের একজন দেবতা ছিলেন না ? শেরেকির চাইতে হারাম ইসলামি বিধিতে আর কিছু নেই। 'লা হক্‌মা

ইল্লাল্লিল্লাহ'। আল্লাহ লা-শারিক। পৃথিবীটা, গোটাটাই যেনো বেশি বেশি করে মৌলবাদের দিকে মোড় নিচ্ছে এবং তা শুধু ইস্‌লামের ক্ষেত্রেই নয়। এ দেশে অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ অভিধাকামী ভারতেও, পদার্থবিদ্যাবিদ একজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী এই কয়েক বছর আগেও গণেশের দুগ্ধ পান বিষয়ে আস্থা প্রচার করেছিলেন এবং জাতীয় গণ-হিস্টিরিয়ায় (সজ্ঞানেই) মদত দিয়েছিলেন। তাঁর ললাটের সিন্দুরের ঊর্ধ্বপুন্ড্রটিও বেশ। হিন্দুত্ব ঘোষক। আর এই মোতাকাকা? সন্ন-নিরঞ্জনের বিয়ের সময় তাঁর কী অসামান্য হৃদয়ের প্রকাশ দেখেছিলাম। আর আজকে তাঁর এই হাহাকার। অথচ তাঁর শিক্ষাদীক্ষাই বা কী? হৃদয়বৃত্তির জন্য বোধহয় কোনো ধরাবাঁধা শিক্ষা দীক্ষারই দরকার হয় না।

সাত

আরেকটিবার আয়রে সখা

বাজারে ফিরে এসেই দেখি বীরুদার চায়ের দোকানে মঞ্জুদা আর তার দলবল। যাট অতিক্রান্ত মঞ্জুদা স্বভাবে, চেহারায় এবং বাক-বিন্যাসে প্রায় পুরোটাই অপরিবর্তিত। বাঁ চোখের পাশে একটা কাটা দাগ ছিল মনে আছে। ওটার জন্যই তার মুখটা ভুলে যাবার সমস্যা ছিল না। আর ওটার জন্যই তার মুখটা সবসময়েই কৌতুকোজ্জ্বল দেখাতো। সম্ভবত ধলুর কল্যাণেই পুরোনো সব বান্ধবরাই খবর পেয়ে গিয়েছিল। 'স্যানে আইছে'। —আমার কৌলিক উপাধি 'সেন' বিধায়, ছোট বড় তদানীন্তন সবার কাছে, আঞ্চলিক উচ্চারণে আমি 'স্যানে'। সুতরাং স্যানে আইছে বাক্যটি প্রায় এক মহোৎসব বার্তার মতো বাজারে 'রটি গেল ক্রমে'। এবং বীরুদার সেই সুপ্রাচীন, তথাচ বর্তমান চা-গৃহটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে, কালোচিত অথচ অর্থহীনভাবেই প্রাচীন এবং বর্তমান। ভেদ লুপ্ত করে সবাইকে সমবয়স্ক সমমনস্ক এবং সমকালত্বে স্থায়ী করল। এরা যে সবাই যে আমার চেনা জানা তা নয়। তবু কেমন ঘিরে রয়েছে। পাঠক ভাবিবেন না যে, মদৃশ মানুষ্যের এমন কিছু ব্যক্তিমাহাত্ম্য রহিয়াছে, যন্নিবন্ধন অত্র আয়োজন। আসলে কথাটি হল এই যে. চণ্ডীদাস মশাই গেয়েছেন. "এতদিন পরে বঁধুয়া এলে, দেখা না হইত পরাণ গেলে" ইত্যাদি।

আমাদের তহজীবি আচরণ এই যে মানুষ তো মানুষ. পশুপাখি, প্রাকৃত এবং নাগর তাবৎ সমুচ্চনিচয় সকলেই, পুরানো স্বজন কেউ বিদেশ থেকে এলে 'এক্কারে আল্লাদে ভ্যাট্‌কাইয়া চিত্তার অইয়া পড়ে।' তখন কালবোধ. ঋতুবোধ ইত্যাদি লুপ্ত হয়। কোকিলাদি বাসন্তী বিহঙ্গেরা পর্যন্ত, ঘোর বর্ষণের মধ্যেও যেন কুহু কুহু রব করে। তখন আমরা বিশ্বাস করি যে কাল আদৌ কোনো প্রবাহ নয়। যেমন এখন আমরা সবাই এই বোধে স্থিত যে সন্নর বিবাহকালে আমরা যে বয়সের ছিলাম, যে মনবিশিষ্ট ছিলাম, এই মুহূর্তেও তেমনই আছি। কালস্রোত কথাটা আসলেই 'ফাট্‌কি'। কালের যেকোনো অবস্থানে পৌঁছোনো এমন কিছু

অসম্ভব ব্যাপার নয়। একটু চেষ্টা আর চিন্তনেই ব্যাপারটা ঘটানো যায়। যেমন এখন যদি দোকানের এই বেঁটে চায়ের গ্লাসে এক গ্লাস দুধে গোটা দুত্তিন টোস্ট বিস্কুট ভিজিয়ে, চামচে করে খেতে শুরু করি, তবে আমি নিশ্চিত যে প্রথম চামচ মুখে পোরার সঙ্গে সঙ্গে, আমি হারিয়ে যাওয়া একটা সময়ের সন্ধান পেয়ে যাব। পৌঁছে যাব সেই সময়টায় এবং আঃ সে যে কী তৃপ্তি! বিরুদার বর্তমান অনস্তিত্ব সেখানে কোনো শূন্যতার সৃষ্টি করবে না। অথবা অনস্তিত্ব বলে কোনো অবস্থা নেই, বা থাকলেও তাৎক্ষণিকত্বের অমোঘতায়ই আছে। আমরা তাকে বেমতলব পাত্তা দিই না। এবং অনস্তিত্বকে পাত্তা দেওয়ার আদপেই কোনো অর্থ নেই। আমাদের প্রাচীনেরা অস্তিত্বকে যদি মায়া বলে উড়িয়ে দেন, আমরাই বা অস্তিত্বকে কেনই বা সেভাবে উড়িয়ে দেব না?

সুতরাং যীশুদা, যাকে দেখার জন্য সেই ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারা সকালটা 'বেব্‌ভুলা' আচরণ করছিলাম এবং সে আছে কী নেই, এই ভাবনায় বুক দুরু দুরু করছিল, তার কোনো হেতু নেই। সে আছে, সন্ন আছে, নিরঞ্জন আছে এবং এরকম ছোট ছোট ব্যাপারগুলো সবই আছে এবং তারা সব একই রকম ভাবে থাকে। শুধু একটু গভীর ভাবে তাদের বা সে সবের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে হয়, চিনে নিতে হয়। সুমের ব্যাবিলন, হরপ্পা মহেঞ্জোদারো, রোম বা তৃতীয় রাইখ ধুলোয় মিশোতে পারে। কারণ সেখানে ক্ষমতা আর প্রতিক্ষমতার নিরন্তর সাগ্নিক প্রতিযোগিতা থাকে। নিরঞ্জনের ঘরের মতো পাতার ঘরে সেই ক্ষমতার প্রতাপ বা প্রকোপ ক্ষণস্থায়ী। কারণ, তাব মধ্যে আছে সেই পরণকথার সোনার কাঠি রুপোর কাঠির অমোঘ ক্ষমতা, যা মুহূর্তে মৃতাবস্থা থেকে সবকিছুই জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে এবং অন্তত এখানের আমরা জানি তা সন্দেহাতীত ভাবেই সত্য।

এবং এসব বাস্তবিক অর্থে কিছু কাব্য কথা নয়। তবে একটা ঘোর লাগা ব্যাপার অবশ্যই এইসব প্যাচালে থাকে। তা থাকুক। জগত সংসারে তো অনেক অনেক প্রয়োজনীয় ভাব, ভাবুকতা বা ভাবনা-বিলাসের চর্চা হয়েই থাকে। সেসব নিয়ে তো কত কথা, কাব্য, উপন্যাস, গল্প হয়। এই ঘোর লাগা সামান্য কথার পসরাকে যদি আমার নামী দামী বনাওটি সর্ব-সুখ প্রদায়ী কথা সাহিত্যের কথাবস্তুর চাইতে মহার্ঘ মনে হয়, তাতে কার কী ক্ষতি? সামান্য বনজ ফল, যেমন পায়লা, কাঁটাবহরী, বেতকল, আঁসফল ইত্যাকার হাজার অকিঞ্চিৎকর অনুষঙ্গ আস্বাদ করার কৈশোরিক উত্তেজনার দিনগুলোতে যদি আমার মগ্নতা গাঢ় হয়, তবে হে সমৃদ্ধ বর্তমান, সেই অপার্থিব আনন্দ ক্ষেত্র থেকে আমাকে চির নির্বাসন দিও না। ক্ষণকাল হলেও সঙ্গে থেকো। এরকমই আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ এবং এটুকু যেন থাকে। এবং সমবেত জনেদের এই সখ্য।

এইসব অনুভব এবং উপলব্ধি আমার শুরু হয়েছে পিচঢালা রাস্তার সংলগ্ন ব্রিজটা পেরোবার পর থেকেই। ব্রিজে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জন-সন্নর বিয়ে সংক্রান্ত স্মৃতিমন্থনের সময়, ভেতরে ভেতরে নাগরিক চেতনার ক্ষেত্রে একটা ধীরলয়যুক্ত রূপান্তর আমার অতীতাচারী অনুভবে লুকোচুরি খেলতে খেলতে, কোনে এক সময়ের এই বিরুদার চায়ের দোকানে এসে, এক চামচ দুধে ভেজানো টোস্ট বিস্কুট মুখে পোরার পরই পূর্ণতা পেল। এবং তা এমন একটা অনুভব, যা অক্লেশে নগর-বৃত্তের তাবৎ সুখদ আয়োজনকে, জীবনের সবরকম বন্ধুরতা, সর্বনাশ এমন কী মৃত্যুকে পর্যন্ত বুড়ো আঙুল দেখাতে পারে। এই সুখানুভূতি নিয়ে আদৌ কোনো কাব্য, সাহিত্য, শিল্প হয় কিনা আমার জানা নেই। অনেক পড়িনি, অনেক জানিনি, অনেক শিখিও নি। সুতরাং এইসব অকিঞ্চিৎকর, জীবনের মোটা দাগের, সূক্ষ্ম বোধহীন মানুষদের নজর না কাড়া ব্যাপারগুলোর নাড়া ঘাটার মূল্য কী তা জানি না। মনে হচ্ছে অ্যাসফল্টের আওতার বাইরে এসে একটা বড় কাজ করে ফেলেছি। এবং সেটা একটা বড়ো সড়ো ব্যাপার। পরম্পরার সেই মূল গাছটা হয়তো নেই, কিন্তু শিকড়টা কাঁচা আছে এখনো। খানিকটা মাটি খুঁড়লেই তার অবস্থানটা পেয়ে যাবে। সেখানেই আমার জিত।

অথচ ব্যাপারটার সংঘটন ক্রিয়াটা এমন সাদামাটা যে, তার আলেখ্য পরিবেশনের মতো সরল ভাষাও বোধ হয় এতাবৎ তৈরি হয়নি। দোকানে ঢোকার পর, সবার একযোগে প্রাথমিক উষ্ণতার জড়াজড়ি বা যাকে আমরা এখানে 'হাব্‌ডা হাব্‌ডি' বলি, সেটা শেষ হলে, সমবেত প্রশ্ন, 'নাল্‌তা করবা কী?' মোতাকাকার ওখানে 'নাশতা'র পরিবেশ শওকতি জিহাদে হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং পেটে বিলক্ষণ ক্ষিধে। বিরুদার ছেলে, নাম ঘোত্‌না, এসে বেশ ভক্তিভাব নিয়ে একটা পেন্নাম ঠুকে জিজ্ঞেস করল, আণ্ডা আর পাউরুটি টোস্ট করইয়া দিই, কী কয়েন কাকা? মুই আপনেগো বিরুদার পোলা। বিরুদা আমাদের ইস্কুলের দপ্তরি-কাম ক্যান্টিন-চালক ছিল। অবসর সময়ে বাজারের এই চায়ের দোকানটিও চালাতো। ঘোত্‌না দপ্তরি নয়। তবে চায়ের দোকনটি রেখেছে। বললাম, না। এক গেলাস দুধ, তিন চামচ চিনি আর তিন হান টোস্ট বিস্কুট কাদা-কাদা করইয়া দে দেহি তোর বাপের ল্যাহান। মনে আছে তো?

হেয়া আর নাই। বাবার বোদায় আপনের ধারে কিছু পাওনাও আছেলে, হে বাবদ, তঃ হেয়া আর দেওন লাগবে না। বাবায় মরইয়া গ্যাছে, হেয়াও তামাদি। তয়, এই ব এহন আর এ্যারা কেউ খায়েন না। বেয়াকেই এহন বাবু বা বড় মেঞা।

া খাউক, তুই আমারে হেইয়াই দে। এবং তারপর সেই পরম অনুভবের পূর্ণ প্রত্যাবর্তিত আনন্দ। জীবন 'অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যোঃপাতি' একথায় কাব্য থাকতে

পারে, তবে তা সার্বিক সত্য নয়। অন্তত, এইক্ষণের প্রত্যাবৃত্ত ইন্দ্রিয় নিচয় সেই গভীর এবং ভিন্ন প্রত্যযে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করলে, আমি বহু বহু বছর পিছনের এক আনন্দময় বোধে স্নিগ্ধ হলাম। বহুকালের হারিয়ে যাওয়া এবং অত্যন্ত দামী এক আনন্দকে ফিরে পেলাম।

এরপরের যৌথ সংলাপ আনুপূর্ব নিম্নরূপ --

তো কও, এবার কদ্দিনের খ্যাপ্? এবার তো আইলা অনেকদিন পর।

হ। তয় এবার আছি দিন দশ বারো, আর থাকমু এহানেই। শহরে যাওনের হাউস নাই। তয়, হক যদি ইদিক উদিক লইয়া যায়, যাইতে পারি।

বঃ, এতো সাইদ্যের ভাল কতা। এই ঘোত্না চা দে বেয়াকরে, দামড়াডা।

মঞ্জুদা বেশ উজ্জীবিত। উজ্জীবিত বাকি জনেরাও। চা পানের সঙ্গে গল্পগুজব চলল সমানে। বেলার দিকে হুঁস নেই কারুরই। কোথায় উঠব, কোথায় খাব, সেসব নিয়ে কারুরই কোনো ভাবনা নেই। ভাবটা এমন যে, সে যেখানে হোক হবে। 'হৌব' বাড়ির ব্যাপারটা সবার জানা। কিন্তু কারুরই ইচ্ছা নয় এ বেলাটা সেখানে উঠি। কিন্তু বিকেলে তো আবার জব্বারের মেয়েব সাদির দাওযাত মানে মেজবান। সে কথা সভায় পেশ করতে এক ব্যাপক কলরব। "তয়, হালার পো হালায় মোগো দাওযাত দেলে না ক্যালায়?" এটা একটা নতুন খবর। শ্যাহের বাড়ির সাদি, হেহানে হিন্দুগো নেমন্তন্না অইবে কী করইয়া? মঞ্জুদাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, হেসব এহন আর মোগো এহানে তেমন নাই। এ দিকটায় হেসব আগের কায়দা এহন গেছে। মুক্তি যুইদ্ধের সোমায জাইত পাইত, ছোযাছুযির হোগায় শিবড়ি লাইগ্যা গ্যাছে। হেয়া ছাড়া শ্যাহেগো বাড়ির রান্ধনডা ভাল। ওরহম মাংস হিন্দুরা রানথে পারে না। ঘেরানডাই আলাদা। হেয়া মুই বাওন অইয়াও কইতে আছি। বোজজো? তয় হোন, এ্যাটটা গপ্পো কই। জনক রাজার দরবারে বিচার, গোমাংস খাওন উচিৎ কী অনুচিৎ এই লইয়া। মুনি ঋষিরা বেযাকে নানা তক্কো করলেন। আসল কতাডা কইলেন মহর্ষি যাইজ্ঞ বইল্কো মুনি। হেনায কইলেন, না, গরু খাওয়া উচিত না। তয় যদি জিগাও মুই খামু কিনা, তো কই একশোবার খামু। অবশ্য যদি রান্ধনডা ভাল অয়। আর জানোতো মুই য্যামন ত্যামন বাওন না, একছের কুলীন ভট্টাইজ্য বাওন। সবাই একমত যে, জব্বারইয়া কামডা একছের আভোদার ল্যাহান করছে। আর এ কারণে হ্যার শাস্তি পাওন আবইশ্যক। শাস্তিটা হবে এখানে আমি ছাড়া আর যে চার পাঁচজন বয়স্ক আছি, তারা 'বিনা নেমন্নতন্নায়ই' যাবে জব্বারের বাড়িতে এবং খাবেও। 'হালায় হয় ভুলইয়া গ্যাছে, নয়তো শওকত জ্বিহাদির দলে ভেড়ছে। তয়, স্যানেরে দাওয়াত যহন দিছেই, মোনে লয়, অবস্তা ত্যাতো খারাপ না।'

ধলু জিজ্ঞেস করল, মঞ্জুদায়ও যাবা? হয়ত্যই?

ক্যান? যামুনা ক্যান্? কইলাম তো হ্যারগো পাকটা ভাল।

না, বাওন তো। মানে, ভট্টাইজ্জ বাওন। হে কারণ—

হেয়াতো আগেই কইলাম। মোর কী শ্যাহের বাড়ি খাইলে গায়ের লোম পড়ইয়া যাইবে? না আগে খাই নাই? আরও এডা শাস্তরেও আছে। গপ্পোডাতো কইলামই।

না, হেই কই। ধলু বলে, সাব্যস্ত হয় সন্ধ্যায় জব্বারের বাড়িতে সবার দাওয়াত অভিযান হবে।

শওকতের নামটা উচ্চারণ হতে বুঝলাম এখানে তাদের সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব বেশ রকমই আছে। একদিকে হিন্দুরা জাত নির্বিশেষে মুসলমান বন্ধুর বাড়ি জোর করে দাওয়াত খাওয়ার উদারতা যেমন অর্জন করেছে, অন্যদিকে আরেকদল ঘোর কট্টরপন্থী হয়ে পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্টও। এক্ষুনি এসব নিয়ে আলোচনা করাটা সমীচিন নয়। কিন্তু সবে এসেছি। হক যদিও একসময় মুসলিম লীগ মনস্ক এবং পাকিস্তান পন্থীই ছিল, তথাপি মনে হয়, ওর কাছ থেকে এসব বিষয়ে সঠিক খবর পাব। মতামতের দিক দিয়ে এখন যাই হোক, ওর কথাবার্তা খুব পরিষ্কার। ও যা বিশ্বাস করে, সেটাই বলে। সেই বিশ্বাসটা হয়ত কখনো সাম্প্রদায়িকতাবাদি, কিন্তু সেটা এখানের অর্থাৎ এই অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্য। তার কারণ পরম্পরাগত কুশিক্ষা, অশিক্ষা, অভ্যাস এবং পারস্পরিক মেলামেশার প্রসারতার অভাবের মধ্যেই এতকাল নিহিত ছিল। এখনও যে একেবারে তা নির্মূল হয়েছে, এমন নয়। তবে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপারটাকে অনেকটাই দূর করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃত কট্টর সাম্প্রদায়িক এবং দাঙ্গাকারীরা আর মোটামুটি উদারপন্থীরা এখন পরিষ্কারভাবেই দুটো আলাদা দলে পরিণত হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই সমাজের এবং দেশের পক্ষে একটা হিতকর দিক। কিন্তু এই পোলারাইজেশনের একটা ভয়ঙ্কর দিকও আছে। চরম কট্টরপন্থীরা ক্রমশ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের আওতার মধ্যে চলে গিয়ে এমন সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করছে যে, এখন আর আগের মতো ব্যাপারটা সরল হিন্দুবিদ্বেষ. মুসলমান বিদ্বেষ থাকছে না। তালিবানি দর্শনের তাৎক্ষণিক সুখ স্বপ্নের মোহাচ্ছন্নতায় কট্টরবাদিরা ক্রমশ অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। তাদের আদর্শ থেকে যারাই সামান্যতম বিচ্যুতির দিকে যাচ্ছে, তারাই তাদের শত্রু হচ্ছে এবং তাদের শত্রু হওয়া মানে কী, তা এখানে শ্রেণি, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাই জানে।

আগে, অর্থাৎ যখন বিরোধটা শুধুমাত্র হিন্দুমুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল, তখন একপক্ষ দুর্বল, অপর পক্ষ সবল হলেও ঘটনাগুলো

এখনকার মতো ছিল না। সেসব ঘটত সময় বিশেষে। ভারতের কোথাও কিছু ঘটলেই যে সবসময় তার প্রতিক্রিয়া এখানে তীব্রভাবে হতোই এমন নয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে কিছু হলে, এখানকার আপামর জন ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হতো। মুক্তিযুদ্ধ ঘটার সময় এখানকার বাঙালি চেতনা যে পর্যায়ে গিয়েছিল তাতে সেটা স্বাভাবিক এবং ন্যায্যও বটে। মুক্তিযুদ্ধ এখানকার সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে প্রায় অনেকটাই পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ে যারা মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় বিরোধিতায় ছিল, তারা বিজেতৃদের ক্ষমতা লাভের পরবর্তী উন্মত্ততা এবং ক্রমশ স্বার্থসন্ধানী হওয়ার সময়টাকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে, আর এভাবেই আজকের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের অনুগামী হয়ে মহাদানবে পরিণত হয়। শওকত নেছারাবাদি তারই এক সামান্যতম নমুনা মাত্র। একদার মুসলিম লিগ অবশ্যই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, নীতি ইত্যাদি ভ্রান্ত ছিল, বিভেদ-পন্থাও তাদের দৃষ্টিকে নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্নতাকামী রেখেছিল। কিন্তু সেখানে সৎ, সুমানবিক ব্যক্তিমানুষও যে ছিল এ সত্য অস্বীকার করা উচিত না। সে তুলনায় বর্তমানের উগ্রবাদিরা যে চূড়ান্ত ফ্যাসিস্ত তাতে সন্দেহ নেই। সেখানে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব তুচ্ছ। কিন্তু সেসব মানুষদের সঙ্গে পরিচয় না থাকায়, ব্যক্তিক ভাবে তারা কেমন জানি না। যতটকু প্রচার মাধ্যমে আসে ততটুকুই শুধু জানি। কিন্তু সে জানা তো একতরফা। তারা সবাই ভয়ঙ্কর—এরকম একটা খবর জানা তো আদৌ জানাই নয়। শওকতকে সামান্য সময়ের জন্য দেখেছি। গোটা মানুষটাকে বোঝার জন্য তা যথেষ্ট নয়। তাতে শুধু এটুকুই বুঝেছি যে সে অত্যন্ত 'কাফের' বিদ্বেষি, পুরুষতান্ত্রিকতা তার চরিত্রে প্রবল, অতিমাত্রায় ধর্ষকামীও সে। কিন্তু তাও একজন মানুষকে জানার জন্য প্রায় কিছুই না। ওরকম মানুষ এখানকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে বরং বেশিই আছে। অবশ্যই এর পিছনেও সমাজের দায়িত্ব কম নয়। কিন্তু সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রে ভয়ের যেটা, তা হলো তাদের মধ্যে ব্যক্তি মানুষই নেই। আর ব্যক্তিমানুষ ছাড়া হৃদয়ের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। তাই সেখানে স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম করুণা প্রভৃতি সু-মানবিক বোধগুলির আশ্রয়ও থাকে না। সেখানে সবটাই ঘৃণা।

পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা গল্প করতে বসে খুবই আনন্দ হচ্ছিল বটে, কিন্তু সকালে শওকত নেছারাবাদির কাণ্ড কারখানা, হেলেনের দুর্দশা, মোতাকাকার অসহায়তা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর জন্য মনটা সেই চিন্তায়ই মগ্ন হয়ে পড়ছিল। এদের সঙ্গ সুখ প্রাণ খুলে উপভোগ করতে পারছিলাম না। আর মাঝে মাঝেই যীশুদার, সন্নর এবং নিরঞ্জনের খবর জানার জন্য প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছিল। কেউই তাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছিল না। সবাই কেমন যেন বিষয়টা এড়িয়েই

যাচ্ছিল। আমিও জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না, কী খবর তাদের। মনের মধ্যে, আসলে একটা ভীতি কাজ করছিল, কারণ কথায় কথায় জেনেছি, সেই সময়কার অনেকেই নেই। কেই মুক্তিযুদ্ধে, কেউবা বিনা কারণে রাজাকার, আলবদরদের, অন্ধ আক্রোশের বলি হয়ে, বা কেউ রাজাকার হিসাবেই অকালে গত হয়েছে। কেউ বা সাম্প্রতিক সন্ত্রাসীদেরও লক্ষ্য হয়েছে। কেউ আবার রোগ ব্যাধি বা অন্য কোনোও প্রাকৃতিক কারণেও আজ আর নেই। তবে যাদের কথা এই মুহূর্তে ভাবছি, তাদের কিছু ঘটে থাকলে মঞ্জুদা এতক্ষণে নিশ্চয় বলত। কী জানি ?

আট

সন্ন বিষয়ক কিছু বৃত্তান্ত

কথা গল্পে বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল অনেকটা। মঞ্জুদা বলল, ল' যাই, এ বেলা আর কোনো হানে যাইযা কাম নাই। আমার বাড়িতেই যা হউক খাবি হ্যানে। ধলু বাধা দিয়ে বলল, না! মুই বাড়িতে খবর পাডাইয়া দিছিলাম। হেহানে খাওনের ব্যবস্তা অইছে। এহন আর অদ্দুর যাওনের দরকার নাই। সত্যিই বাজার থেকে মঞ্জুদার বাড়ির দূরত্ব বেশ খানিকটা। সুতরাং ধলুর বাড়ি যাওয়াই ঠিক হলো। ধলু আমার অনেক ছেলেবেলার বন্ধু। ক্লাশ ফাইভে এক সঙ্গে পড়েছি। সেইসব দিনে ও আমাকে ভীষণ ভালবাসত। ধলুরা জাতে ধোপা। ওর সঙ্গে সেসব দিনে ক্লাশের ছেলেরা খুব একটা মিশত না। কারণটা জাতগতই। জাতপাতের ব্যাপারটা আমারও যে ছিল না তখন এমন নয়। তবে ওর একটা বিশেষ গুণের জন্য, ওর প্রতি প্রবল টান ছিল আমার। ধলু খুব ভাল ফুটবল খেলত। তাছাড়াও আমাকে এত গুরুত্ব দিয়ে ভালবাসত যে জাতটা বেশি সমস্যার সৃষ্টি করতে পাবেনি। কিন্তু হকের যে আসার কথা ছিল। সে গেল কোথায়? সে বাড়িতে গিয়ে শওকতের ব্যাপার স্যাপার শুনে কোনো হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বসেনিতো? হকের মতাদর্শ যাই হোক, সে স্বভাব ভদ্র। শওকতের আচরণকে সে নিশ্চয় বরদাস্ত করবে না। আমাকে সে বন্ধু বলেই জানে। মনে একটু চিন্তা থাকলই। অনেক কাল বাদে এসেছি। আমাকে নিয়ে এদের কারুর কোনো পারিবারিক অশান্তি হোক, সেটা অবশ্যই চাই না। মোতাকাকার অবস্থাটা দেখে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হেলেনের ছোটবেলার মুখটা মনে ভেসে উঠছিল। আমার ছোটবোনের সহপাঠী ছিল সে। বাহাত্তরে যখন এসেছিলাম, তখনও দেখা হয়েছিল। মেয়েটাব সঙ্গে দেখা হলো না এবার! আমি তখনকার দিনে মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে খুব বেশি মিশিনি। সুযোগ ছিল না সেরকম। কিন্তু যতটুকু মিশেছি, বেশ নম্র ভদ্র বলেই মনে হয়েছে তাদের।

আমার এই সব চিন্তা ভাবনা যে অনুভূতির কারণে তা হয়ত অনেকের কাছেই অর্থবহ হবে না যদি ফেলে যাওয়া ছোটবেলায় এভাবে ফেরার প্রচেষ্টাটা কেউ

ধারণায় আনতে না পারে। এগুলো ছিন্নমূল মানুষদের ব্যথা বেদনার এলোমেলো দীর্ঘশ্বাস। সকাল থেকে এই হেলে পড়া দুপুরের সময়টুকুর মধ্যে এতসব বলা, না বলা এবং মস্তিষ্কে ভিড় করা কথাগুলোকে গুছিয়ে বলার শক্তি যদি আমার থাকত! এইস্থানে আমার ফিরে আসার স্থায়িত্বের একটি নিমেষও যেন আমি নষ্ট করতে রাজি নই, এরকম একটা মনোভাব আমার এখন। না, দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি, ঘুম বা বিশ্রামের সাহায্যে দূর করার ইচ্ছেও আমার নেই এখন। তাহলে যে আমার আকাঙ্ক্ষিত—এই ফেরার অনেকটা ক্ষণকেই আমি হারিয়ে ফেলব। আমার মতো মানুষের, যার চিন্তায়, চেতনায় এইসব মানুষ, মাটি, গাছপালা, নদী, খাল অত্যন্ত ওতপ্রোত হয়ে আজও মহার্ঘ হয়ে আছে, তাকে হারিয়ে ফেলার ক্ষতি ক্ষণকালের জন্য হলেও কী স্বীকার করা যায়? আমাকে যে এখনও অনেকের বার্তা জানতে হবে। আরো খানিক সুখ পাবার আশায় তাদের খোঁজ করে করে হয়ত অনেক দুঃখ পেতে হবে এবং সে কারণেই তো এই ফেরা।

ধলুর বাড়িতে খেতে খেতে, যীশুদা আর সন্নর বিষয়ে আর উদাসীন থাকতে পারলাম না। বিশেষ করে যীশুদার বিষয়ে। সন্ন আর নিরঞ্জন নিশ্চয় সুখে দুঃখে ঘর কন্না করছে। যীশুদা? সে কী সন্নকে ভুলে যেতে পেরেছিল? এতটুকুন এই গ্রামীণ জগৎ, সেখানে কী কোনোদিনই যীশুদার সঙ্গে সন্নর আর দেখা হয়নি? আমি জানি না, আমাকে কেন, এতসব বিষয় থাকতে, এই ব্যাপারটার চিন্তা এমন আকুল করল। আসলে বোধহয়, আমার জ্ঞানে এটাই প্রথম দেখা প্রেম ও যৌনতার স্মৃতি বলেই তা মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে বা আমি বোধ হয় তাদের মিলন হোক এটাই তখন অবচেতনে চেয়েছিলাম।

ধলু বলল, বেয়াক কতা তোরে কমু কইয়াই লইয়া আইছি। তুই ঘুরইয়া ফিরইয়া হ্যারগো কতাই খালি জিগাইতে আছিলি। হেয়া ম্যালা লোম্বা কতা। তয় হোন্। সন্নর কতা দিয়াই শুরু করি। পেরথমেই কই সন্ন এহন আর নিরঞ্জনের বৌ নাই। হে আর যীশুদা সোমাজ ক্যাগ করইয়া আলাদা সোংসার পাত্‌ছে।—এরপর ধলু সন্ন, নিরঞ্জন আর যীশুদার কথা সবিস্তারে বলতে থাকল। সন্ন বিয়ের পর বছর দুই বেশ ভালই ছিল। কিন্তু নিরঞ্জনটা কেমন যেন বিগড়ে যাচ্ছিল। নাথ কোম্পানিতে যাত্রার চাকরিটা দিব্য চলছিল। বড় রায় ওদের পৈত্রিক বিষয় আশয় ভাগ করেও দিয়েছিলেন। অসুবিধে বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু মানুষের কখন যে কী হয়, কেউ বলতে পারে না। যাত্রার দলের লোকেরা এক আধটু নেশাভাঙ করেই, মদটদ, গাঁজা চরস খায়। নিরঞ্জনের সেসব নেশা ছিল না। মদের নেশা অল্পস্বল্প ছিল। কিন্তু তার ওপর ভর করল এক ভিন্ন নেশা। এবং সেটাকে উপলক্ষ্য করে অন্য সব নেশাও আস্তে আস্তে পাকা হলো।

প্রথমটা জুয়া। এসব ব্যাপার যাত্রাদলের ছেলে ছোক্‌ড়াদের মধ্যে খুব চালু। যখন কাজকর্ম থাকে না, তখন তারা এই নিয়ে মত্ত থাকে। হাতে মাস গেলে পয়সা আসে কাঁচা। সেই গরমে এবং কুসঙ্গে পড়ে জুয়া, মদ, গাঁজার নেশায় বড় মত্ত হয়ে যায় তারা। নিরঞ্জনেরও তেমনই হয়েছিল। জুয়ার আসরেই তার ঘনিষ্ঠতা হয় একটি ছোকড়ার সঙ্গে। যাত্রার দলে তখনকার দিনে ছেলেরাই রানী, সখি, রাজমাতা এইসব সাজত। যেসব ছোকড়াদের দাড়ি গোঁফ ওঠেনি, অথচ বাড়ন্ত গড়ন, তাদের বড় কদর ছিল দলে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল মাকুন্দ অর্থাৎ তাদের কোনোদিনই গোঁফ দাড়ির বালাই থাকত না। গ্রাম্য যুবক দর্শকেরা এমন কী যারা প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে--তারাও, বড় বিমোহিত এবং যৌনকাতর হয়ে পড়ত এদের দেখে। তাদের আচার-আচরণ, হাব ভাব, চটুল চাউনি, হাঁটা চলার ধরণ, লজ্জা অনুরাগ বিরাগের প্রকাশ প্রায় চটুলকলাটিয়সী যুবতীদের মতই ছিল। মনে হয়, দীর্ঘদিন অভিনয়ের স্বার্থে এই রকম অভ্যাস করতে করতে এবং দলের ও দর্শকদের মধ্যের কারুর কারুর সঙ্গে কামাতুর সংসর্গ করে করে, মানসিক ভাবেও তারা প্রায় নারী স্বভাবীই হয়ে যেত। নিরঞ্জন এরকমই একটি সখির প্রেমে এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে, সে যে সন্নকে বিয়ে করে সংসার পেতেছিল, তা পর্যন্ত আমল দিল না। তাদের জীবনে দিনের পর দিন স্ত্রী সংসার ছেড়ে, দেশ বিদেশে থাকার সময়ে, কখনও কখনও, কিছু কিঞ্চিৎ যৌন বিচ্যুতি হওয়াটা অসম্ভব ছিল না। তার দৌড় খুব জোর বাজারি মেয়েদের কাছে যাওয়া, দুদণ্ডের ফূর্তি করা, বাস্‌। কিন্তু এক্ষেত্রে এই সখিটির প্রেমে একেবারে ডুবে গিয়েছিল সে। আজকের দিনে এরকম সমকামী প্রেম নিয়ে বেশ আন্দোলন টান্দোলন হচ্ছে বটে, তবে সর্বসাধারণ ব্যাপারটাকে এখনও বোধ হয় আমলে আনেনি। ব্যাপারটা পশ্চিম সাগর পেরিয়ে এ পাড়ে এসে পৌঁছোলেও শহর নগরের কিছু আনাচ কানাচেই সীমাবদ্ধ। ও নিয়ে সাধারণ লোকেরা এখনও তেমন মাতামাতি কিছু করছে না। অবশ্য অতিআধুনিক ব্যক্তি স্বাধীনতাকামী বুদ্ধিজীবীদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বার্থে মানুষের অর্জিত সব সামাজিক সুষমতা এবং শৃঙ্খলাকে তুচ্ছ করতে পারেন। কিন্তু ধলু বুদ্ধিজীবি নয়। তাই নিরঞ্জনের কথা বলতে গিয়ে ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণায় মুখ বিকৃত করে বলে, ওর কথা ছাড়ইয়া দে। ঘরে ঐরহম বৌডা, য্যার তিন কুলে কেউ নাই, হ্যারে ফ্যালাইয়া উনি সুবল রানিরে লইয়া থাকপেন। কী আল্লাদের কতা কছেন। এয়া সইজ্য করণ যায়।

—আমি জিজ্ঞেস করলাম, সন্নর কী অবস্থা তখন?

পোলা মাইয়া নাই। ঐ পাতার ঘরের কথা মনে আছে তো, হেইহানেই থাকতে। বাড়ির ভাসুর দেওররা ও ডাইক্যা জিগাইতে না। যোবতী বৌ একলা

থাহে ক্যামনে ? খুবই দুরবস্তা তহন। খাওনের অভাবটা তো আছেলে না। জমির ধান যা পাইতে, চলইয়া যাইতে। কিন্তু মাথার উপর পুরুষ মানুষ তো একজোন থাহন লাগে, না-কী ? যদ্দিন রমণী ঠাকুর আর হ্যার বৌ আছেলে, হ্যারা সন্নর দ্যাহা শোনা করতে। আর খোজ খবর করতে যীশুদা। যীশুদা গেছেলে একবার নিরঞ্জনেরে বুঝাইয়া হুনাইয়া ফেরৎ আনতে। হ্যারে উল্ডা অপমানের একশ্যাষ করইয়া হারামজাদায় কয়, মুই আর জানি না, তুই হ্যারে বিয়ার আগেই নষ্ট করছিলি বলইয়া, জোরজবরদস্তি মোর ঘাড়ে গছাইলি। এট্টা ভিক্ষুতের নষ্ট মাইয়ার লগে মুই ঘর করুম ? যীশুদা নাকি মাথা নীচু করে চলে এসেছিল। সে সন্নকে খুবই ভালবাসত—একথা মিথ্যে নয়। ধলু বলে চলল যে, সন্ন রাজি থাকলে সে তাকে বিয়ে করতো। হতো বদনাম হতো। সে তার দাদার সঙ্গে ভিন্ন হয়ে নিজের সংসার পাততো। ভিন্ন তোসে হয়েছিলই। না হয় আগেই হতো। কিন্তু সন্ন তখন বাপের ভয়ে রাজি হয়নি, না-কী জানি না, নিরঞ্জনের সঙ্গে তার বিয়েটা বড় আনন্দ করেই দিয়েছিলাম আমরা। তার যে এই পরিণতি হবে, তা কী সেদিন জেনেছি ? আনন্দ সন্নরও হয়েছিল, নিরঞ্জন দেখতে তো সত্যিই রাজপুত্তুরের মতোই ছিল।

ধলু বলল, তারপর শোন। যীশুদা তো এমনে সোজা সরল, কিন্তু কপাল যাইবে কই ? বোগদা ছোগদা মানুষ। কিন্তু গোয়ারও। নিরঞ্জন সুবল রানিরে লইয়া তহন থাকে হরিপাশা। হরিপাশা চেনো তো ?

হরিপাশা কোথায় ?

হরিপাশা অইলে তোর বরিশালের লাগালাগি। ঝালকাডি বরিশাল বডার কওন যায়। হেইহানেই সুবল রানির বাড়ি।

সুবলের বাড়িতে আর কে ছিল ?

কেউ না। মা বাপ মরছে। গ্যাদাকাল থিহাই যাত্রাদলে সখি। নাচ গান ভাল জানে বলইয়া পেরথম থিহাই কদর আছেলে খুব। ডাঙ্গর হওয়ার পর অইতে পেরথমে রাজকন্যা, পরে রানি, লগে লগে নিরঞ্জনের মাউগ-গিরি। হারামজাদা ব্যাডা-মাগি।

যাকগে, সে তো অনেক দিন আগের কথা। তারপর কী হলো ?

হেয়াতো লম্বা বিত্তান্ত। কতই বা কমু।

কী অদ্ভুত মানুষের জীবন ! যে নিরঞ্জন সন্নর আমরা বিয়ে দিলাম জবরদস্তি অত কাণ্ড করে, মাত্র দুবছর তারা সংসার করলো কী করলো না, কী রকম নয়ছয় হয়ে গেল তাদের জীবন।

এবং সেই নয়ছয় হওয়ার মূলে কীনা যাত্রাদলের একটা ছোক্‌ড়ার পিরীত।

আমার শুধু মনে পড়ছিল বিয়ের রাতের কথা। সেই বাঁশের খুঁটি, বাঁশের

খাট, পাতার ছাউনিওলা ঘর, তার কোনো চিহ্নই আজ নেই। ভিতটা পড়ে আছে, তার ওপর কিছু বুনো ঝোপ। ঐ ঘরটায় আমরা সেই রাতে কী চমৎকার মাইফেল জমিয়ে ছিলাম। তারপরের দিনগুলোতে যে বাস্তব অতটা রূঢ় হয়েছিল, অকরুণ হয়েছিল। তার খবর তো আমার কাছে ছিল না। আমি মনে রেখেছিলাম শুধু ছেলেবেলার মজার গল্পটাই। তারপরের কথা যে অত বিচিত্র। যাক্, সে যথাক্রমে হবে।

তা যীশুদা গোঁয়ার্তুমিটা কী করল? আমার প্রশ্ন।

ধলু বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, কই দাড়া। রমণী ঠাকুর মরার পরও এইরহম কিছুদিন চললে। কিন্তু গেরাম গা জাগা। সন্ন তহন ভরা যুবতী। উপকারইয়া মাইনসের গো তো এই সুবিদায় পোয়া বারো। মায় বুড়ি মানুষ, হ্যার উপার হারা জীবন তো কাতরাইছে ভিক্ষুতের বৌ অইয়া! কিন্তু এহন তো ভাতের অভাব নেই। হ্যার লোভ য্যান্ তহন লক্‌লক্ করইয়া ওড্‌লে। পয়সার লোভ। এ য্যান্ মড়া হাঁসে কুড়ার লাগর পাইছে। তো বোজতেই পরতে আছ, উপকারইয়াগো হে মাথারি 'লাইসেন' দে! মাইনে সন্ন তহন সোনার হাস। হ্যারা আইয়া যহন তহন সন্নরে খাউব্‌লায়।'

ব্যাপারটা ধলু পরিষ্কার করে বলতেও যেন লজ্জা পায়। কিন্তু বলেও। সন্ন ছোটবেলা অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর অভাবের জন্য যেমনই আচরণ করুক স্বভাবে স্বৈরিণীও ছিল না, তেমন উচ্ছৃঙ্খলও না। বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিচার বাস্তবানুগ হয়েছিল অনেকটাই। বড় রায় মশায় তখন ভীষণ অসুস্থ। তথাপি একে তাকে নিরঞ্জনের কাছে পাঠিয়ে, তাকে প্রায় উঠিয়ে আনালেন তিনি। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়। নিরঞ্জন মাসখানেক খুব ভাল মানুষের মতো সংসার করে। আসলে তলে তলে তার ধান্দা ছিল অন্য। গোপনে সে জমিজমা সব বিক্রিবাটা করে দেয়। সন্ন তার কিছুই টের পায় না। এর মধ্যে একদিন সুবল রানি এসে হাজির। নেহাৎ বেটা ছেলে, নয়তো শুরু হতো 'সতীনইয়া ঘাডা'। কিন্তু তা যে খুব কম হয়েছে এমন নয়, সুবল রানি আসার পর সংসারে নিত্য অশান্তি। তখন আর যাত্রার দল নেই। নানান কারণে তা ভেঙে গেছে। সুবল রানির পয়সা কড়ি ভালই ছিল। এদিকে নিরঞ্জনের জমিজায়গা বিক্রিবাটা শেষ। এইসময় এক রাত্রে মহা হুলুস্থুলু। মারপিট গালাগালি। কী না, সুবল রানি এবং নিরঞ্জন একযোগে ঘোর মদ্যপ অবস্থায় সন্নকে ধর্ষণ করেছে। এমনিতে তো তারা সন্নর উপস্থিতিতেই নিত্য রাসলীলা করতো। সেদিন মদের ঘোরে হোক বা বৈচিত্র্যের নেশায়, দুজনেই জোর জবরদস্তি সন্নকে চূড়ান্ত ভোগ করলো। পাড়া প্রতিবেশীরা, যা দুএকঘর তখন আশে পাশে ছিল, এসে সেই

রাত্তিরেই দুজনকেই উত্তম মধ্যম দিয়ে গ্রামছাড়া করে। বুড়ি ঘটনাটাকে খুব একটা আমল দেয়নি। তার বক্তব্য, 'জুয়ান পোলাপান নেশার ঘোরে এক আধটু চৈঠ্যতো করেই।' তাছাড়া নিরঞ্জন তো আইনত, ধর্মত সন্নের সোয়ামি। এথে হ্যার দোষ কী? কিন্তু গ্রাম ছাড়া হয়ে নিরঞ্জন আর সুবল রানির সুবিধেই হয়েছিল। তারা হরিপাশাতে গিয়ে সুখে ঘরসংসার করতে লাগল। সন্নকে তাদের আর দরকার ছিল না। তবে মার খাওয়ার জন্য একটা আক্রোশ তাদের ছিলই।

ধলু বলল, এমন কাণ্ড, যে বিতাং দিয়া সব কওনও যায় না। অবস্থা সঙ্কটে উঠল চরম, যখন বোঝা গেল সন্ন সন্তান সম্ভবা। ব্যাপারটা একধরনের সঙ্কট মোচনও হতে পারত, যদি গেরস্থালিটা বজায় থাকত। কিন্তু সে রাস্তা নিরঞ্জন বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিল, জমি জায়গা বিক্রি করে দিয়ে। পরের মরশুমে ব্যাপারটা বোঝা গেল, যখন ঘরে একদানা ধান উঠল না। কথাটা 'হালইয়ারা' সন্নকে আভাসে আগেই বলেছিল। কিন্তু সন্ন বিশ্বাস করেনি। সে ভেবেছিল, তারা তাকে ঠকাবার ধান্দা করছে। মাথার ওপর মুরুব্বি নেই। সুতরাং ধান পান হয়তো নিজেরাই দখল করার ধান্দায় গুজব ছড়াচ্ছে তারা। তারপর, 'দ্যাশটাতো শ্যাহেগো', তারা যা কিছু তাই করতেই যে পারে, এরকম একটা ধারণা তো হিন্দুদের মধ্যে তখন প্রবল। বুদ্ধি দেবার লোকেরও অভাব নেই। এবং এসব ক্ষেত্রে সুবুদ্ধি আর কে দেয়? বিশেষত গ্রামে। সুতরাং সন্ন তখন অকুলে।

যীশুদা তখন কিছু করেনি? মানে, দেখাশোনার কথা বলছি।

হোন্ না। যীশুদা তো ঐ যে এক ঘা খাইলে যে হে সন্নরে নষ্ট করছে আগেই, হে কারণে আর ইদিক ঘেষেই না। কথাডা, নিরঞ্জন আর সুবল রানি যহন এহানে লীলা কেত্তন লাগাইলে, তহন আরো য্যান্ পাখনা ম্যাল্‌লে। বুড়ি আবার হেথে মদত দেলে। হেতো জানতে যীশুদার হাউস। হেইসব কথা চালাচালি তহন তুমুল। যীশুদা আয় কেমনে? মানুষটা তহন কী যে অইয়া গ্যাছেলে, তোরে কী কমু। —কিন্তু শেষতক যীশুদা চুপচাপ থাকতে পারল না। তাকে বাধ্য হয়েই একদিন সন্নদের বাড়িতে যেতে হলো। সেই কারণটা বড় মর্মান্তিক।

যীশুদা শুনেছিল যে তাদের তখন ভিক্ষে করে চলছে। আবার ভিক্ষা! একমাত্র বাড়িটা, অর্থাৎ ঐ পাতার ঘর বাঁশের খুঁটির কুটিরটা, তাও খুব জীর্ণদশা, সেটা ছিল বলে কোনোমতে মাথা গুঁজেছিল। ঐ ভিত জমিটুকু বড় রায় মশায় দিয়েছিলেন বলে নিরঞ্জন সেটুকু বিক্রি করার সাহস পায়নি, এই যা কপাল। সন্ন ভিক্ষে করছে, একথা শুনে যীশুদা যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। সন্ন আগে তাকে প্রায়ই বলতো, 'বিয়ার পর মোর য্যান্ আর ভিক্ষুতের জীবন কাডাইতে না অয়।' তো সেটাই হলো শেষতক? দিদি ছিল, সেও ঘর ছেড়েছিল একজনের

সাথে। যীশুর ভাগে জমিজমা কম ছিল না। একা মানুষ। বড় ভাই পৃথক করে দিয়েছিল সেই কবে। সেই থেকেই সে একেশ্বর। ঘর আলাদা করে নিয়েছিল। ধান চাল যথেষ্টই পেত। এখন সন্নর অবস্থা শুনে, একদিন অনেক রাতে, সবার অলক্ষ্যে সে চাল, ডাল, আনাজ-পাতি নিয়ে সন্নর বাড়িতে এল। তাকে দেখে সন্ন কিছু বলল না। কিন্তু তার মা এমন আরম্ভ করল যে যীশুদা যেন তার পেটের সন্তানেরও অধিক। বললো, তুমিই এহন থিকা অরে ভোগ দখল কর। মোর আফইত্য নাই।

ধলু বলতে লাগল, মুই তো লগে আছিলাম। যীশুদায় কইছেলে, আপনের লগে কতা কইতে মোর ঘেন্না করে। মা অইয়া–, যাউক- এসব কতা পাচকান্ করইয়া, ক্যাচাল বাড়াইয়া লাভ নাই। ভাবছিলাম মঞ্জুদায়েরে লইয়া আমু। কিন্তু হেতো আবার লতায় পাতায় রমণী ঠাকুরের আত্মীয়। ক্যাচাল বাড়বে, হ্যার বৌ তো আবার সন্নর মায়ের দলে। এ্যারা বেয়াকেই একই পদের, কয়, সব দোষ সন্নর। নাইলে নিরঞ্জনের মতো পোলা, বৌ থুইয়া ছ্যামড়া পোঙ্গায়। যীশুদায় কইলে যে, ধলু, মুই সন্নরে ভালবাসতাম ঠিকোই, আর হেয়া তোরা বেয়াকেই জানতিও। হ্যারে আমি বিয়াও করতে চাইছেলাম। তো জাইতের লোমে আটকাইয়া হেয়া যহন অইলে না তহন বেচাল কিছু করি নাই। তমো নিমিত্তের ভাগি অইলাম মুই। মুই এহনও সন্নরে মনে মনে ভালবাসি। অরে আমি বুজিও। নিরঞ্জনইয়া যে মোর আর সন্নর নামে কুচ্ছা কয়, হেয়ার কারণ হে নিজের পাপ ঢাকতে চায়। ওডা মাইনসের জাইতও না। যাত্রার দলে যাওয়ার আগের থিহাই অর চরিত্তির মোর জানা আছেলে। ও আর অর ছোডো ভাই দুইজোনেই তো হেই গোণোকের বৌর লগে সুযোগ পাইলেই শুইতো। একবার তো ছোডোডা হাতে নাতে ধরা পড়ইয়া মাইর ধইর খাইলে। হে কতা যাউক। তো যীশুদা যহন সব মালপত্তর ঘরের ডোয়ায় লামাইয়া চুপচাপ ফিরইয়া আইবে ঠিক করলে, সন্নর মায় কয়, যাইও না। তুমি আগের জম্মে মোর পোলা আছেলা। মোর জেবনডতো তুমি, তোমরা বেয়াকে জানো। হারাজীবন ভিক্ষুকের হাতে পড়ইয়া ভিক্ষুতইয়ার জীবনই কাডাইছি। মোর ইচ্ছা আছেলে সন্নরে তুমি বিয়া কর। হেয়াতো হ্যার বাপে হইতে দেলে না। মুইতো জানতাম, তুমি সন্নরে কত ভালবাসতা। হে কারণেই কইলাম সন্নরে তুমিই রাহো।– বোজো কী অনাচার কতা।

আসলে এই কথাডা একছের মিথ্যা। রমণী লোভী বাওন, হ্যারে মোরা কায়দা করতে পারতাম, কিন্তু ঐ মাথারিইতো তহন জাইতের নামে একছের বেইক্যা বইলে। তোর হেসব মনে থাহার কতা না, তুই তো তহন মোগো থিহা বেশ কিছু ছোডো, সব জানলেও বুজতি না বেয়াক। ব্যাপারডা ঠিক জাইতের লইগ্যা না।

পেরথমে তো লালস আছেলে, যে বুড়ইয়ার লগে বিয়া ঠিক করছেলে হ্যার বিষয় সম্পত্তির লইগ্যা। হ্যাযে তো মোরা ব্যাগড়া দিয়া নিবঞ্জনের লগে যহন বিয়াডা দিলাম আর নিরঞ্জনেগো জমিজাগা ভাগাভাগি অইলে, তহন হেহানে পুরা কত্তালি করার লালস আছেলে মাতারির। এহন যীশুদারে আবার ঐসব কয়।

হেয়া যাউক, সন্নর মায় তহন নূতন খুডির লাগড় পাইছে। আসলে একতাও তো মিথ্যা না যে খয়রাইতগো মান কও ইজ্জত কও, কিছুই আর একসোমায় থাকে না। হ্যারগো মোন লয় এ্যাটটাই চিন্তা মনের মইদ্যে পাক খায়। হেডা খিদার চিন্তা। এই যে মোরা কতায় কতায় হ্যারগো নিন্দামন্দো কইতে আছি। আসলে ভাবইয়া দেখছি, এইসব দোষ তিরুডির এট্টাই কারণ, হেয়া অইলে অভাব। অন্নের অভাব অইলে, আস্তে আস্তে বেয়াক দোষ মাইনসের মইদ্যে বাসা বান্দে। রমণী যহন মোডামুডিও গেরস্ত, তহন তো হে বা হ্যার বৌ অমন ছল্লিবাজ, মিথ্যুক বা বেলাহাজ আছেলে না। খয়রাতি জীবন আবম্ব অইলে, যহন দ্যাশ থিকা যাত্রা, থিয়েটার, গানের দল উড্‌ইযা গ্যালে তহন। আগে রমণীর খাতিরদারি আছেলে কত। দশজোনে ডাইক্যা তহন আসর বওযাইতে এই বাজারেই। হেয়া তো তোরা দ্যাহনায়। হেই আসরে রমণীর নামে দশ গেরামের মানষ ভাইঙ্গা পড়ত। পাকিস্তানি আমলের গোড়ার দিকেও হেসব আছেলে বেশ জোমজমাট। হেতো হারাজীবন খালি গান বাজনাডাই শেখছেলে, আর তো কিছু শেহেনায়। হ্যাযে, মোল্লামুছুল্লিরা ফতোয়া দিয়া মেঞাগো এইসব জমাযেতে আওন দেলে বন্দো করইয়া। কী? না হেথে ইসলাম বিপন্ন অয় হিন্দুরা একে সংখ্যায় কোম। হ্যার উপর একের এক দ্যাশ ছাড়াইযা পাড়ি দিলে হিন্দুস্থানে, রমণীরও বয়স অইয়া অথব্ব অবস্থা। কী আর করবে। হেই কই। মানুষের খারাপ ভালর ওজন অয় অবস্তার তারতম্যে। ঐ যে কতায় কয় না। অভাবে স্বভাব নষ্ট, বুদ্দি নষ্ট নিদ্দনে, হে কতা একছের খাডি কতা, হেয়ার আর মাইর নাই। অভাবেই রমণীর লালাডি, অভাবেই সন্নর মায়ের কুবুদ্দি, সাথপরতা, যা কও। দুঃকতো লাগে। তো হ্যার ঐ মিথ্যা কথাডা হন্‌ইয়া মুই এট্টা জবাব দিতে যামু, যীশুদা হাত তুলইয়া মোরে থামাইয়া দেলে। হে কইলে, হে সব কতা থাউক খুড়িমা। কতা দিলাম, আইজ থিহা আপনেগো খাওয়া পরার দায়িত্ব মোর। তয়, এটটা কতা, মুই এহানে কৈলেম খালি বিপদ আপদ না অইলে আমুনা। এই ধলু আছে। আপনেগো কাছাকাছিই বাড়ি। দরকারে ও আইবে। বদনাম যা করার হেয়া মাইনসে করবেই, হেডাই হ্যারগো কাম। মোরও বদনাম যা হওয়ার হেয়া অইছে। মুই হেয়া ডড়াই না। তয়, আপনের ধারে বিন্‌তি করি, নিজের জেব্বাহান্‌ এটটু সামাল দেবেন। মাইয়াডারে আউন্‌খা পেহার দেবেন না। আর ঐ রাহন টাহনের

কতা আর কইবেন না। সন্নরে মুই-সোম্মান করি। হে মোর ধারে থাকলে ইজ্জত লইয়াই থাকপে।

একটানা এই পর্যন্ত বলে ধলু একটু দম নেয়। ওদের বাড়ির থেকে বেড়িয়ে আমরা জব্বারের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। কথা বিস্তৃতি পেলে, সামনের খাল পারের একটা কাঁঠাল গাছের ছায়ায় আমরা বসেছিলাম বাঁধানো একটা বেদির ওপর। বেদিটা অনেক দিনের পুরোনো। খানিক তফাতে খালের দিকে মুখ করা একটা একতলা ভাঙামতো বাড়ি। ভাঙা, তবে পাকা বাড়িই ছিল একসময়ে। বেদিটা এখনও বসার উপযুক্তই আছে, যদিও যারা একসময় এটা বানিয়েছিল, তারা আর এদেশে নেই। ধলু বলল, এই বাড়িডা আইজ অনেক সাল অইল ছাডা ভিডা। নষ্ট অইয়া গেছে। শশীনাথ কাকার বাড়ি। আমাগো ধোপাগো মইদ্যে এক সময ভাল অবস্থার মানুষ কইতে এরাই আছেলে। তয় মানুষ ভাল আছেলে না। পুলিশ দারোগার টাউটগিরি করইয়া একসময় অনেক পয়সা করছেলে। মিথ্যা সাক্ষী, কেস কামারি এইসব লইয়াই এ্যারগো কারবার। ফলে জাতগুষ্টির কেউই পছন্দ করতে না হ্যারগো। হুনছি পুলিশ দারোগাগো খুশি করনের লইগ্যা নিজের মাইয়ারে তামাইত হ্যারগো বিছানায় পাডাইতে। হেযা যাউক, মাইয়াডা হেই কারণেই, এই বাড়িতেই নাকি গলায় দড়ি দিয়া মরছেলে। তারপর এ্যারা সব ছাডইয়া হিন্দুস্তান চলইয়া গেলে। বাড়িডা হেই থিকা খালিই। মেঞাগো মইদ্যে এক আধজন এহানে দখলদারি করইয়া থাহনের চেষ্টা করছেলে। ভূতের জ্বালাতনে পারে নায। নিশুইত্ রাইতে নাকী মাইয়াডা এইঘর ঐ ঘর ঘোরে আর চিক্কইর পাডইয়া কয়, মোরে রেহাই দেও, মুই পুলিশের লগে হুমু না। হ্যারা মোরে কষ্ট যন্তনা দে, চিড়ইয়াফাড়ইয়া খায। বাপে মোরে ব্যাচে আর পয়সা কামায়। ধলু বলে, এই বাড়িডায় শ্যাষতক, গীশুদায় আর সন্ন কয়েকদিন আছেলে। হেযা একছের শ্যায-কাভালে।

কেন, এ বাড়িতে কেন? ওরা কী ঘর বেঁধেছিল?

না! পারে নায়। হেই কতাডুক কমু করইয়াইতো এ্যাতো কেত্তন গাইলাম। তয় হোন্। মাইনসের কপালে ভগবান যে কত পেহারের ব্যবস্তা করইয়া রাখছে আর ক্যান্ইবা, হেয়া একমাত্তর হেই জানে। মোরা কী কোনো হিসাব পাই? আমাগো কোনো হিসাবই মেলে না। আমরা ভাবি দুঃখের পর সুখ, আর সুখের পর দুঃখ—এইডাই বুজি জগতের নিয়ম। না, পিরাথমীতে এরহম সহজ সোজা নিয়ম নাই। মুইতো ল্যাহা পড়া জানিনা তেমন। ঐ যেডুক ছোডোবেলা তোগো লগে মিশইয়া, যদু মাস্টেরের পাঠশালায়, শিখছিলাম, হ্যার পরতো এই মুদি দোকান, পালা পৈরনের হিসাব আর গাহেকেগো লগে মেলামেশা করইয়া,

পাচজোনার সুখ দুঃখের কতা হুন্‌ইয়া যেডুক কাগুজ্ঞেয়ান। হেয়া ছাড়া জীবনে শেখলামই বা কী, আর বোজলামই বা কোন্ ছাতা। ধোপার পোলা, কিছু যে করইয়া খাইতে পারতে আছি এই তো অনেক। দুনইয়া দারির পইদ্য বোজার জ্ঞেয়ান বুদ্দি পামু কই? খালি দেইখ্যা হুন্‌ইয়া এইডা বোজলাম যে, ভালব ফল ভাল, আর মোন্দের ফল যে মোন্দ, এ রহম হয়ত্যই কোনো নিয়ম নাই। ওরা খালি মোগো মনের বুজ। যে দিনগুলা যায়, হেইয়াই ভাল, আর যেগুলা চলতে আছে হেগুলা দুঃকই দুঃক। খালি আশায় থাহন যে এ্যার পর বুজি ভাল দিন সুখের দিন আইতে আছে। বাল আইতে আছে। কিন্তু তমোও সন্নর আর যীশুদার দিন ফেরছেলে।

ধলু যতক্ষণ যীশুদা, সন্ন বা তার মায়ের কাহিনী বর্ণনা কবে যাচ্ছিল, ততক্ষণ ছেলেবেলার ধল্‌উয়াকে চিনতে বুঝতে আমার অসুবিধে হচ্ছিল না। ও হঠাৎ এ রকম একটা দার্শনিক মোড় নিতে আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। ক্লাশ ফাইভের পর ধলু আর পড়াশোনা করেনি। ওকে এরকম চিন্তাশীল গভীরতায় দেখব, এরকম আমি ভাবিনি। ওর প্রতি আমার ভালবাসাটা বাল্যস্মৃতির নানান টুকিটাকি দিয়ে গড়া। ওর আমার শিক্ষা সংস্কৃতিগত অবস্থান আজ তো আর সমান তলে নেই। সেখানে যোজন ফারাক। জীবন আমাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছে, ওকেও দিয়েছে। আমার ক্ষেত্রে শিক্ষা এবং বিচারবোধের যে অভিমান বা অহংকারটা তৈরি হয়েছে, তার দৌলতে বা অভিশাপে ওর সমান তলে নিজেকে আর স্থাপন করতে পারি না। সেইসঙ্গে আরও যেটা পারি না সেটা হলো ওর অবস্থানে যে শিক্ষা এবং বিচারবোধ ও স্বাভাবিক ভাবে, লোকায়ত ধারা অনুযায়ী রপ্ত করেছে, তাকে স্বীকার করে নিতে, বা সত্য বলে মানতে। এটা একটা যন্ত্রণার উপলব্ধি বটে। কিন্তু শৈশব কৈশোরিক ভালবাসার প্রাখর্য বোধ হয় আমাদের ভেতবের দূরত্ব দূর কবে দিতে পারল। তাই তার বর্তমান বোধের ব্যাপ্তি দেখে হঠাৎ অবাক হওয়ার অহংকারটা ঠেলে সরিয়ে, আমি যেন তার সঙ্গে সমান তলের অবস্থানে সহজ হতে পারছিলাম। সেটা অবশ্যই আমার একটা ব্যাখ্যাতীত আনন্দের কারণও হচ্ছে। আমি সাধারণের সমতায় আছি, এ এক অন্য জীবনবোধ এবং তা অসাধারণ প্রগাঢ়ও বটে। কিন্তু সাধারণের মমতায় যাওয়ার মতো অবস্থায় কী আমরা আর যেতে পারি? পারলেও সে যে কতো কঠিন, তা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

এরপর সে, ঐ পোড়ো বাড়িটাতে কেন যীশুদা সন্নকে নিয়ে কিছুদিন ছিল সে বিষয়ে আবার টানা কাহিনী বলে গেল। এ সব আমার কাছে এখন কাহিনীই বটে। কারণ এসবের ঘটমান অবস্থার সাক্ষী তো আমি হতে পারিনি। আমি তো

সেই সন্ন-নিরঞ্জনের বিয়ের কিছুদিন পরেই দেশছাড়া হয়েছিলাম। এদের সঙ্গে আমার আর কোনো যোগাযোগই ছিল না। প্রথম প্রথম যীশুদার কাছ থেকে দুএকটা চিঠি পেতাম। উত্তরও দিতাম। ধলুরও অন্তত একটা চিঠি একবার পেয়েছিলাম। দেশ ছাড়ার সময় ওরা আমার ঠিকানা রেখে দিয়েছিল। সেসব চিঠিতে গ্রামের সাধারণ খোঁজখবর, কেমন আছি, ইত্যাদি বিষয়ই থাকত। সন্ন-বিষয়ক কোনো কথা থাকত না। আমি জানতাম, নিরঞ্জন, সন্ন ওরা সুখে দুঃখে আর দশজনের মতো ঘরসংসার করছে। যীশুদার জন্য, তার প্রেমের সম্ভাব্য বিয়োগান্তক পরিণতির জন্য অনেকদিন ধরেই একটা দুঃখ বোধ ভেতরে ভেতরে কষ্ট দিয়েছে।

আমরা একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে ছিলাম। পল্লী গ্রামে 'প্রেম' ব্যাপারটা একদিকে যেমন গর্হিত পাপাচার বলে গণ্য হতো, তেমনি এর প্রতি আমাদের আকর্ষণ এবং কৌতূহল ছিল ভীষণ তীব্র। এরই মধ্যে যারা সাহসে ভর করে 'প্রেম' বা রোমান্স নিয়ে কিছুটাও আলোড়ন তুলত, তাদের প্রতি আমাদের মানসিকতা ছিল ভিন্নমুখী। একদিকে গ্রামীণ শিক্ষা, উপদেশ এবং সংস্কার অনুযায়ী তাদেরকে আমরা খারাপ ভাবতাম, বখে যাওয়া মনে করতাম, অন্যদিকে তাদের হিরোও ভাবতাম। তাদের প্রেম বা রোমান্সের উষ্ণতার কথা শুনবার জন্য অশেষ কৌতূহলও বোধ করতাম। একসময়, একটু বয়স বাড়লে, ব্যাপারটার মাধুর্যটাই শুধু মনকে টানত। যীশুদা আর সন্নের ব্যাপারটা সেই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি অন্তত, তাদের একটা মিলনান্তক পরিণতি হোক, তার সপক্ষে ছিলাম। যদিও আমার মনে এ জাতীয় সম্পর্কের জন্য সংস্কার ছিল ঢের। সন্নর বাসরে যীশুদার অনুপস্থিতির ঘটনাটা আমার বড় করুণ মনে হয়েছিল এবং সেই করুণতাটা বহুদিনই আমাকে পরবর্তীকালে উন্মনা করেছে, ব্যথিত করেছে। মনে হয়, যীশুদার ভালবাসার মধ্যে যে অনুপম সরলতাটা ছিল, যার জন্য সে সন্নকে কক্ষনো স্নেহার্ত ভাবে 'মাগো' বলেও ডাকতে পারত, বলতে পারত, মোরে এক গেলেস জল দে দেহি মাগো, বা কখনো বোন বলে ভাবতে পারত, আবার কখনো প্রেমিকা হিসাবে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারত, প্রকাশ্যে বলতে পারত, আমি অরে বিয়া করুম—যে যা কয় কউক, এই সব সন্নর প্রতি তার গভীর স্নেহ এবং ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। হয়ত আজকের বিচারে তা খুবই মেলোড্রামাটিক, কিন্তু তা সত্য এবং সত্য বলেই এখন, এইসব আলোচনা স্থানে তা খুবই যন্ত্রণা দিচ্ছে।

যা হোক ধলুর কাহিনীতেই ফিরি। সেই কাহিনীও বড় যন্ত্রণার। ধলু বলতে লাগল, যীশুদায়তো হ্যাগো খাওয়া পরার দায়িত্বডা নিলে। মধ্যস্থি মুই। মুই

বিয়াতো মানুষ তহন। বৌরে বেয়াক হিস্টিরি বুজাইয়া কইলাম। মোর বৌ এ্যামনে বোগদা ছোগদা, আ-ল্যাহা আভোদা। কিন্তু মনে প্যাচ্ নাই। কইলাম, দ্যাহ যীশুদারে লইয়া গেরামে নানান কেচ্ছা নানান জোনে কয়, হেয়া তুমিও হোনছো। তয়, হেয়ার বেয়াক হয়ত্য না। মোরাতো ছোডো কালের থিহা এক লগে বড় অইছি, জানি বেয়াক। যীশুদায়তো মোর বাড়ি ছাড়া ক্যাওর বাড়ি যায়ও না খায়ও না। একথা ঠিকোই যে বিয়ার আগে সন্নরে হে ভালবাসতে। হে সোমায় বড় জোর এক আধদিন হ্যারে হাবডাইয়া হোবডাইয়া দুই চাইরডা চুম্বা চাডা খাইছে। এ্যার বেশি কিছু না। হেয়াতো ছ্যামড়া ছেমড়িরা খায়ই। বিয়ার পর হে সন্নে গো বাড়ি একদিনও যায়নায় বা দ্যাহাও করে নায়। তমো, বেয়াকে যে কতা উডাইলে, হেডা একছের মিথ্যা। যাউক, যীশুদারে তো দ্যাখছো, এহানে আয়, গালগল্প করে। কোনোদিন দ্যাখছোনি কোনো বেচাইল, বা কোনো খারাপ ভাব সাব ? তো কই, মোরে হে দায়িত্ব দেছে, মাঝে মাঝে সন্ন গো বাড়ি চাউল ডাইল, এডাওডা দিয়া আইতে। মোর মনে অয়, এ কামডা যদি তুমি কর তয় ভাল অয়। মুই গেলে কেডা আবার কী কতা উডাইবে। তুমিও হ্যানে ভাববা, মোরইবা এ্যাতো গরজ কীয়ের। হ্যারথিহা কামডা যদি তুমি কর হেথে দোষ অইবে না। বৌ এট্টা বড় কতা কইলে। কইলে যে, তোমারে মুই অবিশ্বাস করি না। তুমি কোনো খারাপ কাম করতেই পার না। হুন্ইয়া মোর বুকটা ভরইযা গেলে। কইলাম, তমোও তুমিই যাবা। পিরতি বেশীর তত্ত্ব তালাস করা মোগো কত্তব্য। তো বৌ কামডা ঠিকঠাক মত করতে আছেলে। এভাবে চলতে আছেলে ভালই। কিন্তু এরহম কী বরাবইর চলে ? চললে হয়তো সাময়িক শান্তি অইত।

কিন্তু চললে না। দেশের অবস্তা বাইরে থিকা বোজোন না গেলেও, মোরা য্যারা গেরাম গাঁয়ের মানুষ, টের পাইতাম যে শহরে নগরে যদিও বা এ দ্যাশের হিন্দু মোছলমানেবা মিলইয়া মিশইয়া আছে, গেরামে হেরহম থাহার উপায় নাই। না, রায়ট ফ্যাসাদ কইতে যা বুজায় হেয়া নাই। ঝগড়া কাজইয়াও নাই হেরম। খালি ডাহাতির পর ডাহাতি। ডাহাতির ডরেই অদ্দেক মানুষ ফাকা। ঘরে সামাইন্য খুদ কুড়া থাকলেও ডাহাতি, না থাকলেও। তয় এট্টা বস্তু যা অতি আবইশ্যক, হেডা অইলে বারো থিহা বাহান্ন বচ্ছরের মাইয়া লোক। এয়া আগে খালি হিন্দুগো সোমেস্যা আছেলে। এহন হিন্দু মোছলমান বেয়াকের। এট্টু গতরআলা মাথারি অইলেই ডাহাতি।

সুতরাং সন্নদের বাড়িতে এক রাতে ডাকাত পড়ে। আদোকাঠির গ্রামে বা তার আশপাশে তখন গেরস্থালি নগণ্য। জনা চার পাঁচেক তাগড়া যৌন-উন্মাদ ছোক্‌ড়া নৌকো করে এসেছিল। পাশেই গোবিন্দলের সরু খালটা। সেখানে ডিঙি বেঁধে

চড়াও হয় সন্নদের কুটিরে। বেড়া কেটে ঢুকতে তাদের কোনো অসুবিধেও হয়নি, প্রতিরোধের তো প্রশ্নই নেই। বুড়ি হঠাৎ অতগুলো লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ায় একবার চীৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু সে ঐ একবারই। হার্মাদরা তাকে মুখ চেপে ধরে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে হাত, পা, মুখ ভাল করে যখন বাঁধছিল, তখন সন্ন নাকি সাহসে ভর করে অনুনয় করেছিল। ঘরে যা আছে বেয়াক লইয়া যায়েন। মোরগো পেরাণে মারবেন না। মায় বুড়ামানুষ, হ্যারে ছাড়াইয়া দেন। উত্তরে একজন বলেছিল, চুপ কর ছেড়ি, কিছু নেওয়ার লইগ্যা আইনায়। তোগো আছে কোন্ বাল যে নিমু? আইছি তোরে খাইতে। তোরে আইজ মোরা বেয়াকে মিলইয়া খামু। কাচা খামু। সব অঙ্গ খামু তোর। শওকত নাকী এর পেছনে আছিল শুনছি।

তারপরের ঘটনা চিরাচরিত পুরোনো গল্প। ব্যাপারটা শুধু শারীরিক বলাৎকার নয়। তার থেকে ঢের বেশি, যার বর্ণনা হয় না। ধলু বলল, মোর বৌর ধারে পরে সন্ন হেই অইত্যাচারের বেয়াক কাহিনী কইছেলে। কইছেলে যে মাইনসে যে ওরহম অইত্যাচার করতে পারে হেয়া হ্যার ধারনায়ও আছেলে না। ও, হ, সন্নর তহন পাচ মাস পোয়াতি। নিরঞ্জন ইয়াগো অইত্যাচারের ফল। এই অইত্যাচারে হেডা গ্যালে গাবলা। বৌ যহন হেসব কতা মোরে কইতে আছিলে, হে এমন কুওইল দেতে আরম্ভ করলে যেন বলাৎকারডা হ্যারেই করা অইছে। এ দ্যাশে তো রায়ট কও, ফ্যাসাদ কও বলাৎকারের শ্যায় নাই। কিন্তু বৌ যা কইলে, হেরহম বলাৎকারের কতা জীবনে হুনি নাই। বৌ খালি কইতে আছেলে, লও মোরা এই দ্যাশ ছাড়ইয়া শহর গোঞ্জে যাইয়া, বাসা ভাড়া করইয়া থাহি। নাইলে, মোরেও কোনদিন– ওরে বাবারে। হ্যার থিহা মুই গলায় দড়ি দিয়া মরমু। হ্যার থিকা শহর গোঞ্জে লও যাই। হিন্দুস্থানেতো মোগো কেউ নাই। কিন্তু হেহানে খামু কী? কাম কাজ দেবে কেডা?

ধলু বলেছিল যে সন্নকে নাকি তারা 'সব্বঅঙ্গে'ই ধর্ষণ করেছিল। যোনীদ্বার, পায়ু এবং মুখ বা সম্ভাব্য এমন কোনো স্থান ছিল না তার শরীরে যেখানে তাকে যৌন প্রহারে লাঞ্ছিত করেনি তারা। আমি ধলুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, –এরকম করার কারণ কী? জমিজায়গার গতি তো নিরঞ্জনই করে রেখেছিল। শুধু কী বলাৎকারের উদ্দেশ্যেই এই অত্যাচার? না, ভিটে বাড়িটা দখল করারও কোনো প্ল্যান ছিল তাদের?

ঠিকঠাক কইতে পারমু না। ভিডা বাড়ির জমিতো সামান্য পাচ কাডার, যেডা বড় রায়মশায় দেছেলেন। কিন্তু হেয়ার লইগ্যাও যে এতডা করার দরকার, হেরম বুজি না।

কাজটা কারা করেছিল জানা গেছে?

মোগো সন্দেহ এয়ার পেছনে আছেলে সুবল রানি আর নিরঞ্জনের মদত শওকতের কথাও শোনচ্ছেলাম। হেরা লগে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। কায্য গতিকে মনে অয় আছেলেই। কিন্তু হেয়া লইয়া কেস কামারি করতে যাইবে কেডা? আর জানোই তো, এহানে কোনো হিন্দুবাড়িতে এ রহম ঘডনা ঘডলে, হিন্দুরাতো আছেই, মোছলমানেরা পজ্জন্ত পেরথমে সন্দেহ করে মোছলমানেগোই। কারণ ঐ সোমায় মোছলমান বাড়িও তো বাদ যাইতে না। আসলে এসব য্যারা করতে হ্যারাতো হিন্দুও না মোছলমানও না, হ্যারা অইলে গরমেন্টের গোপনে পোষা—বদমাইস। তয়, বেশির ভাগ ঘডনার লগেই আছে জমি, বাড়ির থিহা উৎখাত করার চক্‌কর। পেরথমে বুজাইয়া, কায়দা করইয়া কাম হাসিল করতে চায়, না অইলে অবস্তা বুজইয়া এই কাণ্ড করে। হেয়া মুসলমানেরাই বেশী করে, তয় হিন্দুরাও যে একছের ধোয়া তুলসী পাতা একতা কওন যায় না। হিন্দুগোডা সহজে বোজা যায় না,—তো কারণ, হ্যারা সংখ্যা লঘু আর খ্যামতায়ও খাডো। কিন্তু এহানে অন্য এট্টা ব্যাপার মোর মনে অইছেলে, হেকতা মুই পুলিষ দারোগারে কই নাই। কওয়া যায়ও না। কোর্টে পেরমান দাখিল করা মুশকিল। নিরঞ্জন আর সুবল রানি বোধায় হ্যারগো যে অসোম্মান অইছেলে, হেযার বদলা নেছেলে এইভাবে। অইত্যাচারের পইদ্যডা তুই একবার ভাবইয়া দ্যাখ। তাবপর আরও এট্টা কতা আছে। ব্যাপারডা লইয়া মুই, যীশুদা আর মঞ্জুদা যহন পুলিশে এজাহার দেতে যাই, দেহা গেল সুবল রানি আর নিরঞ্জন, আগেভাগেই যীশুদা আর মোর নামে এজাহার দিয়া রাখছে। মোরা জানলাম না হ্যারা আগের রাইতে এ্যাদ্দুরের ঘডনাডা অত বেয়ানে জানলে ক্যামনে। গেরামের বাড়িতে এডাতো একছের অসোম্ভব ব্যাপার। পুলিশও এডা কিছু জিগাইলে না, মোগো কইতে দেলেও না। উল্ডা মোরে আর যীশুদায়েরে গারদে ঢুকাইয়া দেলে। মঞ্জুদার নাম এজাহারে আছেলে না। হে তো সন্নের বাপের বাড়ির আত্মীয়।

মঞ্জুদা ব্যাপারটার আকস্মিকতায় দিশেহারা। সে গিয়ে ধরলে বড়ো রায়মশায়কে। কিন্তু বড়ো রায় তখন লিভার সিরোসিসে প্রায় শেষ অবস্থায়। তাও মোতাকাকাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, মোতা, তুই দ্যাখ কী করতে পারা যায়। আমিতো শ্যাষ। ভালোর লইগ্যা করলাম এট্টা কাম, হেয়ার ফল দাড়াইলে এই? মোতাকাকা উকিল, মোক্তার, মুরুব্বি ধরে জামিনে খালাস করলেন ধলু ও যীশুদাকে। হক সাহায্য করছেলে বাপেরে। কিন্তু মামলা চালাবার ঝক্কি পোহায় কে? অত টাকাই বা কোথায়? সামাজিক বদনাম তো আছেই। ব্যাপারটা সাজানো হলো এরকম, যে সন্নর সঙ্গে বাল্যপ্রেমের ব্যর্থতা যীশুদাকে উন্মাদ করে তোলার

জন্যই ধলু আর অন্যান্য সঙ্গী সাথী জুটিয়ে এই অপকর্মটি করেছে সে ইত্যাদি এবং আনুষঙ্গিক আরো রকমারি গল্প, যা গ্রামীণ বদমাস আর পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টাই সম্ভব এবং তা আজও অব্যাহত।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই সন্নর ধর্ষণজনিত শরীর মানস সমস্যার চিকিৎসাদি করার জন্য কেউই এগিয়ে এলো না। মঞ্জুদা তার সাধ্যমতো যীশুদাদের সহায়তা করল বটে, কিন্তু সে কারণে তার গৃহ অশান্তি তুঙ্গে উঠল। তার বৌ হয়ে উঠল রণরঙ্গিণী।

ধলু বলতে লাগল, হে যা দিন গেছে হেকতা কইয়া বুজানের খ্যামতা মোর নাই। এ্যার মইদ্যে আবার সন্নর মায় পড়লে টাইফয়েডের জ্বরে। হে সোমায় পজ্জন্ত এ রোগের চিকিচ্ছা গেরাম তক্ পোছেনায়। মাস খানেক ভোগার পর মরইয়া বুড়ি পার পাইযা গেলে। এহন সন্নরে দ্যাহে কেডা? হে কী একলা থাকপে?

হেদিন দাহ শ্যাষ করইয়া যীশুদায়েরে কইলাম, সন্নরে তো একলা রাহা ঠিক না। কী করবা? নিরঞ্জনের তো খবর নাই। এট্টা খবর দিলে অয় না? হে কইলে, দেও, তয়, মোতাকাকারে একবার জিগাইয়া লইলে ভাল অয়। যীশুদায় য্যান্ ক্যামন উদাস মারইয়া গেলে। কতা বাত্রা বিশেষ কয় না। মোর বৌ কয়, আপাতক সন্ন মোগো বাড়ি থাউক, পরে ধীরে সুস্থে দ্যাহা যাইবে। সন্নরে জিগাইলে হে খালি কইলে, যা বোজো। য্যান্ হ্যার কোনো মতামত নাই। শ্যাওলার ল্যাহার ভাসইয়া যাওনই সার। যেহানে যাইয়া ঠেহে।

মোতাকাকার কাছে যীশুদা যায়নি, গিয়েছিল ধলু। হক ছিল সেদিন বাড়িতে। তখন আইয়ুব খানের আমল। ধলু বলল, হকের পাট্টিতো খুব জোরদার তহন। মোতাকাকার লগে তহনও হ্যার কোনো ঝগড়া কাজ্জইয়া নাই। মোতাকাকা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। হক বলেছিল, নিরঞ্জনদের চাপ দিয়ে মামলাটা আগে তুলে নেওয়া দরকার। তারপর ইউনিয়ন কাউন্সিলে একটা সালিশি করা সহজ হবে। ধলু বা যীশুদার নিরঞ্জনের কাছে সরাসরি যাওয়া মানে বেমৎলব কথা বাড়ানো। বরং মামলাটা উঠে গেলে, তাকে ডাকিয়ে এনে সালিশি বা বিচার, যা হয়, করা হবে। তবে সন্নর মতামত কী সেটাও ভাল করে জেনে নিতে হবে। হকের কথাই সবাই মেনে নিল। কেননা, তার কথায় যুক্তি ছিল। ঠিক হলো, ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত সন্ন বড় রায় মশায়ের বাড়ি থাকবে। ধলুর বাড়ি থাকাটা নিয়ে আবার নানান ক্যাচাল হতে পারে। যীশুদার সেখানে সবসময় আনা গোনা। তার বৌ, -ওরে ব্বাবা!

এতসব ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্যে সন্নর চালচলন কীরকম বা মতিগতিই বা কী,

এই নিয়ে ধলু প্রায় কিছুই বলল না দেখে জিজ্ঞেস করলাম, সন্নর ইচ্ছা অনিচ্ছা, সে কী ভাবছিল বা করছিল, সেসব কিছুই বললি না তো?

কমু কী? দ্যাখ্, যীশুদার লগে হ্যার যে সোম্পক্ক ছোডোকালে আছেলে, হেডার লইগ্যাতো গেরামের মাইনসেরা খালি কথা কচ্‌লাইতেই পারে। তহন যে অবস্তায় সন্ন পড়েছেলে, হে সোমস্যার ব্যাপারে তো ঐ ভাব ভালবাসার কোনো দাম নাই। একথাডা হয়তো যীশুদা বোজতে না। কিন্তু সন্নতো বোজতে। মাইয়া মাইনসে গো এসব এট্টু বেশিই বোজতে অয়। কিন্তু হ্যার মুহে কোনো কতা নাই। হে য্যান্ তহন এট্টা বাড়িঘড়ি বৌখ্‌নার ল্যাহান। যেহানে থোবা হেইহানে থাকপে। নিজের লড়্ইয়া চলনের সাইদ্য নাই, ইচ্ছাও নাই। ঘড়িবাড়ির আবার ইচ্ছা কী? সন্ন বলে নয়, সমাজে মেয়ে মাত্রেরই কম বেশি এইতো পরম্পরা।

কিন্তু তার মনের ইচ্ছা? সে কী যীশুদাকে কখনও ভালবাসত?

এই এট্‌টা ব্যাপার মুই আইজ তামাইত বোজলাম না। যীশুদা যে হ্যার পিরীতে পাগল, একতাতো মোরা বেয়াকেই জানতাম। কিন্তু সন্ন হ্যারে চাইতে কী না, হেকতা কোনোদিনই বোজলাম না। হ্যাযে তো আরো বোজলাম না। তহন তো হ্যার জবানই পেরার বন্দো।

এরকম কেন? সে সময় তো শুনেছিলাম শুধু জাতের অমিলের জন্য তার বাপ মায়ের অমত ছিল বলে সে এগোয়নি। তাছাড়া সে সময় তার ভালমন্দ বিচারের বয়সও হয়নি। কিন্তু—

—কিন্তু কী আবার? ঐ বয়সে ডলাডলি, একটু আধটু চুম্বা চাডা খাইলেই তো হেডারে ভালবাসা কওন যায় না। মোর মনে অয়, যীশুদায়ও ব্যাপারডা বোজতেই পারে নায়। বরাবইর ভাবইয়া আইছে, সন্ন হ্যার। কিন্তু মনে মনে সন্ন জানতে, বয়সে, দ্যাহন দষ্টব্যে যীশুদার লগে হ্যারে একছের মানায় না। হ্যার লইগ্যাই নিরঞ্জনের কতা যহন ওডলে, যীশুদার কতা হ্যার মনেই রইলে না। ভালবাসার মাইনসের লগে ছাড়াছাড়ি অইলে এট্‌টা দীগ্‌গ বিশ্বাসও তো মাইনসে ছাড়ে, সন্নর হে ভাব কী মোরা তহন দেখছিলাম?

একথা বোধহয় ধলু সঠিকই বলেছে। আগেই বলেছি, নিরঞ্জন দেখতে তখন সত্যিই যুবরাজ সদৃশ ছিল। গ্রাম গাঁয়ের মেয়ে, অবস্থার বিপাকে, অভিভাবকের চাপে বা অসহায়তায় বুড়ো বর মেনে নেয় ঠিকই, কিন্তু অন্য সুযোগ অযাচিতভাবে জুটলে ছাড়বে কেন সে? যীশুদা তার নিজের স্বপ্নের জগতে সন্নকে নিয়ে যে ইন্দ্রজাল বুনেছিল, বাস্তবে সন্ন তার ধারে কাছেও ছিল কীনা সন্দেহ। একথা এখন ধলুর তাবৎ কাহিনী শুনে আমার মনে হয়। জন্মাবধি সে দেখেছে এবং জেনেছে যে সে খয়রাতি বাপের মেয়ে। তার বাপ মায়ের উঞ্ছ স্বভাবকে অতিক্রম

করার মতো কোনো শিক্ষা তার ছিলই না। সামান্য একটা দেশজ ফল, বা সাধারণ কিছু মণিহারি সামগ্রীর বিনিময়ে সে যেমন যীশুদাকে ব্লাউজের বোতাম খুলে দিতে পারত, যীশুদার স্থানে অন্য কেউ হলেও তার অন্যথা হতো না। কিন্তু এর অতিরিক্ত দেহ বা মনের ব্যাপারে সে সতর্ক ছিল। মনের বালাইতো তখন তার ছিলই না, যেটা ছিল সেটা শরীর বিষয়ে মেয়েসুলভ স্বাভাবিক ভীতি, কেলেঙ্কারীর। আর মনের ব্যাপারে তার যে কত কার্যকারণ, সে বৃত্তান্ত পুরোটা কেইবা বলতে পারে? আদৌ কেউ তার সামান্যতম কারণেরও কী হদিশ পায় কোনোদিন?

নয়

সাত সতেরো প্যাচাল

সেই কোন্ কিশোর বয়সে এই স্থান ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম, আজ প্রায় প্রৌঢ়ান্তকালে ফিরে এসে এতদিনের সব কথা শুনে, বুঝে, সেদিনের মন মানসিকতার সঙ্গে মিলিয়ে নেব, তা কী কখনো হয়? কত সুঘটনা, দুর্ঘটনা, কত উত্থান পতন-এর মধ্যে ঘটে গিয়েছে, তা এখানে যারা স্থানীয় ধারায় জীবন কাটিয়েছে, তাদের কাছে যেমন সহজতায় আছে, আমার কাছে সেইভাবে কী এখন সেসব উপস্থাপিত হওয়া সম্ভব? ব্যাপারটা সেভাবে যে হয় না, যুক্তিতে তা বুঝতে পারি। কিন্তু হৃদয়, মন তা বোঝে না। সেদিনকার যে অনুভূতিটা এখানে ফেলে রেখে গিয়েছিলাম। আজকের অনুভূতির সঙ্গে তার সরাসরি সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা অবাস্তব, মূর্খামিও। তথাপি মন যেন সেই যুক্তিকে আমলই দিতে চায় না। ধারাবাহিকতাটা যে নেই, থাকা অসম্ভব, এটা মানতেই চায় না সে। সেদিনের নিষ্পাপ কিশোর বন্ধুদের কেউ, পরবর্তীকালে হয়ত একটা খুন করে যাবজ্জীবন সাজা খাটছে। আমি অকস্মাৎ এসে পড়ে তারই ছেলের কাছ থেকে হয়তো শুনছি সেই কাহিনী। সেই ছেলে, যার বাবাকে আমি তারই মতো বয়সে ছেড়ে গিয়েছিলাম, যে তখন ঠিক এই কিশোরটিই আদলে আমার মনের মধ্যে ছিল। আজ এই ব্যাপারটায় আমি কী করে বিশ্বাস করব, বা মেনে নেব! সময় সত্যিই কী ভীষণ ভাবেই না আমাদের প্রবঞ্চনা করে! অনুভূতির এই তারতম্য যুক্তি দিয়ে ভরাট করা সম্ভব হয় না আমার পক্ষে। এইরকম কত সব অসম্ভব ঘটনা যে আমাকে মানসিক ভাবে ওলট পালট করে দেয়, তার ঠিক ঠিক বিন্যাস করাও আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। না চিন্তায় তার থই পাই, না ভাষায় পারি প্রকাশ করতে। শুধু একটা অব্যক্ত বেদনা অবুঝ হৃদযটার পথ বেয়ে চলে। সব চাইতে মুশকিল হচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে, যেসব কিশোরীরা সেদিন মনের মধ্যে আলোড়ন তুলে স্থায়ী হয়েছিল, আজ হয়তো তাদেরই কারুর মেয়ে সেই বয়সটায়। অথচ, আমার মন ঐ সময়টা পেরোয়নি, সে এক বিভ্রাট।

ধলু বড় রাস্তা অবধি আমার সঙ্গে এসেছিল। বলল, সব কথা শ্যাষ অইল না। বাকিডভুক কাইল দোহানে বইয়া হুনিস। রাত্তিরে জব্বারের বাড়ি দ্যাহা অবইশ্য অইবে, তয় তহন তো এসব গল্প অইবে না। হেহানে এহেক জোন এহেক কতা কইবে, হেতে কাম নাই। খাস কতা মুই ছাড়া তো কেউ জানে না, আর জানে হক! হেয়া মোরা মোরাই কমু হুনমু হ্যানে। মোর এহন দোকানের কাম কিছু আছে। কাম সারইয়া রাইতে আইতে আছি। বললাম, রাতে কটায় আমাদের দাওয়াও খাওয়া শেষ হবে তারতো ঠিক নেই। শ্বশুর বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যাব কীনা ভাবছি। নইলে রাতে থাকবই বা কোথায়, আর তারাই বা ভাববে কী? হাজার হোক জামাই বলে কথা।

—না। হেতে কাম নাই। খবর যহন দেও নায়, এহন সয়ন্দাকালে গেলে হেরা ছাড়বে ভাবছ? আটকাইয়া দেবে। বরং কাইল বেয়ানেই হেয়ানে যাইস। আইজ মোর বাড়ি থাকপি। বাহি কতাও হুনবি হ্যানে তহন রাত্তিরে। হেইডাই ভাল হইবে। অবশ্যই হক যদি লইয়া যায় অন্যকথা। হ্যার উপার তো কতা নাই।

জিজ্ঞেস করলাম, যীশুদা বেঁচে আছে তো? আছে কোথায়? হ্যার কথা কেউই কিছু কইলিনাতো। আমি তখন থেকে সেটাই শুধু ভাবছি।

—আছে এ দ্যাশেই। তয় গেরামে থাহে না। বরিশাল শহরে কোথায় য্যান্ আছে। বাসে চাকরি করে, টিকিট চেকার। হের খবর এহানে একমাত্তর হক জানে। মোর লগে যোগাযোগ নাই। সোমায়ই পাই না।

ধলু চলে যায়। তার দোকান খুলতে হবে, আরও কী কাজ আছে। যীশুদা বা সন্নর ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো না। যীশুদা বরিশাল শহরে গেল কেন? এখানে থাকতে কী কিছু অসুবিধে ছিল তার? বাড়িঘর যা ছিল তাতে দিব্য থাকতে পারত সে, যেমন মঞ্জুদা আছে। আছে আরও অনেকে। তার মানে যীশুদার সঙ্গে দেখা হবার উপায় নেই? মনটা বড় দমে গেল। দেখা যাক হক কী বলে।

ধলু চলে যেতে খেয়াল হলো জব্বার আমাকে ধলুর দোকানেই অপেক্ষা করতে বলেছিল-তো। সেখান থেকেই সে আমাকে নিয়ে তার বাড়ি যাবে। কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। আসলে সকাল থেকে ঘটনার আধিক্যে সবার সঙ্গে সাক্ষাতের উত্তেজনায় এবং ধলুর কাহিনীতে এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে, মাথার মধ্যে নানা চিন্তা আর স্মৃতি আনন্দ আর বিষাদ একসঙ্গে তোলপাড় লাগিয়ে দিয়েছিল। এখন জব্বারের বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েও ফিরে গেলাম ধলুর কাছে। ওর সঙ্গে দোকানে গিয়েই বসি, আর বাকি কাহিনীটাও শুনি, যতক্ষণ জব্বার না আসে।

বেলা পড়ে আসছে। ছেলেবেলায় যখন এখানে এইসব বন্ধু বান্ধবেরা ছিল আমার খেলা, গল্পের সাথী আর সহপাঠী, তখন এইরকম বিকেলগুলো কাটত সামনের খালের সুদীর্ঘ ঐ ব্রিজটার ওপর। ব্রিজটা তখন ছিল কাঠের। স্থানীয় জমিদার বাবুদের কীর্তি। যে পথে সকালে আমি এসেছি। অনেক সুখ দুঃখের স্মৃতি এই ব্রিজ এবং রাস্তাটির যেন সর্বাঙ্গে! বাল্যস্মৃতি কখনোই ভোলে না মানুষ। আমি তো ভুলতে চাইও না।

ধলু বেরিয়ে আসছিল দোকানের উদ্দেশ্যে। আমাকে ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করে, ফিরইয়া আইলি যে, জব্বারইয়ার বাড়ি চোখে পরেনায়, না? নাকি চেনথে পারনায়।

না, চিনতে পারব না কেন? জব্বারের তোর দোকানে এসে আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা। সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম। চল্, তোর দোকানেই বসি। ভাবলাম, ওর বাড়িতে যাব, যদি ও না ফিরে থাকে, কেউই তো চিনবে না আমাকে। ওর বৌর লগেতো আলাপ নাই।

ভালই করছ। হেয়া ছাড়া ওরা আগের বাড়িতে এহন আর থাকে না।

কেন? কোথায় থাকে তাহলে?

ওতো অনেককাল অইল আদোকাডিতে ঘর উডাইয়া আলাদা অইয়া গেছে। পুরান বাড়িতে জাগা অয়না, হ্যার লইগ্যা ভাইগো লগে কাজইয়া। পবন কম্মকারেরে মনে আছে? হে যহন বাড়িঘর বেচ্ইয়া হিন্দুস্থান যায়, তহন জব্বার হ্যার বাড়ি, জমি বেয়াক কিন্ইয়া ঐ হানে থাকতে শুরু করে। আর অর বৌরে তুই চেনো। কিন্তু হেডা এহন কমুনা, দ্যাহা অইলে বেশ মজা অইবে হ্যানে।

আচ্ছা, কিন্তু পবনকে মনে আছে। কিন্তু তার বাড়িটা কোথায় ছিল, জানি না। ঐ সময় কোনোদিন ওদের বাড়ি গিয়েছি কিনা মনে নেই। জানতাম ওর বাড়ি দক্ষিণ পিপইল্তা। 'ঐ যে, যে খুব ভাল গোল কীপার ছিল। তাইতো?'

হ। ও বিয়া করছেলে আদোকাডির উমেশ কামারের মাইয়ারে। হ্যারা যহন হিন্দুস্থান যায়, বাড়িঘর মাইয়া জামাইরে লেইখ্যা দিয়া যায়। হেই বাড়িডা নিরঞ্জন বাগীশের নয়া গেরস্থালির লগালাগি। তোর মোন্ লয় হে বাড়িডার কতা মনে নাই। আসলে, বাড়িডা এত গাছ গাছড়ার আড়ালে যে রাস্তা দিয়া পেরার দ্যাহনই যায় না।

ভুলে গিয়েছিলাম। এবার মনে পড়েছে। ঐ নিরঞ্জনের বিয়ের দিনই বোধহয় উমেশ কর্মকারের বাড়িতে গিয়েছিলাম। উঃ সে কতকাল আগের কথা। বলত? তাহলে জব্বার এখন ওই বাড়িতে থাকে?

হ। কিন্তু তুই এতক্ষুণ তো ঠিকঠাক কতাবাত্রা কইতে আছিলি, এহন আবার কইলকাতার লজ্জে কতা কইতে আছো ক্যান?

বদ অইভ্যাস অইয়া গ্যাছে, ওদেশে থাইক্যা। পরে ঠিক অইয়া যাইবে হ্যানে।

দোকানে এসে ধলু ঝাঁপ্‌টাপ্ খুলে প্রথমে চা অর্ডার করল। হঠাৎ দেখি হক আসছে। ধলু দু-কাপের বদলে তিন কাপের অর্ডার দিল।

হক এসে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, বাড়ি গেছিলাম। বেয়াকই শোনলাম। তয়, যে ডুক্ শোনলাম, আন্দাজ করলাম হ্যার চাইতে অনেক বেশি। মোর খুবই আপশোস্ অইতাছে। তোর লগে গেলেই ভাল অইতো। আব্বুজানে অসুস্থ অইয়া পড়ছে। হাই প্রেসারের রোগী তো। তয় এট্টা কামের কাম অইছে, হ্যার লইগ্যা তোর খুব সুখ্যাত্ করলেন আব্বু, মুইও করি।

কিন্তু আমার খুবই খারাপ লাগছে। কাকা এই বয়সে বড় দুঃখ পাচ্ছেন। এটাতো তাঁর পাওনা ছিল না।

হে কারণে দায়ী মুইই, একতা স্বীকার যামু। শওকত আর মুই একলগে পেরায় একই রাজনীতি করতাম তো। তুইতো জান্‌তিই, মুই কলেজে ঢোকার পর থিহাই মুসলিম লীগের সাপোর্টার আছেলাম। তয়, ১৯৫৪ সালের পর থিকা তো মুসলিম লিগ কইতে তেমন কিছু আছেলে না। নেতারা বেয়াকেই হেবারের ইলেকশনে হারইয়া ভুত। আব্বাজানে, হেনার দোস্তেরা বেয়াকেই একছের পাকিস্তান আন্দোলনের সোমায় থিকা লিগের মেম্বর। তয়, হেনারা আছেলেন উদারপন্থি। হেই পরম্পরায় মুই এই লাইনে। চেষ্টা, যদি লিগের দিন ফেরে। শওকত আস্তে আস্তে জামাতিগো কট্টর সাপোর্টার অইয়া গ্যালে। এহন তো জ্বিহাদি, গোপনে সন্ত্রাসীগো মদত দে আর টাহা কামায়।

—তুই এহন কী?

—হেডা কওন বড় শক্ত। মাইনসে জানে মুই মুসলিম লিগ করি। আসলে এহনকার মুসলিম লিগরে মুই য্যান্ ঠিক চেনতে পারি না। মোরা পাকিস্তান চাইছেলাম, পাইছেলামও। মোসলেম সোমাজের উন্নতি, শিক্ষা, দীক্ষা, তহজিব তমুদ্দুন, মোরা ইস্‌লামি কায়দায় চাইছেলাম। ফল কী অইছো দ্যাখথেই পাইতে আছ। তয়, তুই এ্যাদ্দিন পর আইছ, তোর ধারে মিথ্যা কমুনা, সব দেইখ্যা শুনইয়া মোর আইজকাইল মনে অয়, মোরা হিন্দু মোছলমান বেয়াকেই আসলে বলদের 'গু'। মোরা পিরকিতই নীচা মনের মানুষ। মানুষ নামের যোইগ্য না মোরা। রাজনীতি মুই আর করি না। খালি অস্তিত্ব বাচানোর লুইগ্যা যেডুক না করলে নয়, হেই ডুকই করি।

রাজনীতির কথা বাদ দে। কাকাকে ডাক্তার দেখিয়েছিস?

হীরালাল কাকারে বোলাইছেলাম। হেইতো এহানে ডাক্তার, আসলেতো কম্পাউন্ডার। কী আর করা। আর যোগেন ডাক্তার আছেলে, হেতো মরছে। আসোবিদা

বোজলে সদরে নিয়া বড় ডাক্তার দ্যাহামু হ্যানে। আসলে হঠাৎ রাইগ্যা গ্যাছে সাঙ্ঘাতিক, প্রেসার একছের চড়্চড়্ করইয়া উড়্ইয়া গ্যাছে। আর ওডোনের কতাওতো।

সর্বনাশ, স্ট্রোক ফোক না হয়ে যায়। আজই নিয়ে গেলে ভাল হতো না?

না, কাকায় বইয়া আছে পাশে। প্রেসার কমার ঔষধও দিছে। এহন এটটু ভালর দিকে।

কী একটা 'কামের কাম অইছে' না কী কইলি?

হ। অবস্থা দেইখ্যা শওকত মেঞা লম্বা দিছে। মুই যহন দ্যাখ্লাম হে যাওয়ার উদ্যোগ করতাছে, কইলাম, তোমার লইগ্যাই আব্বুজানের লগে মোর মোন কষাকষি। হ্যার উপার এ্যদ্দিন বাদে মোর দোস্তো আইছে, হ্যারে তুমি এ বাড়িতে নাশতাডা পইজ্জণ্ড করতে দিলা না? আইজ থিহা তোমার লগে মোর আর কোনো খাতির বেরাদরি থাকলে না। তুমি দামাদ মানুষ, শ্বশুর বাড়িতে হক মত বেয়াক অবশ্য পাবা। তয় মাসের পর মাস ঘাড়ে চাপইয়া থাকা চলবে না। হেলেনের হক আছে হে থাকপে। এ বাড়িতে মাতব্বরি করার রাইট তোমারে কেউ দে নায়।

কিছু বলল না?

না। মুই আরও কইলাম, হেলেন এহন যাইবে না। তুমিও শিগ্গীর এদিকে না আইলেই ভাল। আর পরিষ্কার শুন্ইয়া লও, ভবিষ্যতে যুদি মোর বা মোর মা বাপের সামনে হেলেনের গায় হাত উডাও। ঐ হাত কৈলোম মুই কাড্ইয়াই ফালামু। ঠুন্ডা করইয়া দিমু।

পরে যদি হেলেনকে না নেয় আর?

হেলেনের পোলারা এহন ডাঙোর, রোজ-গারইয়া। বাপের লগে সম্পক্কো পেরায় নাই কইলেই চলে। ছুডি ছাডায় দ্যাশে আইলে ওডে হ্যারগো মামুর বাসায়, মানে সদরে মোর বাসায়, না অইলে নানার ধারে এই হানে। বাপের 'নেছারাবাদি' চাইল্ হ্যারা না পছন্দ করে, না হ্যার পয়সার খাইস মেডায়। হেই এটটটা মস্তো সুবিদা। হেলেনেরে যুদি না নে, মোগো কোনো আফত্য নাই। বরং মোরা বাচ্ইয়া যাই। হেয়া ছাড়া, পোলারা যাই করুক, মোরতো এটটা মাত্তর বুইন, হ্যার হকে হে বাপের বাড়িতে থাকপে উড়্নি উড়াইয়া। দরকার বোজলে ও-ই হ্যারে তালাক দেবে হ্যানে। মোগো এছলামে হে সুবিদাডা আছে। অবশ্যই ব্যাডাগো মতো হেডা সোজা না।

সমাজে বদনাম?

না, হে ক্ষেত্রে বদনাম শওকত নেছারাবাদির। দশে কইবে, ঐ ব্যাডার বিবি অরে তালাক দেছে, ব্যাপারডা বোজজো?

ব্যাপারটা বুঝেছিলাম। কারুর স্ত্রী কাউকে তালাক দিলে, সাধারণ জনেরা প্রথমেই ধরে নেয় লোকটা হয় না-মরদ, নয় জেনা-কারি বে-দ্বীন। স্ত্রীকে প্রহার করার ব্যাপারটা, শয্যায় অনুমতি না দেওয়াটা কম বেশি হাদিস-সম্মত। সুতরাং সেসব নিয়ে তালাক কোনো স্ত্রী যদি দিয়ে চায় তার ঝঞ্ঝাট অনেক। প্রচুর তথ্য প্রমাণের দরকার হয় তখন। এক্ষেত্রে হেলেন যদি তালাক দেয়, শওকতকে কোনোমতেই না-মরদ অজুহাতে দেওয়া যাবে না। কারণ তাদের ডাঙর দুইটি পুত্র আছে। 'স্বামী না-মরদ'। সাদির দুএক বছরের মধ্যেই সাব্যস্ত হওয়া দরকার। ডাক্তারি পরীক্ষাও দরকার। একমাত্র শওকতকে বে-দ্বীন, জেনাকারি ইত্যাদি প্রমাণ করতে পারলেই তা সম্ভব। আরো হয়ত উপায় আছে। কিন্তু আমি পুরোটা জানি না। তবে শওকত যে পরিমাণে শরিয়তপন্থি বলে খ্যাত এবং নেছারাবাদের পীর সাহেবের অনুগ্রহ ভাজন, তাতে তাকে বে-দ্বীন বা জেনাকারি হিসাবে প্রতিপন্ন করা কতদূর সম্ভব, হককে জিজ্ঞেস করলাম। হক বলল, হেয়া দ্যাহা যাইবে। কতাডাতো মিথ্যা না। আর কেউ না জানুক। মোর ধারে পেরমান আছে ম্যালা। অর সঙ্গী সাথীরাই মোরে খবরা খবর দে। তুই মানবি কিনা জানি না, তয়, হুনইয়া রাখ, য্যারা কট্টরবাদি হ্যারগো ব্যক্তিগত চরিত্রের ব্যাফারে অনেকের থিকাই বেশি হুঁস্ইয়ার থাকতে অয়। নাইলে দল চলে না। হ্যারা আকাম কুকাম দলের মানুষ দিয়া করায়, নিজেরা করে না। হেহানে হ্যারগো বাইদ্য অইয়াই ছাফ দিল্ থাকতে অয়। খারাপ কামের পেরমান হ্যারা রাহে না। কিন্তু শওকত মেঞার লোভ বড় সাঙ্ঘাতিক, আর হেযার পেরমান মোর মজুদ। হেলেনও হ্যার উপার বিরক্ত, নারাজ একছের দিল থিহাই। আর হ্যার পয়সার খাইস্তো হেলেনই মিডায বেশি, আশা, যদি হেথে কিছু শান্তি অয়। হেলেন পয়সা না দিলে তো হালায় খয়রাত করবে। খ্যামতা তো কিছু নাই রোজগার করনের। টাউটগিরিতে কয়দিন চলে? সন্ত্রাসীদলের পয়সা হুনছি পায়, তয়, হেডাতো কাম মোতাবেক।

হকের কথাবার্তা শুনে, বা ধলুর কাছে সন্নর কাহিনী যতটুকু এখনও পর্যন্ত শুনেছি, আমার কীরকম যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমার শৈশব, কৈশোরের গ্রামীণ পরিচিত মানুষগুলোর জীবনে এত জটিলতা? তখনকার দিনেও কী ব্যাপারগুলো এমনই ছিল? সম্ভবত ছিলই। ছোট ছিলাম বলে, তখন জগতটাকে তার জটিলতার আবর্তে দেখার সুযোগ হয়নি বলে, স্মৃতি তার কিছু বহন করছে না। শুধু সুখকর স্মৃতিই, তার প্রাকৃতিক এবং স্বপ্নিল মনুষ্য আর নিসর্গ পরিমণ্ডল নিয়ে মনের মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। গভীর আত্মস্থ মুহূর্তে মনের অতলে যেন একটা সুন্দর দিঘীর ছবি জেগে ওঠে। গাঢ়নীল

রঙের তার জলের মধ্যে ছোট বড়ো রঙিন শালুক ফুলগুলো যেন যেসব মানুষদের কথা বলছি, তাদের মুখ এবং সেগুলো যে কতো স্বপ্নিল, তা আর বর্ণনায় আনতে পারি না। এখন ফিরে দেখার লগ্নে, যতটা বিস্মিত, বিষণ্ণ আমি হচ্ছি, হক বা ধলু ততটা হচ্ছে না। কারণ তারা ধীরে ধীরে অভ্যাসে রপ্ত করেছে ব্যাপারটা। আমার অস্তিত্বে একটা সময়ে 'আমি যে এখানকার কেউ না' এই বোধটা কোনো না কোনো ভাবে আমাকে ওদের কাছ থেকে যে বিচ্ছিন্ন করেছে, সেটা মানতে হবেই। আর আমার সব সংকটই ঐ ব্যাপারটা কেন্দ্র করে। এই সমস্যাটা ওদের নেই। 'আমি এখানকাব কেউ নই' আর এখন,—এই বোধটা ওদের মধ্যে ক্রিয়াশীল যে নয়, সেটা আমার একটা পরম স্বস্তি। পরে একসময় জব্বারও আমাকে প্রসঙ্গত বলেছিল, তোগো তো এহানে ভাঙ্গা অতবড় বাড়িডা, আর বাড়ির চৌহদ্দিতে অত জমিজাগা আছে, পরে খায়। এহানে কিছু খরচা পাতি করইয়া, দুই কোডার এটটা ছোডমতন থাহনের জাগা করলেই তো পারো। ক্যাওর কোনো আপত্তি করার কিছু নাই। যহন এ দ্যাশে আবি হেহানে থাকপি। মনে শান্তি পাবি এ্যাটট্যা, কী, না বাড়িতে আইছ। ও জানে না, তা আর হয়না। রাষ্ট্রীয় বিধিতো নেই তেমন। তবু ঐ যে মাটি টুকুর কথা বললো, তা প্রাণে বুড়ো আরাম দেয়। কথাটা খুলেই বলি।

কথাটা ও একেবারেই আবেগের বশে বলেছিল। বাস্তবে তা যে হতে পারে না ওর জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পুবে যেসব মুসলমান পরিবার গিয়ে সম্পত্তির মালিক হয়েছে, তা যেভাবেই হোক, তারা এপার ওপার দুপারেরই বিষয়ের মালিক থাকতে পারে, আইনগত সমস্যা নেই। কিন্তু যেসব হিন্দু ওদেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের অন্যত্র চলে এসেছে, তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, যা বিক্রি করা হয়নি, পাকিস্তানি আমলে তা ছিল শত্রুর সম্পত্তি আখ্যাযুক্ত, আর বাংলাদেশি জমানায় তা হয়েছে অর্পিত সম্পত্তি। কে যে কার কাছে অর্পণ করেছে, কে জানে? এর পিছনে রাষ্ট্রীয় যুক্তি যাই থাকুক তাতে ক্ষুদ্র, মাঝারি পরিবারগুলোর মানসিকতায় মুসলমান বিদ্বেষ বেড়েছে বই কমেনি। তবে ব্যাপারটা অতি জটিল। নানান দিকও রয়েছে এর। এবং এর জন্য কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রকে সরাসরি দায়ী করা যায় কিনা জানি না। তাতে শুধু কথার পাহাড় জড়ো হয় এবং পারস্পরিক তিক্ততা বাড়ে। তবে একটা প্রশ্ন করাই যায়— পাকিস্তানি আমলের শত্রুর সম্পত্তির ধারণাটার বিষয়ে যদি কেউ জানতে চায় বা চাইত, শত্রুটা কে? উত্তরে অবশ্যই হিন্দুদের কথা বলতে হয়। আশ্চর্য, একটা দেশ বা রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুরা সে দেশের শত্রু। আর অর্পিত সম্পত্তির মানেটাটাও কে কীভাবে তার সম্পত্তি অর্পণ করেছে? বা, কেন করেছে, এ প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষায় থাকেই।

কথাটা বলেছিলাম আমার অঞ্চলের বন্ধুদের মানসিকতা এবং আবেগের প্রসঙ্গে। আমি যেমন "আমি এখানে কেউ না", এরকম একটা বিচ্ছিন্নতা নিজেও অনেকটা তৈরি করেছি, ওরা সে রকম মানসিকতা তৈরিও করেনি এবং ভাবছেও না দেখে আমার তৃপ্তি হলো। হক বা ধলু যদি ওরকম ভাবত, তাহলে কী অতসব কথার পসরা আমার কাছে উন্মুক্ত করতে পারত? সুতরাং এ সংকটটা আমার বা আমার মতো জনেদের অর্জিত সংকট অনেকটাই। তবু যে একটা চোরা স্রোতে আমরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেটা কম মানসিক তৃপ্তির ব্যাপার নয়। বিচ্ছিন্নতো হইনি। কিন্তু হেলেনের কথা, মোতাকাকার কথা, তাদের পরিবারের বর্তমান অশান্তির কথা—এইসব ভেবে, নিজেকে কেমন যেন দায়ী মনে হচ্ছিল। এটাই সম্পৃক্তির লক্ষণ হক ব্যাপারটা আন্দাজ করে বলল, কী অইলে? মুখটা ওরহম ভ্যাদামাছের ল্যাহান ভ্যাট্‌কাইয়া রইছ ক্যান? এ্যদ্দিন পর আইলি, মন খুলইয়া বেয়াকে এটটু পেরাণের কতা কমু, হেযা না, আইয়াই পড়লি এট্‌টা আজব ক্যাচালে। তো আইজকার প্রোগ্রাম কী? হৌর বাড়ি যাবি?

না। সেখানে কাল যাব। আজ রাতে জব্বারের মেয়ের বিয়ের দাওয়াত।

মোরও তো। আর কেডা কেডা যাইবে?

মঞ্জুদা, ধলু এবং আরো যারা সকাল দুপুর এখানে ছিল সবাই, যদিও আমি ছাড়া কারুরই দাওয়াত নেই। সবাই জবরদস্তি যাবে এবং খাবে।

একছের উচিত কাম।— এই ভাব, এই সখ্য এখানে এক অপূর্ব সম্পদ। এটার কথাই বলছিলাম। নিমন্ত্রণ বা দাওয়াত আবার কী? জব্বার আমাদের বাল্যবন্ধু। তার মেয়ের সাদি। নিজেদের ছেলেমেয়ের বিয়ে সাদিতে কেউ আবার আড়ম্বর করে নিমন্ত্রণ করে না কী? যতসব অসভ্য আচার। এ ভাবেই হক ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে। বলে, আরে হালারা মোগো জেবনে না আছে কোনো আউন্‌খা সুখ আল্লাদ, না আছে আনন্দ ফুর্তির কিছু। যুদি এরহম এট্‌টা মওকা জোড়্‌লেই, তো হেয়া ছাড়ে কেডা, অ্যাঁ? ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, দুঃখ কষ্টতো কাছেই, হেইসবের মইদ্যে যদি এটটু সুখের লাগড়, পাই, হেয়া ছাড়ে কোন্ পাডায়?

ধলু এতক্ষণ কোনো কথাবার্তা বলার সুযোগই পায়নি। সে তার খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত ছিল। এখন দোকান ফাঁকা হওয়ায় সে একটা টুল টেনে আমাদের কাছে বসে। বলে, মুইওতো হেওয়াই কই। বন্দু মানুষ, পাচটা ঝামেলায় হয়তো ভুলইয়া গ্যাছে বেয়াকরে খবর করতে। খবরডা যুদি না পাইতাম কথা আছেলে না। যহন পাইছিই, তহন না যাওনডা কী উচিত? জব্বারইয়াও হেডা পছন্দ করবে না।

আমি এইসব কথাবার্তার মধ্যে ভাবছিলাম অন্য কথা। আমাদের হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই একদিন এইসব, বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক

ক্রিয়াকর্মে নিমন্ত্রণে ত্রুটি ধরার ব্যাপারটা কী মারাত্মক স্পর্শকাতর ছিল। প্রথম কথা, যা আগেই বলা হয়েছে যে হিন্দুমুসলমান উভয় জাত একসঙ্গে দাওয়াত খাবে, তাতো কেউ ভাবতেই পারত না। জাত বড় বালাই.তখন। এখনও যে একেবারে নেই তাতো নয়। তবে স্পষ্টতই দেখছি ক্রমশ তা হ্রাস পাচ্ছে। সে কথা ছাড়াও তখনকার দিনে 'নেমন্তন্নায় তিরুডি' ধরার ব্যাপারতো ছিল একটা নিয়মের মতো। গৃহস্থের, বিশেষত, পিতৃ-মাতৃদায় গ্রস্ত বা কন্যাদায় গ্রস্ত মেয়ের বাপ যদি আমন্ত্রণকারী হতো, তবে তাদের লাঞ্ছনা তো রীতিমত নিমন্ত্রণ রক্ষাকারীদের একটা বাড়তি উল্লাসের মতই ঘটত। সারা বচ্ছরকাল যে সমাজ সামাজিকতার নামগন্ধও টের পাওয়া যেত না, এইসব সময়ে তা যেন ভীষণভাবে অস্তিত্ববান হয়ে উঠে আয়োজনকারী হতভাগ্যদের নাকের জলে, চোখের জলে, অপমানে নির্যাতনে যেন মাটিতে মিশিয়ে দিত। কী? না, অমুকেরে নেমন্তন্না দেওয়া অইলে অথচ তমুকরে দে নায়। সুতরাং ওহানে যামুওনা, খামুও না।' নিজেতো খাবেই না, অন্যরা যাতে না খায় তার জন্য ঘোট পাকানো। তবে শেষ পর্যন্ত না খাওয়ার প্রতিজ্ঞাটা যে ধনুর্ভঙ্গ পণ হিসাবে থাকত, তা নয়। শুধু নিমন্ত্রণ কর্তাকে হেনস্থা করাটাই মুখ্য। এর মাধ্যমে কী উদ্দেশ্য যে সাধিত হতো, তা ঈশ্বরই জানেন। তবে ঐ যুগে, ব্যাপারটা আমাদের ছোটদের কাছে ব্যাপক দুশ্চিন্তা আর মনোকষ্টের কারণ হতো, পাছে ভোজটা হাতছাড়া হয়। এটা ওখানে সংখ্যালঘুদের মধ্যেই ব্যাপক ভাবে দেখেছি। মুসলমান সমাজেও এর প্রকোপ নেহাৎ কম নেই, তবে তা একটু ভিন্ন ধরনের। হককে বলতে, সে বলল, তোরা হয়তো কী ভাবতে কী ভাববি, কবি, হালার শ্যাহেগো কাণ্ড। মোর বৌ নাছিফাতো এহনো কতা হোনায়। মোরগো সাদির সোময়ই এমন এট্টা কাণ্ড ঘট্ছেলে যে. এহনও হৌর বাড়ি গ্যালে ঠাট্টা বুট্‌কুড়ি হোন্‌তে হোনতে শরমে মরইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। আসলে তহন বয়সও আছেলে কোম, আর গোস্‌সাও আছেলে হোগা ভরা। তয়, হোন কেস্‌সাডা হোনাই: ধলউয়া, জব্বারইয়ার বাড়ি দাওয়াত খাইতে যাওনের তো এহনো ম্যালা দেরি। বাকি বেয়াকে কী মোগো লগে যাইবে, না যে য্যার মত? হেয়া যা হউক, তুই ঘোত্‌নারে কছেন। মোগো কিছু চা-পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করুক। খাইতে খাইতে মোর সাদির কেস্‌সাডা জুইত করইয়া কইয়া ফালাই। আইজ হারাদিন বড তক্‌লিফ গ্যাছে মোর, ম্যাজাকটা একছের চুকা অইয়া গ্যাছে। এট্টু রসের কতা কইয়া ম্যাজাকটা হাতলাইয়া লই। আর কথারওতো শেষ নেই।

যীশুদা-সন্নর ব্যাপারটা মাথায় ভারী হয়ে চেপে ছিল। আমরাও একটু হালকা হতে চাইলাম। ভেবেছিলাম ওদের কথাই শুনব, জানবো, কিন্তু তার দেখছি এখনও বিলম্ব আছে। আর কথারওতো শেষ নেই।

দশ

মিঞা করবেন বিয়া তো এতো কাজইয়া কিয়া

হকের বিয়ের সময়কার এই খণ্ড কাহিনীর উপস্থাপনাটি এই আলেখ্যে কেন আনছি সে বিষয়ে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি। যদিও আলেখ্যটি শুরু করেছিলাম আমার কিশোরকালীন সময়ের একটি সাধারণ প্রেম কাহিনী এবং তার নায়ক-নায়িকার পরিণতির কথা নিয়ে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে একদা যাদের পাতার ঘর বাঁশের খুঁটিতে বসবাসকারী অবস্থায় দেখে এসেছিলাম তাদের এখন খবর কী? তাদের সমাজ সামাজিকতার অবস্থা কী সেই সময়ের মত সহজ সরল আছে? না, সেসব আরও জটিল, অসহনীয় এবং পশ্চাদ্গামী হয়েছে। আরও একটা কথা এই যে কিশোর বয়সে এরা ছিল মূলত আমার হয় সহপাঠী, নতুবা খেলার সাথী। কী হিন্দু, কী মুসলমান, এখন যারা এইসব গ্রামাঞ্চলে আছে, তাদের সামাজিক ভাবে জানবার সুযোগ বা উদ্যোগ কোনোটাইতো তখন ছিল না। এখন পরিণত বয়সে যদি সেই সুযোগ ঘটল, তবে দেখিই না একটু খোঁজ খবর করে। সুযোগটা জব্বারের মেয়ের বিয়ের দাওয়াতে এখানে জমায়েত হওয়ার জন্যই সম্ভব হল।

চা, টোস্ট, সিগারেট সব-এলো। দেখতে দেখতে মঞ্জুদা এবং দলবল সবাই ধলুর দোকানে এসে জড়ো হল, যেন এরকমই কথা ছিল। এদের সবাইকে আমি চিনিও না। চেনার কথাও নয়। এদের জন্ম হয়েছে আমাদের দেশ ত্যাগের পর। এরা অবশ্য আমাকে সবাইই চেনে। আমাকে অমুক বাড়ির পোলা, তমুক ইস্কুলের এক সময়ের ছাত্র এবং পাশের গ্রামের অমুক বাড়ির জামাই হিসাবে। হক, ধলু, মঞ্জুদা, জব্বার তারা আমার এক সময়ের এবং অদ্যাবধি বন্ধু। সময় এখন সন্ধ্যা। বাজার এলাকায় এসময়ে যাঁরা আসেন, সবার উদ্দেশ্যেই গল্পগুজব করা। সবাই প্রায় কাছাকাছি এলাকার। গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ সায়রে একমাত্র ঢেউয়ের দোল।

ধলুর দোকানটি ব্রিজ থেকে নেমেই, বাজারের দিকটার ডান হাতে। দোকানের পাশ বরাবর খালটা। সেখানে বেশ খানিকটা জায়গা শান্ বাঁধানো চত্বর এবং সঙ্গে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি। বেশ মনোরম আড্ডার জায়গা। স্থানটি বাজার কমিটিই করেছে। আমাদের দলটি ছাড়া আরও অনেকেই এসেছে এখানে আড্ডা মেলামেশার উদ্দেশ্যে। এরই মধ্যে হক তার অভিনব বিবাহ বিষয়ক গল্পটি শোনালো। সে কাহিনী যেমন মজার, তেমনই খানিক বীভৎসতা সহ রোমহর্ষক।

সে সত্তর সালের কথা। তখনও দেশটা পাকিস্তান। নির্বাচন হব হব করছে। তবে কোনো গোলমাল নেই। শুধু আওয়ামি লিগ পার্টির বেশ রম্‌রমা অবস্থা। ছেলে ছোক্‌রারা নাকি তখন থেকেই সবে পরস্পরকে 'জয় বাংলা' বলে অভিবাদন জানাতে শুরু করেছে। যারা মুসলিম লিগ পন্থী এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের গুণগ্রাহী, তারাই শুধু ব্যাপারটাতে বিরক্তি বোধ করছে। সে বছরই হকের বিয়ে। মেয়ের বাড়ি দক্ষিণের গলাচিপা গ্রামে, পাথর ঘাটার কাছাকাছি। বর বা দুলা, আমাদের হক সাহেব এবং বরযাত্রীরা সবাই যাবে লঞ্চে করে তাদের বন্দর শহরের বাসা থেকে। দূরত্ব অনেকখানি। গোটা বিশখালি নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হবে। মোতাকাকার সম্বন্ধি অর্থাৎ হকের মামু মুরুব্বি হিসাবে যাচ্ছেন। মোতাকাকা যাবেন না। তাঁর অন্য কী সব গুরুতর কাজ আছে। হক বলল, 'কাম না ছাতা। আব্বুজানে তহন ভোডের কামে মত্ত। লিগের কাম করছে হারা জীবন কিন্তু হেই লিগ তহন টিম্‌টিম্ করইয়া জ্বলে। চুয়ান্নর ভোডেই লিগ শ্যাষ অইয়া গেছেলে। মোরাতো বাপ ব্যাডা মুসলিম লিগের সাপোর্টার। লিগের তহন যা অবস্থা হেথে মোর বিয়া ওডলে মাথায়। উদিগে নছিফা, মানে য্যারে বিয়া করমু, হ্যারগো গুষ্টির ব্যাকে অইলে আওয়ামি লিগ। সন, সত্তের সালের ভোড। অবস্থা যা বোজতে আছিলাম, হেতে এট্টা 'সিট'ও যে মোগো দলের কপালে জোডবে হেরহম কোনো আশাই নাই। বাপে কইলে, এই অবস্তায় আওয়ামি লিগের বাড়ি পোলার বিয়া দিতে যামু মুই?

আমি জানতে চাইলাম তয় বিয়াডা ওহানে ঠিক অইলে ক্যামনে?

বাপে তো ঠিক করে নায়? করছে মামুজানে। হেনায় উপারে উপারে লিগ, তলে আওয়ামি লিগ। হেকারণেই যোগাযোগ। কইলেন যে, ব্যাপারডা ভাবইয়া চিন্তইয়াই ঠিক করছি, দুলাভাই, অমত করইয়েন না। দিন কাল খারাপ আইতে আছে। লাইন খোলা রাহা ভাল। 'স্যানে' হয়তো কবি, এয়াতো ধান্দাবাজি। বাজানেও কইলে হেই কতা। কইলে যে, হে মোনাফেকি করতে পারবে না। পেরথম থিহা হেনায় লিগ পন্থি। শ্যাষতক্ হেয়ার থিহা লড়ন নাই। মোর কতা অইলে, ভুল হউক শুদ্ধ হউক, জন্ম থিকা মোরা লিগের লগে আছেলাম, হেই আদর্শে বিশ্বাসী। এহন বাতাস ঘুরইয়া যাইতেছে বল্‌ইয়া কী, মোনাফেকি করমু?

আমার এইসব রাজনৈতিক খুঁটিনাটিতে মন লাগছিল না। বললাম, 'ওসব কথা থো ফ্যালাইয়া, যা কইথে আছিলি হেই বিয়ার কেস্‌সাড়া ক'।

—হেইয়ার লইগ্যাই তো এগুলা কওন দরকার। জানি, তোরা, বিশেষ করইয়া হিন্দুরা, লিগেরে পছন্দ করতি না, এহনও দুই চোক্ষে দ্যাখথে পার না। আওয়ামি লিগের যে রম্‌রমা হেয়ার কারণ তো আসলে হেইডাই। যাউক হেকতা। মোরগো অবস্তা তহন সাইদ্যের খারাপ। এমনে তো বেয়াকেই কই, যে মত ভিন্ন অইলেই কী ব্যক্তিগত সম্পক্ক খারাপ অয়? কিন্তু ওয়া মুহের কথা। মতের বিরোধ মানে কী, হেয়া এ দ্যাশের মাইন্‌সে জান দিয়া বোজছে। এহনও বোজতে আছে। তোরা হিন্দুরা তো অবইশ্য কবি, ওয়া শ্যাহাই চাইল। তো মুই কই, ওডাই রাজনীতির চাইল, এদ্যাশে ও দ্যাশে সবখানেই এক।

মোতাকাকা বলেছিলেন, তিনি বরকর্তা বা মুরুব্বি হিসাবে যাবেন না। হকের 'মামু', হাস্‌মত মল্লিক যাবেন। কারণ, মোতাকাকা এমনিতে সজ্জন, উদার প্রকৃতির মানুষ হলেও, আওয়ামি লিগের লোকদের একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। কারণ, তাঁর মতে, এরা পাকিস্তান বিরোধী। ভারতের দালাল। তাঁর কথা হল, পাকিস্তান মুসলমানদের 'খাবের' ফসল। যে যাই সমালোচনা করুক, পাকিস্তান 'হাসেল' হয়েছিল বলেই না, বাঙালি মুসলমান আজ কিছু লাভবান হয়েছে, একটু সুদিনের মুখ দেখেছে। তবে হ্যাঁ, দেশটা ভাগ হয়ে হিন্দুরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে, এটা তিনি স্বীকার করেন। তাদের ব্যাপক অংশ দেশ ছেড়েছে। এজন্য তাঁর 'আফছোছ' আছে সীমাহীন, ব্যথিতও তিনি এই অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য। কিন্তু সেজন্য শুধু লিগই দায়ী, এমন তিনি মনে করেন না। এর আরও নানান গভীর কারণ আছে। আওয়ামি লিগ কী ওয়াদা করতে পারবে, যে তারা ক্ষমতায় আসলে দেশ থেকে হিন্দুদের উৎখাত তারা বন্ধ করতে পারবে? যা ঘটে গেছে, তাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা কখনোই যাবো না। বরং দেশের চেষ্টা হওয়া উচিত নতুন কোনো উৎপাত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। তা, আওয়ামি লিগের প্রধান নেতাই তো আগরওলা ষড়যন্ত্র মামলার আসল আসামি। তার মানে, তাঁরা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান। মোতাকাকার এই বক্তব্যে বিতর্ক বিস্তর, কিন্তু কথাটা বোধ হয় অন্তঃসার শূন্য নয়, এটা হকের মন্তব্য।

এখন আওয়ামি লিডারের বাড়িতে ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে যদি এইসব কথাবার্তা ওঠে? সেখানে তো সরাসরি দুপক্ষই থাকবে, সুতরাং ব্যাপক 'কাজিয়ার' সম্ভাবনা। এখন ভোটের গরম হাওয়া চলছে। তাই হাসমত্‌ মামুর মতো এদিকে আছে ওদিকেও আছে, এরকম মানুষেরই মাতব্বর হয়ে যাওয়া সমীচিন।

প্রয়োজনে দুপক্ষকেই সামাল দিতে তিনি পারবেন। তাছাড়া মেয়ের মা আবার, হাসমত্ মামুর ফুফাতো বোন এবং খুবই নাকি ব্যক্তিত্ব শালিনী মহিলা। সুতরাং ক্যাচাল সামান্য হলেও 'ক্যাল্লা' দুফাঁক হওয়ার মতো ঘটনা ঘটবে না, এটা আশা করা যায়।

হক বলল, হেসব বেয়াকই ঠিক আছেলে। কিন্তু যে কতায় এই বিয়ার কতাডা ওডলে, অথাৎ, খাওন দাওনের তিরুডি ধরা, মাইয়ার বাপের হেনস্থা, বরযাত্রী গো বাহুত্রাপানা। হেয়াতো মেঞাগো আর হিন্দুগো মোডামুডি একই। খাসইয়ত্ তো বেয়াকেরই সোমান। মোরা খালি মোগো দুই জাইতের মইদ্যে কী কী গুণ এক রহমের, হেইয়া লইয়া মিলমিশের কতা কই, কিন্তু দুই সোমাজের এইসব একই রহমের যে বদ্-বজ্জাতির বেরাদরি হেয়া বিচরায় কেডা? মেঞাগো বিয়ায় দুলার নৌকা বা লঞ্চ ঘাডে লাগলেই যে হৈ হৈ করইয়া চিক্কইর, পাক্কৈর ওডবে হেয়া না। ধর, ঘাডে নাও বা লঞ্চ লাগলে। হেহানে 'দুলাইনের' বাড়ির দুএকজন মানুষ অবশ্যই রাহা থাকপে, য্যারা 'দুলা' গো বেয়াকরে আদাব আরজ, 'আপনেরা ক্যামন আছেন?' 'রাস্তায় কোনো দিকদারি অয়নায় তো?' 'আল্লায় মোগো ভালা রাখছেন' —এইসব খাতিরদারি করইয়া, কইবে, তয় আপনেরা য্যামন আছেন, তেমনই তশরিফ রাহেন। বিশ্রামাদি করেন, মোরা বড় মেঞাগো খবর করি, নাশতা পানি, পান তামুকের ব্যবস্তা দেহি, বলে, হেই যে বাডির দিকে যায়, সহজে আর কারুর দ্যাহা পাওন যায় না। মোর ব্যাফারডাও হেইরহমই অইলে। এইডা অবইশ্য হিন্দুগো মইদ্যে অয়না। বরযাত্রিরা, পাত্তর পক্ষ হেহানে বাপের ঠাহুর, আল্লার ফেরেস্তা। হ্যারগো খাতির কতো!

এইসব ব্যাপার গ্রামাঞ্চলের বিয়ে সাদিতে বরাবরই হয়। ছেলে ছোকড়ারা করে। উদ্দেশ্য কিছু আদায় উশুল করা। তবে বড়দের নজর থাকে যেন বাড়াবাড়ি না হয়। নির্দোষ আমোদ। কিন্তু হকের ব্যাপারটা ঘটেছিল আলাদা। মুসলমানি বিয়েতে লগ্নটগ্নের ব্যাপার তেমন কিছু নেই। কাজি, উকিল, সাক্ষী, দুলা, দুলাইন উপস্থিত থাকলে, বিয়ে বা সরা, যখন খুশি হলেই হলো। সুতরাং কন্যার লগ্নভ্রষ্টা হবার বা লগ্ন বয়ে যাবার সমস্যা নেই। তবে দেরিটেরি যদি কোনো কারণে হয় কার্যগতিকে, তবে বরযাত্রীরা হয় লঞ্চ বা নৌকোয়ই অপেক্ষা করে। নচেৎ যেখানে কনে বাড়ির কর্তারা তাদের থাকার ব্যবস্থা করেন, সেখানেই খাওয়া দাওয়া আপ্যায়নাদি চলতে থাকে।

হকের বেলায় ব্যাপারটা এমন বাড়াবাড়ি হলো যে সেটা বর্ণনা করতে গিয়ে হকের এখনও যেন অস্বস্তি কাটে না। বললো, ঐ যে দুই ব্যাডা মোরগো ঘাডে সবুর করতে কইয়া হেই যে গ্যালে, আর কোনো খবর নাই। নাশতার সোমায়

পার অইলে, নাশতার নামে দ্যাহা নাই। হ্যাযে দলের লোক পাডাইয়া বাজার থিহা নাশতা আন্ইয়া বেয়াকরে খাওয়াই। মামুজানে কইলে, মোনে লয়, কিছু এ্যাটটা ল্যাডা বাজচে এ্যারগো। কিন্তু যাইয়া যে খবর লইবেন, হেয়াতো অইবে না। মোরগো এ্যাটটা সোম্‌মান নাই? য্যাতোই ফুফাতো বুইনের বাড়ি হৌক, এহন তো দুলা পক্ষের মুরুব্বি। নিয়ম মতো খাতিরদারি করইয়া না উডাইলে, যায় কী করইয়া। বাড়িডা লঞ্চের টোঙ থিহা দ্যাহা যায়! দু-একজোন বাড়ির হাতায় হাডাহাডি করে হেয়াও দেহি। কেউ কেউ আবার আঙুল তুলইয়া মোগো লঞ্চটারে দ্যাহায়ও। কিন্তু আয়না কেউই ইদিকে। দুফইরের খাওনডাও খাইতে অইলে বাজার থিকা নিজেগোই আনাইয়া। এই রহম অবস্থা দ্বিতীয় দিনও চললো। বেয়াকে কইতে লাগলে, এয়া কী রহম ছোডোলোকি? অ্যাঁ? এডা যুদি হিন্দুগো বিয়া অইতো তো, 'দিমুনা এ হালার পো হালার বাড়ি পোলার বিয়া' কইয়া লঞ্চ ছাড়ইয়া দেতে হেই কহন? কিন্তু শ্যাহেগো বিয়ায় হেরহম নিয়মও নাই, করইয়া লাভও নাই। কিন্তু এ অবস্থাতো সইহ্যও করণ যায় না।

পরের দিন লঞ্চে হৈ চৈ পড়ে গেল। কারণ দেখা গেল, হবু শ্বশুর বাড়ির চালার উপরে পত্ পত্ করে উড়ছে আওয়ামি লিগের পতাকা। তার মানে, তারা 'কাজইয়া' চায়? তার সঙ্গে আবার শ্লোগান উঠছে, 'নৌকা চিহ্নে ভোট দিন', 'জয় বাংলা'। 'আওয়ামি লিগ জিন্দাবাদ'। পচ্চিমারা নিপাত যাউক। সবাই ধরে নিল, এরা দলগত ভাবেই ঝঞ্ঝাট চায়। বিয়ে সাদির ব্যাপারটা বাহানা। সুতরাং লঞ্চের সবাইও সঙ্গে সঙ্গে তৈরি। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'আল্লাহর হু আকবর', 'মুসলিম লিগ জিন্দাবাদ' ভারতের দালাল আওয়ামি লিগ মুর্দাবাদ ইত্যাদি। হাসনাত্ মামুর অবস্থা খারাপ। তিনি বর কনে উভয়পক্ষের মুরুব্বি। এখন যদি এখানে কোনো হাঙ্গামা ঘটে, তাহলে তাঁর মান ইজ্জৎ পুরোই মাটিতে মিশোবে। তিনি সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। কনের বাড়ির কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা. তারও উপায় ভাবছেন, সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার।

'এইসব দেইখ্যা মোর গ্যালে ম্যাজাক চেত্ইয়া। জান্তাম ও পক্ষের মুরুব্বি দুলাইনের চাচা মেঞা। হ্যার লগে মোর আলাপ আছেলে। আগে মুসলিম লিগেরই কাম কাজ করতে, এহন কী করে জানি না। দুএকজোন বন্দু বান্দবরে যেমন জব্বার রজ্জাক, হ্যারগো ডাক্ইয়া কইলাম, ঐ হালার পো হালারে কায়দা করইয়া যুদি লঞ্চে আনথে পার তো এট্টা উপায় অয়। হে ব্যাডা মানুডা আল্হে এট্টু বল্দা গোছের। এই মোগো জব্বারইয়া, য্যার মাইয়ার বিয়ায় মোরা দাওয়াতে যাইতে আছি, হে কই্লে, মোরে এহানে কেউ চেনে না। এরহম আরও দুএকজোন, য্যারা এহানে অচেনা, হ্যারা কায়দা করইয়া, ভুলাইয়া

ভালাইয়া, চুৎমারানির পোয়রে লইয়া আমু নাহি লঞ্চে? কইলাম, আন্, তয় সাবধানে। কেউ য্যান্ ট্যাড় না পায়। আর লঞ্চে আন্ইয়াই হালার পো হালা রে খুডির লগে বান্ধ্ইয়া ফ্যালাবি। হ্যাযে খবর দিবি মোরে। মুই সারেঙ ব্যাডার রেস্টরুমে থাকমু। খবরডা কৈলোম গোপন। মামু ট্যার পাইলে মুশকিল।

জব্বার নাকি বলেছিল, তোর হাউরি-মাতারিরেও ঐ লগে আনলে খেতি কী? হক নিষেধ করেছিল। 'না, হেতে খেতিও নাই, লাভও নাই। বরং খেতিই বেশি। সাদিডা যুদি শ্যাষতক্ অয়ই, তয় হারাজীবন বিবির গাইল খাইতে অইবে। আব্বায় এহানে থাকলে হয়তো, হ্যার কিছু লাভালাভ হইতে, কিন্তু হেনায় তো আইলেনই না। আর মামুর্তো ফুফাতো বুইন, হেডা এট্টা সোমোস্যা না?

'জব্বারইয়া তো তোরা জানোই আজরাইলের আজরাইল। কিন্তু এইসব ব্যাপারে পেলান পইদ্য পাহা। আবার নিজে যেডা ভাল বোজবে হেডাও হে করবেই। আমাগো শওকত তহনও 'জিহাদি', 'আলহজ্জ', 'নেছারাবাদি'টাদি কিছু অয় নায়। হে কইলে, ঐ আওয়ামি লিগের নিশানের লোম্বা বাশখান যুদি আপনের ভাবি চাচা হৌরের গোয়ায় হান্দাই, হেলে আপনের কোনো আপত্তি আছে?

আছে। যেডুক কইলাম, হেডুক খালি করবা, আউন্খা ফালতু কোনো কতা বা কাম কবাও না, করবাও না। শওকত তহন আওয়ামি লিগার গো পয়লা নম্বরের দুশমন। 'জয়বাংলা' জাক্কের হোন্লেই হ্যার লহু গরম অইয়া যায়। ও হালায় আসলেই মৌলবাদী। স্যানেরাতো মোছলমান বগ্গে মোগো ব্যাক্রেই মৌলবাদি কও। কিন্তু আসলে তো হেডা ঘডনা না। মুই স্বীকার যাই যে মুই নিজেও এক কোসেমের মৌলবাদী। কিন্তু মোর ল্যাহান য্যারা, হ্যারা কহনো হিন্দু কাটতে বা দাঙ্গা করতে যায় না। শওকত্ইয়ারা আলাদা কোসেমের। এ্যারা অইল এক অইন্য জাতেরমানুষ, য্যারা ধম্মের নামে, রাজনীতির নামে, বা মাইনসের ভাল করার নামে শয়তানির চাষ করে। এ্যারা সব দলে, সব ধম্মের মইদ্যেই আছে। এ কতাডুক কইলাম, তোমরা এহানে য্যারা ভাবো যে অমুক দল ভাল। হ্যারা মাইর দাঙ্গা করে না, বা তমুক ধম্ম ভাল, হ্যারগো কোনো জবরদস্তি নাই, হ্যারগো উদ্দেশ্যে। ঠাট্টা করইয়াই কইলাম, কেউ কিছু মনে করইও না, আসলে স্যানেরে এট্টু চেতাইতে চাইতাছি। তয় ও হালায় মোনে লয় চ্যাতপে না। সেয়ানা আছে তো।

জব্বার, শওকত এবং আরও জনা দুই, বাজারে গিয়ে, লোক মারফত খবর দিয়া 'চাচা মিঞাকে' ডাকালো। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। গ্রাম গাঁ জায়গা। নিজেদের আসল পরিচয়াদি না দিয়ে, তারা জানায় যে, তাঁরা পাথরঘাটার মানুষ,

এই বাজারে এসেছিল কিছু ব্যবসার কারণে। এখন ফেরার নৌকো জোগাড় হয়নি বলে অসুবিধেয় পড়েছে। বাজারে শুনেছে যে এ বাড়িতে বিয়ে সাদির ব্যাপার স্যাপার আছে। তাদের নৌকো বা ডিঙি হামেশাই পাথরঘাটা যাতায়াত করছে, যদি তাদের একটু পৌঁছে দেয় তো, বড় মেহেরবানি হয়। চাচা, আগেই বলা হয়েছে একটু সোজা সরল, 'বলদা' মতো মানুষ। জানালেন, তাতে তো অসুবিধে কিছু ছিল না, কিন্তু বরাতরা তাঁদের বিরুদ্ধ পার্টির লোক। তারা সাদি করাতে এসেছে না কাজিয়া করতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আজ তিনদিন হল তারা ঘাটে থানা দিয়ে, লঞ্চ নিয়ে বসে আছে। লঞ্চের মাথায় লিগের নিশান। সেই কারণে এপক্ষও আওয়ামি লিগের নিশান উড়িয়ে দিয়েছে, ফলে কোনো পক্ষই এগোতে সাহস পাচ্ছে না। খুবই অশান্তি। এইসব কথা হতে হতেই, শওকতেরা তিনজন মিলে চাচাকে জাপ্‌টে ধরে সোজা নিয়ে গিয়ে ফেলল লঞ্চে। মুখটা আগেই গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলেছিল, যাতে চীৎকার না পৌঁছোয় কারো কানে। লঞ্চে নিয়ে তাঁকে বেশ করে খুটোর সঙ্গে বেঁধে, হককে তারা জানালো—সাজইয়া ভাই আয়েন, হালার পো হালারে বান্‌ছি।

তাদের চতুর্থ জন, জব্বার, চাচাকে এরা ধরার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে ভিন্ন পথ ধরে চলে গিয়েছিল মেয়ের বাড়ি। কারণ ঝামেলার আসল কারণটা বুঝে সে প্ল্যানটা পাল্টাবার কথা ভাবছিল। কিন্তু শওকতের কল্যাণে তা হলো না। শওকতের ধান্দা ছিল আলাদা। বাড়ির থেকে খানিক এগিয়ে অন্ধকারে একজন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। জব্বারকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করে, কেডা?

মুই, তারপাশা গেরামের থিহা আইছি, নাম জব্বার জোলা। মোগো গেরামের মোতাহার মেঞার মাজইয়া পোলার সাদি হওনের কতা এই বাড়িথে। আইজ তিনদিন অইয়া গেল কোনো খবরাদি নাই। আপনে কেডা? মোরে নি কিছু কইতে পারেন।

মুই মাইয়ার বড় ভাই। খুব ভাল অইছে, আপনে এই সোমায় এ বাড়ি আইলেন। ইদিগে বড় গণ্ডোগোল। কাজইয়া লাগে লাগে পেরায়।

হে কতা পরে হুনমু। আপনে আগে মোরে আপনে গো, বৈঠকখানা ঘরে বান্ধইয়া থোয়েন। হ্যাযে পেলান কইতে আছি।

এডা আপনে কয়েন কী? মেহ্‌মান মানুষ, আপনেরে বান্ধুম? মাইন্‌সে কইবে কী?

ওঃ হোঃ। যা কই, হেইডা আগে করেন। ঔদিগে আপনের চাচারে তো বান্ধ্‌ইয়া থুইছে লঞ্চের খুডায়। দেরি করলে হয়তো কাড়ইয়াই ফালাইবে হ্যানে। তাড়াতাড়ি মোরে বান্ধইয়া, আপনের মায়রে লইয়া যায়েন ওহানে। দুলার

মামুতো সম্পর্কে আপনেরও মামু। নিজেরা এ্যাটটা শান্তিমত সালিশি মীমাংসা করইয়া সাদিডা সারইয়া ফ্যালান। ক্যাচাল বাড়াইয়া লাভ নাই।

হেয়া না অয় মায়রে লইয়া যামু। কিন্তু বান্দা বান্দির দরকারডা কী?

আহা বোজেন না ক্যান্? হ্যারা একজোন বান্ধছে, আপনেরা একজোন বান্ধেন, নাইলে সোমান সোমান অইবে ক্যান্? দুই পক্ষেই সোমান অবস্তা হইলে না সালিশিতে বওন যায়। নাইলে তো খালি চেচামেচি। আর দুইদিকের দুইজোন বান্দা থাকলে, কাড়াকাড়ি। ক্যাওর কিছু কওয়ার থাকপেনা।

কিন্তু চাচারে হ্যারা বান্ধলেই বা ক্যালায়?

আপনেরা হ্যারগো বোলাইছেন সাদি করানের লইগ্যা, আর ঘাড়ে আনইয়া ফ্যালাইয়া রাখছেন। না খাওন দাওনের ব্যবস্তা, না কোনো সোমাচার লওন, বান্ধবে না তয়?

মোরা তো আউগ্‌গাইতেই পারি না লিগের নিশান দেইখ্যা। আইছেন সাদি করতে, হেয়ার কোনো উয্যোগ নাই, উল্ডা লঞ্চের মাথায় লিগের ফেলাগ টানাইয়া মোগো গেরামের মাইন্‌ষে গো দেলেন ডরাইয়া।

হাচাইও? মোরা তো দ্যাখলাম আপনেরা আওয়ামি লিগের পতাকা উড়াইয়া লিগেরে খামার দিতাছেন।

হেয়া তো শ্যাষম্যাষ করতেই অয়। জানেন না এ গেরামের বেয়াক আওয়ামি লিগের সাপোটার? হ্যারগো এ্যাট্টা সোম্মান নাই?

কতা হয়ত্য। কিন্তু মোর মোন লয় মোগো কোনো বলদ পোলাপান লিগের ঝান্ডাডা টানাইছে। মুরুব্বিরা হেয়া দ্যাহেও নায়। কিন্তু হেলেও ক্যাচালডা এহন আপনেগোই সামাল দিতে অইবে। তয় আর মোরে বান্ধইয়া কাম নাই, লয়েন, আপনের আম্মারে লইয়া মোরা যাইয়া মিটমাট করইয়া ফালাই, ব্যাফারডা। তোবা তোবা, দ্যাহেন দেহি কীসে কী অইলে?

অতঃপর যে ব্যাপারটি মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়েছিল, তা নয়। হক জানালো, গোটা ব্যাপারটির জন্য মূলত দায়ী ছিল শওকত। সে প্রকৃতই দুই পক্ষের মধ্যে একটা ব্যাপক গণ্ডোগোল চেয়েছিল।

এগারো

শওকত নেছারাবাদির জ্বিহাদ এবং ষণ্ডবধ বৃত্তান্ত

হকের বিয়ের গল্পটা সে শুরু করেছিল একটা হালকা মেজাজেই। কিন্তু আস্তে আস্তে তার মধ্যে আসতে থাকল নানান জটিল বিষয়। তার মধ্যে শওকতের কেরামতি এবং নানান অভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপের উল্লেখ হককে করতেই হচ্ছিল কাহিনীটা বলার সময়ই হক জানালো যে শওকত কী চরিত্রের মানুষ, তা তার এই সব কীর্তির কথা শুনলেই বোঝা যাবে। প্রথম থেকেই শওকতের মাথায় একটা উদ্দেশ্য কাজ করছিল, যেটা হক ধরতে পারেনি। উদ্দেশ্যটা রাজনীতি সংক্রান্ত। সে বরাবর কট্টরবাদি, জামাতি গোষ্ঠীর অনুগামী। তখনও জামাতিরা লিগেরই দোসর প্রধানত, অন্য দলে তাদের প্রভাব তেমন ছিল না, বা নিজেরাও স্বতন্ত্র দল হিসাবে তেমন প্রতিষ্ঠিত নয়। মুসলিম লিগ চুয়ান্নর নির্বাচনে এবং তারপর থেকে ক্রমশ, দল হিসাবে তাদের প্রতিপত্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলছিল, জামাত তখন উর্ধ্বগামী। সুতরাং সত্তরের নির্বাচনে মুসলিম লিগের মধ্যে তাদেরই প্রতাপ বেশি। সে সব ব্যাপক রাজনীতির কুট্ কচালি। তার মধ্যে যেটুকু উল্লেখ্য, তা হলো, শওকতের আধিপত্য বিস্তারের কুবুদ্ধি-প্রণোদিত কর্মকাণ্ড। হক বলছিল, লঞ্চের মাস্তুলে লিগের ঝাণ্ডা তোলার মতলব বা চাচা হৌরেরে ভুলাইয়া আন্ইয়া বান্ধইয়া থোওয়ার মতলব, এয়ার ব্যাক্ কিছুই হ্যার মাথার থিহাই বাইর অইছে। ঝাণ্ডা উড়ানের ব্যাফারডা হে ক্যারোরডেই কয় নায়। ওডা এ্যাটটা সাইদ্যের খারাপ কাম অইছেলে। কারণ, ঝাণ্ডা দেইখ্যা মাইয়া পক্ষ ভাবছেলে যে মোরা সাদির অজুহাতে ভোডের ক্যানভাস করমু, ঝামেলাও। ওহানে তো শওকতের ল্যাহান মাইনসের অভাব নাই। লিগের সাপোর্টার হেহানেও আছেলে। সুতরাং এই লইয়া বাদ বিসম্বাদ, এমন কী মাইর পিঠ তামাইত্ অইতে পারে। গেরাম অঞ্চলে ভোডের সোমায় তো হেয়া অয়ই। কিন্তু মোরা গেছি সাদি করতে। মাইয়া পক্ষের ব্যাফারডা কিছু গুরুতর না। চান্দা দেওন, না দেওন, আদর আইপ্যায়ন করন না করন, এইসব বাহানায় দুলাপক্ষ,

দুলাইন পক্ষ এরহম করেই। ব্যাফারডা শ্যাষতক, হাসকাব্যে মিডইয়া যায়। কিন্তু শওকতের মনে তো হাসকাব্যের উদ্দেশ্য আছিল না। ও হালায় চাইছিলই এট্টা ক্যাচাল। হক তার মতলব ধরতে পারেনি।

যাহোক জব্বার বিষয়টা বুঝতে পেরেছিল। তার বুদ্ধিবলেই হকের ভাবি শাশুড়ি এবং সম্বন্ধি এসে ব্যাপারটার নিস্পত্তি করে। পতাকা উভয় পক্ষই নামিয়ে নেবে স্থির হয়। কিন্তু শওকত জেদ ধরেছিল, কিছুতেই তাদের পতাকা নামাবে না। হক অনেক কষ্টে ব্যাপারটা সামলে নিয়েছিল। সাদিও যথারীতি সম্পন্ন এবং কবুল হয়েছিল। কিন্তু শওকত আর তার দলের কয়েকজন তাতে খুশি হয়নি। মাঝে মাঝেই তারা মেয়ে পক্ষের দোষ ত্রুটি নিয়ে এবং তার সঙ্গে রাজনীতির ঝাঁজ মিশিয়ে প্ররোচনার সৃষ্টি করছিল। মুশকিল ছিল এই যে, শওকত হকের ভগ্নিপতি। সে পাছে অসম্মানিত বোধ করে এবং তার প্রভাব হেলেনের ওপর পড়ে, এই ভয়ে হককে সংযত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। রাতে সাদির ব্যাপারটা মিটে গেলে যখন ভোজের পর্ব চলছে, তখন দেখা গেল, শওকত আর তার দলবল মহা চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। কী, না, 'হালার পো হালারা কিপ্পুন্ইয়া, বক্কিলা (বখিলা), খাওন দেতে আছে না জুইত মত। অথচ দাওয়াত দেছে। এ বালের খয়রারইয়া খাওন মোরা খাইনা।

মেয়ের বাপ নেই। চাচা মুরুব্বি। ভোলা সোলা মানুষ। সামাল দিতে পারছিলেন না। মা মহিলা ভেতর থেকে যথাসম্ভব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কেউ যদি ঝঞ্ঝাট করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তবে আর কী করা যাবে। শেষতক, শওকতেরা উঠেই গেল। অভিযোগ, তারা একটু বাড়তি গোস্ত পোলাও চেয়েছিল, কিন্তু তাদের যা দেওয়া হয়েছে, তা চিবোনো হাড় বা ফেলে দেওয়া সামগ্রী, 'যেয়া কুত্তায় তামাইত' খায় না। হকের মামু, হাসনত্ সাহেব নিজে এবার তাদের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে, মেয়ে পক্ষের হয়ে মাফ চেয়ে নিলেন। কথা দিলেন, আগামী কালের জন্য এঁরা উত্তম এবং যথেচ্ছ গোস্ত পোলাওএর ব্যবস্থা করবেন। সকালে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে, দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর তারা রওনা দেবেন।

লঞ্চে ফিরে শওকত বায়না ধরল, তারা শুধু শুধু সাদির জন্যই যে এখানে এসেছে তাতো নয়, এই সুযোগে তাদের ভোটের ক্যানভাসও যাতে হয়, সেরকম নির্দেশ দলের থেকেই তাকে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং সেই সুযোগ তাদের দিতে হবে। হক প্রতিবাদ করলে, সে বললো, ক্যান্ আসোবিদডা কী? হ্যারগো মোন মোতাবেক হ্যারা পেরচার করুক। মোরগো মোন মোতাবেক মোরা করমু। হেইডাই তো গণতন্ত্রের নিয়ম। কিন্তু তর্কের খাতিরে তা স্বীকার করলেও, হক

জানতো, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। কোনোপক্ষেরই মুখের আগল বশে থাকবে না। সেই শিক্ষা এদেশে নাই। গাইল, খামার চলবেই এবং তার পরিণতি মারপিট, হাম্‌লাবাজি। চাইকী দুএকটা লাশও পড়তে পারে। কিন্তু হকের আবেদন নিবেদনে তারা কেউই কান দিল না। সারারাত গ্রামের এখানে সেখানে, বিশেষ করে, খালের ধারে মসজিদ-সংলগ্ন যে মাঠটি ছিল সেখানে, তারা ব্যাপক 'মাইফেল', করলো, শ্লোগান ইত্যাদি দিল। গ্রামবাসীরা এর কোনো প্রত্যুত্তর না করায়, কোনো গোলমাল হলো না বটে কিন্তু অসন্তোষ তুঙ্গে উঠল। হক্‌কে বেইজ্জতের চূড়ান্ত হতে হলো, নয়া শ্বশুর বাড়িতে। শওকতের ওপর আন্তরিক ভাবেই সে ক্ষুব্ধ হলো।

কিন্তু সেটাই সব নয়। ব্যাপার আরও কদর্য আকার ধারণ করলো যখন পরদিন সকালে হকের সম্বন্ধি লঞ্চে এসে হাসনাত্ সাহেব আর হককে ডেকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে গেল, তখন। তখন সেখানে গোটা গ্রামের ইতরভদ্র সবাই জড়ো হয়েছে। সকলেই ভীষণ ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ। উঠোনের ওপর একটা বিশালকায় ষাঁড় পড়ে রয়েছে। তার গলার নলি জবেহ করা। সারা উঠোন রক্তে ভেসে গেছে। এ ধরনের ঘটনা একমাত্র হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়েই দেখা গেছে। কিন্তু মুসলমানের উঠোনে এরকম ঘটনা কেউ কোনোদিন দেখেনি। বিশেষত বিয়ে সাদির উপলক্ষে।

হক বলল, ষাড়ডারে এই কয়দিন দেখছি খাল ধারে ঘুরইয়া ঘুরইয়া ঘাস পাতা খাইতে। দেইখ্যাই বোজা গেছিল, আল্লার ষাড়। তোরা হিন্দুরা যারে ধম্মের ষাড় কও। এইরহম দুই এ্যাটটা যাড়, খাসি গেরামে হামেশাই দ্যাহা যায়। কেউই হ্যারগো কাড্ইয়া যায় না। বেয়াকেই আদর করে, এডা ওডা খাইতে দে। হেইরহম এ্যাটটা ষাড়েরে এ্যারা এইরহম কাড্ইয়া ফ্যালাইলে। মোর মনডা একারণ একছের ভাইঙ্গা গ্যালে। ভাবলাম, কীয়ের ছাতা আত্মীয়তা, আর কীয়ের বেরাদরি। এ্যারা আসলেই জালিম। গেরামইয়ারা বা মোর হৌর বাড়ির কেউ কিছু কইলে না। পেরায় বেযাকের চোক্ষেই পানি। যড়ডারে বাজার এলাকায় বেয়াকেই দ্যাখছে। বেয়াকেই হেডারে পেয়ার মহব্বত করতে।

কিন্তু করার কিছুই ছিল না। গোটা পল্লীতে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল। হক বা তার মামা যে এঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবেন, তারও উপায় ছিল না। কারণ, তাঁরা কেউ এঁদের কিছু বলছিলেনই না। এই সময় লঞ্চ থেকে জব্বার এসেছিল। সে ঘটনাটা জানতো না। হঠাৎ অতলোকের উপস্থিতি এবং মাঝখানে ষাঁড়টার রক্তাক্ত দেহটা দেখে 'হায় আল্লাহ' বলে, সে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ এরকম কেটেছিল হকের আজ আর তা মনে নেই। একসময় হাসনাত্ সাহেব হকের চাচা শ্বশুরের হাত দুখানা ধবে, খুবই কাতরতার সাথে বললেন, বেয়াই সাহেব, এ কসুর আমার। আমি মুরুব্বি অইয়া আইয়া আপনা ফরজ পুরা করি নাই। আমার গাফিলতিতেই এইসব ঘটছে। আপনেরা অ্যাব লইগ্যা মোগো যে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন, যা জরমানা করবেন, মাথা পাত্ইয়া লমু। আল্লা কসম্।

চাচা মিঞা বললেন, শাস্তি, জরমানার মালিক আল্লা-পাক। তয় এই গোস্ত তো গেরামের বা বাড়ির কেউ খাইবে না, য্যারা এই কামডা করছে হ্যারগোই এয়ার পুরাডা খাওন লাগবে। আপনেরা য্যারা পিরকিতভাবে এয়ার লইগ্যা দায়ি না, হ্যারগোও মুই এ গোস্ত খাইতে কইতে পারিনা।

জব্বার এতক্ষণে বললো, য্যারা দোষী, হ্যারা তো নৌকা ভাড়া করইয়া ফেরৎ রওনা দিছে। তয় এহনও মোনলয় নদী তামাইত পৌঁছায় নায়।

তাইলে তারগো ধরইয়া আনোন লাগে। হক, এডা মোর হুকুম। মুই এহানে তোমাগো মুরুব্বি। মুরুব্বির হুকুম পালন করা ফরজ। - একথা হাসনাত্ মামুর। তিনি এখন রীতিমত ক্রুদ্ধ।

—হক জব্বারকে বলল, চল, লঞ্চ লইয়াই যামু। লগে বেয়াকে থাকলে অসুবিদা অইবে না।

সেদিন শওকতও তার সঙ্গীদের বড় কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। যখনই তারা বলেছে, 'আর খাইতে পারমু না, মাফ করেন।' তখনই সবাই হুকুমজারি করেছে, 'তয় আরেকবার বইমি করইয়া আয়, হ্যারপর আবার খা। শেষতক, হকের শ্বাশুড়ি তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন এই কড়ারে যে তারা বাজার কমিটির তহবিলে জরিমানা বাবদ দুহাজার টাকা জমা দেবে। কারণ, ষাঁড়টির মালিকানা তাদের। ঐ টাকায় তারা এতিম, মিশকিন্দের খাওয়াবে।

বারো

তালিবান দুলা, জব্বারের সমস্যা এবং মুশকিল আসান

আমার এই গল্পটি শুনে মনে হল, এটি নিছক গল্প বলার জন্যই হক বলেনি, এর পিছনে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও কাজ করছে। বোধহয়, আমরা যে এই এতগুলো লোক এখন জব্বারের বাড়িতে গিয়ে দাওয়াতে হৈ হট্টগোলের সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তাতে জব্বার কতটা অপ্রস্তুত হবে বা অসুবিধেয় পড়বে, সেই কথাটা তার চিন্তায় ছিল। জব্বার সাধারণ অবস্থার মানুষ, প্রধানত জমি নির্ভর, এখানকার আর দশজনের মতো। চাকরি একটা করে বটে তবে সেটা এমন কিছু না। গ্রামীণ বীমা প্রকল্পের একজন সাধারণ কর্মচারী সে। তবে যেহেতু চাষবাস কিছু আছে, মোটামুটি স্বচ্ছল ভাবেই চলে যায়। কিন্তু আটদশ জন বাল্যবন্ধু হঠাৎ করে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে, নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে সে সমস্যায় পড়তে পারে। গ্রাম গাঁ জায়গা, হুট্ বলতে খাবারদাবার জোগাড় করা সহজ নয়। সময় থাকতে জানলে, যাহোক, ব্যবস্থা হতো। সুতরাং হক বোধহয়, সে কারণেই তার বিয়ের সময়কার শওকতি জালিমিপনার গল্পটা বিশদে বলল। সমাজের সব প্রাক্তন পাপতো একদিনে যায় না। কে জানে, আমাদের দলেও এক আধটা আধমনি কৈলাস আছে কী না?

মঞ্জুদা পাকা মাথার লোক। সে সরাসরি হককে জিজ্ঞেস করে, তোর কী মনে হয়, মোরা তোর সাদির সোমায়ের মত হাভাতইয়াপানা করমু? হক বলল, না, হেয়া মোরা করমুনা। তয়, মোরগো কী বয়সটা ঐ সন্ন নিরঞ্জনের বিয়ার সোমায়ড়ার ল্যাহান হুল্লোড়ি বয়স আছে? ধলু বলল, আইজ সন্ন আর নিরঞ্জনের বিয়ার দিনের কথাডাই বেশি মনে পড়তে আছে। স্যানেও সহাল থিহাই হেই প্যাচাল পারতে আছে। মনে পরতে আছে যীশুদার কতাও। হেদিনের অনেকেই একলগে আইছি আইজ, আবার অনেকেই তো নাই। স্যানে তো খালি বেয়াকের কতা জিগাইতে আছে। বিশেষ করইয়া হ্যারগো পিরীতের কথা।

এতকাল বাদে আইয়া বেয়াকেরে আর পাইবে কই? কেউ আছে, কেউ মরছে, কেউবা বিদ্যাশে চাকরি বাকরি করতে গেছে। আর য্যারা হিন্দুস্তান যাবার, হ্যারা হিন্দুস্তানে পাড়ি দিছে। একথা হক বলে এবং তার বলার মধ্যে একটা তির্যক ভাব লক্ষ্য করি। কিন্তু তাকে এনিয়ে কোনো প্রশ্ন করার আগেই মঞ্জুদা বলে ওঠে, ওসব কথা থাউক। ওসব পরে আলোচনা অইলেও চলবে। আমি একখান প্রেস্তাব কই, বেয়াকে মন দিয়া শোন্। আমরা বেয়াকে যদি এট্টা খাসির জোগাড় করইয়া একছের পাক্সাক করইয়া লইয়া যাই, মোনে অয় ব্যাপারডা খারাপ অয়না। স্যানের ধার দিয়া কিছু আদায় করা যাইবে না, হে অতিথ। হেয়া ছাড়া হ্যার নেমন্তন্নো। হকেরও একই ব্যাপার। হ্যারা বাদ। মোরা বাদবাকি কয়জোন বরং ব্যবস্থাডা দেহি। হক কী কও? হেথে জব্বাইয়ারেও ঠোনা মাবা অইবে, সোমোস্যাও থাকপে না।

হকের উত্তর দেবার আগেই আমি পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট সামনে রেখে বললাম, হেয়া অয়না। একযাত্রায় পৃথক ফল চলবে না। হক আমাকে সমর্থন করে সেও একটা নোট রাখে পাঁচশোর। সব মিলিয়ে মোট দাঁড়ায় তিন হাজার। ধলু বলে, তয়তো এহনই মোকছেদইয়ারে ডাকতে অয়। পাডা, খাসি যা অয়, স্যার ছয়সাত সাইজের এটটা জোগার করইয়া দেবে হ্যানে। পাকতো হে ভালই করে। হাজার দুই টাকায় অইয়া যাইবে হ্যানে। বাকি এক হাজারে কয়েক স্যার রসগোল্লা বাজার থিহা নিয়া নিলেই অইলে। তয় ঘোত্না। তুই এই টাহাডা লইয়া এহনই বাইর অইয়া পর। মোকছেদ্রইয়ারে লইয়া পুরা কাম রাইত দশটার মইদ্যে শ্যাষ করইয়া, জব্বারের বাড়ি চলইয়া আবি।

আমাদের কথার মধ্যেই জব্বার এসে হাজির। ভীষণ উদ্‌ভ্রান্ত এবং বিধ্বস্ত তার চেহারা। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে দেখে, অস্বস্তিতে পড়ে যেন। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে, ভাই, তোমরা কিছু মনে করইওনা। মুই হকের লগে এটটু 'যুইত্তোবোন্দে' (গোপনে) বাত্ করইয়া আইতাছি। বলে, একটু দ্রুতই তারা তফাতে কথাবার্তা বলতে চলে গেলে, মঞ্জুদা আমাকে বলল, আমাগো অনেক সুখ দুঃখের কথাই কওয়ার আছে। তয়, আইজকার রাইতটা আমরা পুরানো দিনের কথা মনে করইয়া এটটু আনন্দ ফূর্তি করুম। এ রহম ইচ্ছা। কতকাল পর একলগে অইলাম!

ক্যান তোমরা কী এহন আর আনন্দ ফুর্তিটুর্তি করনা?

আনন্দফুর্তি কইতে যা বোজায়, হেয়া এহন আর করার সুযোগ কই? আসলে আমাগো বয়স অইয়া গেছে। হেয়া ছাড়া আগে আমরা যা লইয়া আনন্দ উৎসব করতাম, হেসব আইজকাইলকার পোলাপানেগো মইদ্যে নাই। হ্যারা এহন শহর নগরের ফূর্তিফার্তা লইয়াই মশগুল। মোগো সোমায়ের গেরামইয়া মজ্জা নাই কইতে কিছুই নাই।

কেন, যাত্রা, থিয়েটার, ফুটবল, হাডুডু এইসব খেলা, বা পুজো ঈদ্ এইসব নিয়ে গ্রামে আনন্দ উৎসব কিছু হয়না ?

না। শহরইয়া চাইল আমাগো আর আমাগো পোলাপানেগো মইদ্যে এমনভাবে ঢুইক্যা গেছে যে, আগের ঐসবে এহন আর কেউ মজা পায়না। যুগটাই পাল্টাইয়া গ্যাছে, বোজলা ?

এইসব আলাপ আলোচনা হচ্ছে, মঞ্জুদা হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে 'কী অইল ? কী ? অইছে কী, জব্বারইয়া ওরহম কুওইল দেতে আছে ক্যান' ? বলে হক আর জব্বারের দিকে ছুটে গেল। পিছনে আমরা সবাই। হক জব্বারকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। কাছে যেতে, হক আমাকে বলল, অরে এটটু শান্ত কর দেহি। মঞ্জুদা অ্যাটটু তফাতে আওছেন, কাম আছে। এ্যাটটা বড়সড়ো সোমাস্যা অইছে। চলো দেহি বুদ্দি পরামশশো করইয়া কী করন যায়, দেহি। আমাদের ঐসব হাল্কা আমোদের সুন্দর পরিবেশে হঠাৎ এমন কী গুরুতর সমস্যা ঘটলো, বুঝে উঠতে পারছিলাম না সহসা।

জব্বার আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে যাচ্ছিল। সে এমন হৃদয়বিদারক কান্না, যে একমাত্র কন্যাদায়ে বিপর্যস্ত বাপেরা ছাড়া অন্য কেউ সেরকম কাঁদতে পারেনা। অনেক তরিবতে শান্ত করে যা বুঝলাম, তা যেমন মর্মান্তিক তেমনি ভয়াবহ। জব্বারের মেয়ের বিয়েটা যে পাত্রের সঙ্গে ঠিক করা হয়েছিল, সে জব্বারের বীমা সংস্থারই একটা শাখা অফিসের ম্যানেজার। বাড়ি বাজিতপুর গ্রামে। সহকর্মীদের মারফত সম্বন্ধ। জওয়ান ছেলে। দেখতে শুনতে ভাল এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। আচার আচরণে একটু বেশি শরিয়তি, তবে জব্বারের মতো গ্রামীণ মানুষেরা এইরকম পাত্র পছন্দই করে। আদব কায়দা, চালচলনে বিনয়ী, নম্র এবং ভদ্র। তার মেয়ের সঙ্গে বয়সে, শিক্ষায় দীক্ষায়, চেহারা ইত্যাদির বিচারে প্রকৃতই মানানসই। আজ সকালে জব্বার যখন রাস্তার সেই ব্রিজের নীচে আমাকে দাওয়াত দিয়ে সদরের দিকে যাচ্ছিল, তখন শহরে ঢোকার মুখের বড় রাস্তার ওপরে যে লোহার ব্রিজটা, সেখানে একটা বিশাল জমায়েত দেখতে পায়। ব্রিজটার কাছেই ওই এলাকার সব চাইতে বিখ্যাত এবং বড় মাদ্রাসাটির অবস্থান। অত্যন্ত সুদৃশ্য পরিবেশ। একটি বড় খালের পাড়ে ঐ মাদ্রাসা এবং সংলগ্ন ছাত্রাবাস। সকালে আমি ঐ রাস্তাটি ধরেই গ্রামের দিকে আসছিলাম। তখন কয়েকজন ছাত্রকে ওখানে ব্রিজের ওপর দেখেছি। সবাই বেশ সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ এবং যথেষ্ট আদব কায়দা সম্পন্ন। সকাল সন্ধেয় তারা এই ব্রিজে আসে গল্পগুজব করে, এরকম আগেও যখনই এসেছি, দেখেছি। সত্যি বলতে কী, আমার এই ফিরে দেখার বিভিন্ন পর্যায়ে, নতুন প্রজন্মের এই সমাগম

আমাকে একধরনের তৃপ্তি দিয়েছে। বিগত কয়েক বছরে এই মাদ্রাসটিকে কেন্দ্র করে, অনেক ছোট ছোট মাদ্রাসা, মক্তব জাতীয় শিক্ষায়তন এই অঞ্চলের বিভিন্ন অভ্যন্তরে গড়ে উঠেছে। অনেক সময় এমনও শুনেছি, এসব স্থানে নাকি জঙ্গী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, এগুলো নাকি সন্ত্রাসীদের আঁতুড় ঘর। আমি দু একটা জায়গা ঘুরে দেখেওছি, কথাবার্তাও বলেছি শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে, কিন্তু জঙ্গীবাদি বা সন্ত্রাসী কোনো ব্যাপার স্যাপার আমার নজরে আসেনি। একসময় এর অনেক জায়গাই ছিল পরিত্যক্ত বা নির্জন এলাকা। সেখানে দিনে মানে যেতেও গা ছমছম করতো। সেখানে এখন মানুষের কোলাহল, চাষবাস, দোকানপাট ইত্যাদি আমার আনন্দেরই কারণ হয়েছে।

আজই সেখানে শহরে যাবার পথে জব্বারের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার মুখে সেই বৃত্তান্ত শুনে যেমন ভীত বোধ করলাম, বিষণ্ণ হলাম তার চাইতে অনেকগুণ বেশি। কী ভয়ংকর সংকটে আজ জব্বারের পরিবার! তার ভাবী জামাতা নাকি একজন কুখ্যাত সন্ত্রাসী! পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা নাকি ভোর চারটের সময় এক যৌথ অভিযানে তাকে, আর তার কয়েকজন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে। জব্বার যা বলল, তা হলো সে যখন বাসরাস্তায় পড়ে বাঁদিকে বেঁকেছে তখনই দেখতে পায় যে তার সহকর্মী হাকিমদ্দি প্রায় ছুটতে ছুটতে গ্রামের রাস্তার দিকে আসছে। এই হাকিমদ্দিই পাত্রের খোঁজ খবর, যোগাযোগ ইত্যাদি ব্যাপারে জব্বারকে সহায়তা করেছে। তাকে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে, সে ভেবেছিল যে নিশ্চয়ই পাত্রপক্ষের সন্ধেবেলায় আসার কোনো খবরাখবর দিতে তার কাছেই সে আসছে। যেহেতু খবরটা দিয়েই আবার তাকে অফিসে যেতে হবে, তাই এত দ্রুততা। কিন্তু সে কাছে এসে জব্বারকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, জব্বার ভাই, তুমি মোরে এট্টা লাথি মারো, যা ইচ্ছা করো। হায় আল্লা, মুই এ তোমার কী সব্বনাশ কবলাম! এয়ার পুরা কসুরতো আমার। তয়, বিশ্বাস করো, মুই এসবের কিছুই জানতাম না। সেলিম আব্বাসরে পুলিশ আর মিলিটারিতে এ্যারেস্ট করছে। ঐ দেহ ব্রিজের ওপরে মাদ্রাছার ছাত্তরেরা বেয়াকে হ্যার লইগ্যা জমায়েত অইছে। শহরে মহা গণ্ডোগোল। আরও কয়েক জোনরে ধরছে, হ্যার মইদ্যে মাদ্রাছার আলেমও আছে জোনা দুই। সেলিম আব্বাস পাত্রের নাম।

সেলিমরে ধরলে কান? হে কী এসবের মইদ্যে আছে নাহি? না মিথ্যা অভিযোগ?— জব্বার জিজ্ঞেস করেছিল।

সে বলেছিল, মিথ্যা অইলে তো এতক্ষুণে যে করইয়াই অউক ছাড়াইয়া আনথাম। হ্যারেতো ধরছে একছের এ. কে. ৪৭ সহ। গুলিও চালাইছেলে নাকি।

এমনই শোনলাম।

মানুষ মরছে কেউ?

একজোন পুলিশ, আর সন্ত্রাসী একজোন।

ঘডনাডা ঘডলে কোথায়?

আলোকদিয়া গেরামের এ্যাট্টা ছাড়া বাড়িতে। বাড়িডা 'দালান বাড়ি'। ভাঙ্গা। হেহানেই নাকি এ্যারগো গোপন আড্ডা আছিল। অস্ত্রশস্ত্রও রাখতো ওহানে।

-আলোক দিয়া তো বাজিতপুরের পাশের গ্রাম। ওহানে তো সেলিমেগো দখল করা এটটা বাড়ি আছিল শুনছিলাম।

- হেই বাড়িতেই।

হাকিমদ্দি আরও বলেছে যে থানায় তার পরিচিত একজন কনেষ্টবল তাকে জানিয়েছে যে কয়েক মাস আগে জিলা সদরে যে বিচারপতি হত্যার ভয়ানক ঘটনাটি ঘটেছিল, বা কোর্টে নিয়ে যাবার সময় রাজসাক্ষী হওয়া আসামিকে পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যেই গুলি করে মারার ঘটনা ঘটেছিল এরা সবাই সেই সব কেসেই অভিযুক্ত। পুলিশের কাছে পরিষ্কার প্রমাণ মজুত আছে যে সেলিম সেই সব সন্ত্রাসীদের ঐ আলোকদিয়ার পোড়ো বাড়িটাতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল।

এইসব কথা শুনে জব্বার হাকিমদ্দির সঙ্গে থানার সেই কনেষ্টবলের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এসেছে। কনেষ্টবলটি তাকে পরিষ্কার বলেছে যে, এরা কোনো মতেই যে ছাড়া পাবে না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা যে শুধুমাত্র সাধারণ খুনের কেস, তাতো নয়, কোর্টে যাবার পথে বিচারপতি এবং রাজসাক্ষী হত্যার মতো ঘটনাকে কোনো মতেই হেলাফেলা করা যায় না। সেইসব শুনে এবং তার মেয়ের ভাগ্যের কথা ভেবে সে ঠিক করতে পারছে না কী করবে? বাড়িতেইবা সে কী বলবে সবাইকে, বিশেষ করে মেয়েকে, তার বৌকে। লোকজনকে নেমন্তন্ন দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, গত কদিন ধরে বাড়িতে আত্মীয় স্বজনেরা এসেছে, মেয়ের খালা, ফুফু, তাঁদের ছেলেমেয়েরা। কত আনন্দ আহ্লাদের মধ্য দিয়ে কাটছিল এই দিনগুলো। এক মুহূর্তে যেন সব রোশনাই অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

হক আমাদের সবাইকে নিয়ে ব্রিজের উল্টো পাড়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে বসলো। ধলুকে বললো দোকান বন্ধ করে আসতে। বাজারের ওখানে বসে কথাবার্তা চলবে না। এসব কথা পাঁচকান হলে, নানা সমস্যা হতে পারে। মঞ্জুদাকে ইতিমধ্যেই সে সব বলেছিল, অন্য সবাই শুনেছিল এই চরম বিপদের কথা। কারুর মুখেই কোনও কথা সরছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল হক এবং মঞ্জুদা দুজনেই সমস্যাটির সমাধান নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছে। আমি ভাবছিলাম

সন্নর বিয়ের দিনের কথা। সেই ঘটনার সময় আমরা এখানে যে কজন বয়স্ক আছি, তারা প্রায় সবাই ছিলাম। তখন বয়স কম ছিল, সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনা ছিল প্রচুর। তার ওপর পরামর্শদাতা হিসাবে ছিলেন 'জেডামণি', 'মোতকাকার' মতো বিচক্ষণ এবং মুশকিল আসানকারী মানুষ। তাছাড়া সেই সমস্যাটাও ছিল আলাদা এমন বীভৎস নয়। আজ জেডামণি নেই, মোতাকাকা অতিবৃদ্ধ। আমরাও বয়সে স্থবির প্রায় হয়েছি। আমার মনে পড়ছিল সেইসব দিন এবং সেই বয়সের উত্তেজনার কথা। তখন পাকিস্তান আমল। দেশে মিলিটারি শাসন চলছে আইয়ুব খান সাহেবের। সংখ্যালঘুরা ভাল নেই, তবে খানিকটা স্বস্তিতে আছে। গ্রাম গাঁয়ে চুরি ডাকাতির বাড়াবাড়ি আছে এবং সেগুলোর চরিত্র সাম্প্রদায়িক, কিন্তু প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ফ্যাসাদ তেমন নেই। রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার ওপর দমনপীড়ন প্রবল। রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রগতিশীল বা উদারপন্থীদের উপস্থিতির জন্যেই হয়তো সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা কম। সুতরাং গ্রামীণ বিশ্বে একটা স্থিতাবস্থা, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু ভাল সামাজিক কাজকর্ম করার প্রবণতা এবং সুযোগ তখন বর্তমান। কিন্তু আজকের যে প্রজন্মকে এখানে দেখছি, তারা সামাজিক সমস্যার মোকাবিলায় যেন ততটা সম্পৃক্তি বোধ করছে না। সে নাহয় গেল, কিন্তু এরকম সমস্যার কোনো অভিজ্ঞতা তো সেদিন ছিল না।

কেউ কোনো সমাধানে আসতে পারছে না। ঠিক কী হলে জব্বার এই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে, কেউই বুঝে উঠতে পারছে না। এটা ঠিক যে, তাদের সমাজে হিন্দুদের মতো লগ্নভ্রষ্টা হওয়ার সমস্যা নেই। সেটা হিন্দুদের আজকের দিনে শহরের জীবনে সমস্যা না হলেও গ্রামে এখনও আছে। আছে অন্য অসুবিধেও। খরচপত্র করে একটা আয়োজন ভেস্তে গেলে যে অসুবিধে সেটা তো সামান্য ব্যাপার নয়, তা কী হিন্দু, কী মুসলমান উভয় সমাজের লোকের ক্ষেত্রেই। সুতরাং সমস্যাটা শুধু লগ্নভ্রষ্টা হওয়া না হওয়ার মধ্যে নয়। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাজারো ফ্যাকড়া মুসলমান সমাজেও হিন্দু সমাজ অপেক্ষা কম নেই। মুসলমান সমাজের সুবিধের জায়গা যেটা, সেটা হল, আজকে যদি নির্ধারিত সময়ে বিয়েটা কোনো কারণে না হতে পারলো, তো কাল অথবা দুচারদিন বাদে তা সম্পন্ন হতে পারে, তাতে কোনো বাধা নেই। পাত্রও পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু সন্নর বেলায় তৎনগদ একজন পাত্র জোগাড় করা গিয়েছিল বলে, জব্বারের মেয়ের জন্যও যে কাউকে এখনই বা দু এক দিনের মধ্যে পাওয়া যাবেই, এমন বলা যায় না। সন্ন ছিল সেদিনকার এক ভিখিরি বামুনের প্রায় অশিক্ষিত একটি কিশোরী কন্যা মাত্র। জব্বারের মেয়ে আজকের কলেজ পাশ করা, মোটামুটি

মধ্যবিত্ত বাপের অনেকটাই আধুনিক যুবতী মেয়ে, সাবালিকা। সন্ন সাবালিকা ছিল না, বা তার মতামতের কোনো মূল্যও ছিল না। দশে মিলে সেদিন যেমন বুঝেছিল, তেমনই উদ্ধারের উপায় করেছিল। ফলাফল পরে যাই হোক, তখনকার মতো সবাই তা মেনে নিয়েছিল। খুশিও হয়েছিল। কিন্তু আজ পরিস্থিতি সবদিক দিয়েই আলাদা। বিশেষত এর মধ্যে একটা সন্ত্রাসী চক্র ঢুকে পড়েছে।

মঞ্জুদা আর হকও সেদিনের কথাই বলছিল, বিকল্প সমাধান হিসাবে। কারণ, সন্ন আর জব্বারের মেয়ের, দুজনের মধ্যে যতই অবস্থা এবং অবস্থানগত পার্থক্য থাকুক, কোন একটা জায়গায় যেন একটা মিল ছিল, যেটাকে প্রায় অদৃষ্টগত মিলই বলা যায়। জব্বারের কন্যা যতই হস্টেলে থেকে, শহুরে কলেজে পড়াশোনা করুক, আসলে সে গ্রামীণ শিকড়ের সঙ্গে এখনও সন্নদ্ধ। পুরোপুরি আধুনিক নগর জীবনের অভ্যাস তারও তো গড়ে ওঠার কথা নয়। তার উপর মুসলমান সমাজের কিছু গ্রামীণ সংস্কার, যার প্রকৃত ইসলামী নিয়ম কানুন বা বিধি বিধানের তেমন কোনো সম্পর্কই নেই, যাকে নেহাৎই গ্রাম্য কুসংস্কারই বলা যায় ইসলামী বিচার অনুসারেই। কিন্তু গ্রামীণ এই স্তরে, সামাজিক জীবন যাত্রার মধ্যে সন্ত্রাসী অনুপ্রবেশ কী মারাত্মক!!

রাত বাড়ছিল। হক পরামর্শ দিল, চল্ মোরা বেয়াকে ওর বাড়ি যাই। কিন্তু হুঁসিয়ার সেলিমের ঘটনার কথাডা কেউ যেন ওহানে ভুলেও উডাইও না। মাথারিরা হেলে, চিক্কইর, পাকখৈর আরাম্ব করইয়া দেবে। আমি মনে মনে এটটা ফন্দি ঠিক করইয়া ফ্যালাইছি। দুলা বদল হইবে। তয় বিয়াডা অইবে কাইল দুফইরে। পাত্তর মুইই ঠিক করুম। অবশ্য জব্বারইয়া যদি রাজি অয়, আর মাইয়ারও যদি মত থাকে। পাত্তর হ্যার চেনা, মাইয়ারও। তয়, এহন কিছু কমুনা। এহন যামন যামন আয়োজন অইছে, কাজকম্ম, খাওয়া দাওন, আনন্দফুর্তি হেইরহমই চলবে। ধরইয়ালও কোনো আফৎই হয় নায়। পাক্সাক, এ দিকে, ঔদিকে যা যা অইছে, হেয়ার থিকা যতডা সম্ভব কাইল দুফইরের খাওয়ান, খাওনের লইগ্যা রাহনের ব্যবস্থা করতে অইবে। বাড়িতে খালি এটটা কথা জনাইতে অইবে যে, বরযাত্রীগো লঞ্চ খারাপ অইয়া কালিজিরার (নদী) ঠোডায় আটকাইয়া গেছে, আইজ আইথে পারবে না কেউ। এরহম তো এদ্যাশে ঘডেই। মোর বিয়ার সোমায়ওতো, যিদিন বিয়া হওয়ার কথা, অইলে হ্যার তিনদিন পর। ঘাডেই আটকাইয়া রাখলে হেই তিন দিন। মনে কর এ অবস্থাডাও হেই রহমই।

একটা কথা অবশ্য সবাই স্বীকার করল যে এই পাত্রের সঙ্গে 'সাদিডা' না হওয়া খুবই ভাল কাজ হয়েছে। বিয়েটা এখানে আজ হয়ে যাবার পরে যদি

ঘটনাটা ঘটত, তাহলে তো কারুরই আফশোষের সীমাও থাকত না, উল্টো জব্বারেরও বেশ কিছু পুলিশি ঝামেলায় পড়তে হতো। আল্লায় যা করেন, ভালর জন্যই করেন। হকের সিদ্ধান্তে সবাই সম্মত হলো। বিয়ে আজকের বদলে কাল। কিন্তু দুলা বা পাত্রটি কে হবে, একমাত্র হক ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউই তা জানে না। তবে মুহূর্তের মধ্যে হক যেভাবে চনমনে করে তুলল সবাইকে, তাতে আগামী দিনে যে বিয়েটা হবে সে বিষয়ে কারুরই কোনো সন্দেহ রইল না।

বুঝলাম হক একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভেবে নিয়ে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত এখন।

তেরো

দুলা বদলে মুশকিল আসান—

পাড়া-গাঁ অঞ্চলে, বিশেষত, আমাদের এই অঞ্চলের মতো নিতান্তই অনগ্রসর একটি পল্লী অঞ্চলে রাত দশটা মানে গভীর রাত। রাস্তাঘাট সবই মেঠো, গ্রাম্য পথ যেমন হয়, অপরিসর, দুপাশে হয় ধানক্ষেত নয়তো ঝোপ জঙ্গল। পথগুলো সাধারণত সরু কোনো খালের পাড় ধরে চলতে চলতে, নানা ভাগে ভাগ হয়ে, এ গ্রাম, সে গ্রামে ঢোকে। রাস্তায় আলো থাকার কথাও নেই, সেটাকে কেউই এখনো চাহিদা হিসাবে বিচারও করে না। দু একটি ক্ষেত্রে হয়তো তার ব্যতিক্রম অতি সাম্প্রতিক কালে ঘটেছে। সে কোনো তালেবর মন্ত্রী বা এম. এল. এ জাতীয় কেউ যদি সেই গ্রামের অধিবাসী হন তাহলেই। যদিও তাঁরা কেউ গ্রামে থাকেন না, তবে আয়োজন রাখতেই হয়। সেখানে রাস্তাটা তাঁদের বাড়ি পর্যন্ত ইঁটের এবং বিদ্যুতের ও ব্যবস্থা থাকে। সেই সূত্রে আশপাশ দু একটা বাড়িও সে সবের প্রসাদ পায়। তবে সে অবস্থা বুঝে।

জব্বারের এখনকার বাড়িটা, অর্থাৎ পবন কামারের যে বাড়িটাতে সে এখন থাকে, সেটা বড় রাস্তা থেকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা গেলেও, যেতে হয় বেশ খানিকটা ঘুরে। পথটা সেরকমই। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে, সুপারি বাগানের ফাঁক ফোঁকড় দিয়ে হ্যাচাকের তীব্র আলো দেখা যাচ্ছিল। জব্বার বলল, আটটার মধ্যে বরযাত্রিগো লইয়া মোর পোছোনের কথা, এহন বাজে দশটা। হেই বেয়ানে বাইর অইছি। এ্যারা হয়তো চিন্তায় পড়ছে। এহন আবার বাড়িথে যাইয়া যহন কমু, বিয়া আইজ হইবে না, কাইল হইবে, বেয়াকের খুবই মন খারাপ হইবে হ্যানে। আল্লা, কীবা ল্যাখছো মোর নসীবে তুমিই জানো।

হক জব্বারের হাহুতাশি অবস্থা দেখে ধমক দেয়। তোর কী মোর কথার উপার ভরসা অয়না? তুই জানোনা, ফালতু বাত্ আমি করিনা?

জানি, তয় তুইতো ভাঙ্গাইয়া কিছু কইলি না এহনো। মোনে এট্টা উদ্বাগ লইয়া সহজ স্বাভাবিক থাকি ক্যামনে?

হোন্, তোর বৌর লগে যা কতা কওয়ার মুইই কমু হ্যানে। তুই খালি পাত্তর পক্ষের উপার বে-ফালতু গাইল খামার দিবি। কবি, লঞ্চ মারানির পোয়গো পেরথমেই কইলাম লঞ্চ লাগবে না, নাওয়ে করইয়া চল্। না, হেনারা লঞ্চ ছাড়া আইবেন না। এহন হালার পো হালাগো লইগ্যা মোর পেহারডা দ্যাহছেন। এইসব এমনভাবে কবি, য্যান্ তোর সাইদ্যের গোসা অইছে। কিন্তু খবরদার আসল কথাডা য্যান্ চাউর না অয়। ইদিকে মুই তোর বৌরে যা বোঝাবার হেয়া বুঝামু হ্যানে। হে যে তোর থিহা মাথা ঠাণ্ডা মানুষ হেডা মানাবি তো?

মানলাম। তয় হেসব কতার এ্যাটটুও কী মোরে কওন যায় না?

না। হেয়ার অ্যাট্টা বিশেষ কারণ আছে। তোর বৌ হেডা বোজবে ভাল। তোরে কইয়া লাভ নাই। হেয়া ছাড়া লাইলির, মাইনে তোর বৌর লগে এই সুযাগে এ্যাটটু রসের কতাও কমু ভাবতাছি। তোর হেথে আপত্তি?

না, তুই হ্যারে লইয়া গ্যালেও মোর কোনো আফইত্য নাই, বরং বাঁচি।

বুঝলাম হক্ আবহাওয়ার গুমোটটা কাটাবার জন্য কথার মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তার যাদুমন্ত্রটা কী, যার সাহায্যে কাল দুপুরের মধ্যে সে একেবারে আনকোড়া একটা নতুন 'দুলা' জুটিয়ে এতবড় সমস্যাটার সমাধান করে ফেলবে? ও বরাবরই রাজনীতির লোক ছিল বলে শুনেছি। কিন্তু কতটা প্যাচ পয়জার সে এ ব্যাপারে রপ্ত করেছে তাতো জানি না। যে বয়সে আমরা বন্ধু ছিলাম, তখন রাজনীতি আমাদের সম্পর্ক নির্ণয় করত না। জীবনের ভিন্ন অনুষঙ্গ ছিল। সে যাহোক, এখন পরিণত বয়সে, দলীয় রাজনীতি থেকে সে সরে এসেছে বলছে। কিন্তু তাই বলে তার প্যাচ-পয়জারগুলো কাজে লাগাবে না এমনতো নয়। তাই ভাবছিলাম, তার প্ল্যানটা কী হতে পারে। এই অজ গাঁয়ে কী চট্ করে একটি আলোকপ্রাপ্তা যুবতীর জন্য উপযুক্ত একজন পাত্র চট্ জলদি জোগাড় করা সম্ভব? তাও আজকের ঘটনার পরিস্থিতিতে?

বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই হক্ লাইলির নাম ধরে চেঁচিয়ে হাঁক ডাক শুরু করে দিল। লাইলিও পড়িমরি করে দলুজে এসে দাঁড়ালো। তার চোখমুখে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার ছাপ। চাহনিতে একই সঙ্গে যেন হাজার প্রশ্ন উচ্চারণের অপেক্ষায়। কিন্তু হক তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার অবকাশই দিল না। বলল, লাইলি, এটটু আড়ালে আয়, কিছু কতা আছে। আর শোন। বিয়াডা আইজ রাইতে হইবে না। কিছু অসোবিদা আছে। কাইল দুফইরে অইবে। কিন্তু হে কতা পরে জব্বার কইবে হ্যানে বেয়াকরে বুজাইয়া। তুই আগে মোর কথা হোন এটটু এলহা এলহি। বলে, জব্বারের দিকে তাকিয়ে একটু অর্থপূর্ণ হাসল। জব্বার ততক্ষণে, পাত্র পক্ষের উদ্দেশ্যে তার বাছাবাছা 'শকাসশব্দ' অর্থাৎ খামার শুরু করে দিয়েছে। সঙ্গের যারা

তারা সবাই দলুজে পাতা ফরাসে বা হোগলার চাটাইয়ে বসে, কাৎ হয়ে তাকে দোহার দিয়ে যাচ্ছে। মঞ্জুদা আমার কানের কাছে মুখটা এনে বলল, এয়া না অইলে শ্যাহের বিয়া? কথাটা, দীর্ঘ নগর জীবনের অভ্যস্ততার জন্য এবং পশ্চিম বঙ্গীয় বর্তমানকালীন চলনসই অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা চর্চার কারণে, খট্ করে কানে বাজল। কিন্তু সেটা খানিকক্ষণের জন্য। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের রসিকতা কেউ কখনো করেনা এমন নয়, তবে তা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে বিতর্ক ওঠে ব্যাপক। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা সে রকম নয়। সেও একটা অভ্যস্ততার ব্যাপার। এ ধরনের মন্তব্য সব সময়ই যে বিদ্বেষ এবং ঘৃণা প্রযুক্ত, বিশেষত এই অঞ্চলে, তা নয়। এসব কথা এখানে সরাসরিভাবেই বেশির ভাগ লোক বলে থাকে। উভয় সমাজেই এরকম উক্তি হামেশা শোনা যায়। যে শীলিত ব্যবস্থায় এই ধরনের উক্তিকে অশালীন মনে হয়, সে ব্যবস্থা কোনো কালেই এসব স্থানে ছিল না, এখনো নেই। একটা সময় ছিল যখন তথাকথিত উঁচু জাতের মানুষেরা এই কথাগুলো ঘৃণা প্রকাশ করার জন্যই বলতো। সেগুলো ছিল এক ধরনের অশিক্ষিত দাম্ভিকতা, এখন সমাজের সাধারণ ব্যক্তিরা যখন বলে তার মধ্যেও অশিক্ষার প্রভাবটাই বেশি, দাম্ভিকতা বা অন্যকে আহত করার উদ্দেশ্য তার মধ্যে প্রায় থাকে না। এটা বেশ নজর করার মতো একটা ব্যাপার।

জব্বার তার 'খামার' বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির সবাইকে মোটামুটি খবরটা জানিয়ে দিয়েছে যে 'হালার পো হালার গুষ্টিগো' লঞ্চ কালিজিরার 'ঠোডায় আটকাইয়া গ্যাছে।' এখন যদি কাল সকাল দশটার মধ্যে যে উপায়ে হোক তারা না আসে তবে সে এই বিয়ের চুক্তি ভেঙে দেবে, তাতে যা হয় হোক্। এডা হিন্দু গো বিয়া না, যে এ্যাটটু ঠোনা লাগলেই মাইয়ার জাইত যাইবে, বা হ্যার মা-বাপেরে এক ঘরইয়া অইয়া থাকতে অইবে। বাজিতপুর গেরামডা এমন কিছু দিল্লিদূর না যে হেহান দিয়া হাবাদিন ধরইয়া অইন্য ভাবে এহানে আওনের ব্যবস্থা করা যায় না। বাজিতপুর থিহা বাসে বা নৌকায় কী হ্যারা হারাদিনে এহানে পোছথে পারতে না? ব্যাপারডা তো এট্টা গুরুতর বিষয়, বিয়া সাদির। মানুষ ক্যামনে এমন বে-আক্কেল অয়, বুজি না।

গোটা ব্যাপারটাই যেন হকেরই সাজানো ছকে ঘটছে। মঞ্জুদা মাঝে মাঝেই কপটক্রুদ্ধ জব্বারকে শান্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভেতরে মেয়েমহলে বেশ কলকোলাহল শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোনো কথা বোঝা যাচ্ছে না। হক আর লাইলির এখনও দেখা নাই। তারা পাশের ঘরে কথা বলছে। অনেক কষ্টে যেন মঞ্জুদা জব্বারকে পাশে বসালো। বলল, দ্যাখ্ জব্বার, কোনো সোমস্যা ঘড্লে চেমামেচি করইয়া কেনো ফয়দা অয়না। হকের বিয়ার সোমায় যে গোণ্ডোগোলডা

অইছেলে ও গল্প করলে, হে সোমায় তো তুই চোমোৎকার ভাবেই ব্যাপারডা মিডাইয়া দিছিলি। সন্নর বিয়ার সোমায়ের কথাও তোর মনে আছে, যদিও হে সোমস্যাগুলো আছেলে ভিন্ন কেসেমের। তমো সোমস্যা তো। হেগুলা যহন মেড্ছে, এডাও মেডবে। ভরসা রাখ। তোগো সোমাজে তো বিয়ায় একদিন এদিক ওদিক অইলে আমাগো, মতো সোমস্যার কিছু নাই। অত ভাবতে আছো ক্যান ?

এইসব কথার মধ্যে হক আর লাইলি হাত ধরাধরি করে বারান্দায় আসে চোখে মুখে কৌতুকের হাসি। মঞ্জুদা তার চোখজোড়া প্রায় কপালে তুলে জব্বারের কোলের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে বলল, অইলো, তোর কপাল বোধায় সয়ত্যই পোড়লে এবার। হতভম্ব জব্বারের পাশে লাইলিকে বসিয়ে হক বলল, বয়, লাইলি বয়, তোর খসমের গা ঘেষইয়া বয়। মোরা বেয়াকেই এহানে বন্দুবান্দব, আর জব্বারইয়া, হালার ভাই হালা হোন, আইজ থিহা লাইলির লগে মোর কোনো রহম আর আইন নাই। হে মোর বেয়াইন, তুই দামড়াডা মোর বেয়াই। জব্বার চেঁচিয়ে উঠল—'মাইনে ?'

'মাইনে, মোর ঘরে যে বড় দামড়াডা আছে, জুলফিকার, হ্যারেতো দ্যাখছো। তোর মাইয়ার থিহা দুই বছরের সিনিয়র। চেনাজানাও বহুদিন থিহা। তয়, মোর বড় দামড়াডা যে মোসাম্মৎ সাহানা জব্বারেরে মনে মনে পছন্দ করতেন, হে কতাতো সাহানার বিয়ার কথা পাকা হওনের আগে কয়েন নায় কোনোদিন। যহন তুই বাজিতপুরের পাটটির লগে ওয়াদাবদ্ধ, তহন দেহি, একদিন হেই মোতা জোলার নাতি হ্যার মায়রে কয়, মোরতো পছন্দ আছেলে, তোমরা এটটু বাত করইয়া দ্যাখফা নাহি ? একতা হুনইয়া মোর মেজাজটা গেলে বিগড়াইয়া। কারণ, মুইতো জানি যে ইদিগে কাবিলনামা ল্যাহা পেরায় শ্যাষ। আর ওয়াদা করইয়া পুরা না করা মোসলমানের পক্ষে হারাম। তুই পাডার পো পাডা, বক্রির আওলাদ্ একতা এ্যদ্দিন কও নায় ক্যান ? এহন এই কতাডা যুদি জব্বারইয়ারে কই, হে যে খালি দেলে ঘা খাইবে হেয়াইতো না, হে মোরে খুন করবে। হ্যার লইগ্যা দামড়াডারে কইলাম, ও সব খোয়াব দ্যাহ ভুলইয়া যাইয়া, অইন্যে চেষ্টা দ্যাহ। এডারে পাডার পো পাডা, বকরির আওলাদ কমুনা, কী কমু ক' ?

মঞ্জুদা ফোড়ন কেটে বলল, বকরির আওলাদ কী না জানি না, তয় পাডার পো পাডা যে, হে কতা অস্বীকার করার উপায় নাই। লাইলি বলল, কতাডা খাডি।

মানুষ নাকি কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। তার নাকি আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কখনো হয় না। তার 'যত পাই তত চাই' ভাবটা নাকি একেবারে শাশ্বত ব্যাপার। কিন্তু

আজ রাতে এই সমতট দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত অখ্যাত, অনগ্রসর গ্রামের একটি সাধারণ বাড়িতে মেয়ের বিয়ে সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত মানুষগুলোর মুখ দেখে আমার প্রাগুক্ত 'শাশ্বত' ব্যাপারটাকে নেহাৎই কথার কথা বলে মনে হচ্ছে। সামান্য মেলোড্রামাটিক সংলাপে, অতি দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে এরকম একটা বিপর্যয়কারী অবস্থাকে পালটে দিয়ে এতগুলো মুখকে সব পেয়েছি সুলভ খুশিতে উজ্জ্বল করতে পারা যায়। তার এরকম চমৎকার দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখেছি। মানুষ সত্যই কত অল্পে সন্তুষ্ট হয়, বিশেষত গ্রামীণ বিশ্বে! যদিও এই অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার মানসিকতা থেকে আমরা দ্রুত সরে যাচ্ছি অসন্তুষ্টির জটিলতার জগতে, তবু এখনও যে পৃথিবীর অন্দরে কন্দরে এই অল্পে খুশি হওয়ার মাধুর্যটা রয়েছে এটা চাক্ষুষ করে আমি বড়ো আপ্লুত বোধ করলাম।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস এবং জড়াজড়ি, কোলাকুলি স্তিমিত হলে, হক বললো, বেয়াইন সাহেবা কী কিছু খানাপিনার ব্যবস্থা করবেন, না হেনার মধুর কতা হুনইয়াই মোগো, রাইতটা গুজার করতে অইবে? রাইত অনেক হইছে, মুই একবার বাড়ির দিকে যামু। আব্বুজানের লগে কিছু বাতচিৎ করতে অইবে। স্যানে মোর লগে অইজ রাইতটাও থাকপি ল।

ধলু বলল, ওরতো মোর বাড়ি থাহনের কতা আইজ। হক বলল, না, আইজ অর মোর লগে থাহনের দরকার অইবে। তোর লগে না অয় আরেক রাইতে থাকপে। এ, হেঃ কতাডা এট্টু অসোইব্য অইয়া গেলো, বেয়াইন সাহেবা মাফ করবেন। আসলে আপনে আবার মাইয়া লোক কীনা।

লাইলি এতক্ষণ হট্টগোল এবং ভিড় ভাট্টায় আমাকে ঠিক দেখেনি বা অতলোকের মধ্যে খেয়াল করেনি। জব্বার বা হকেরও খেয়াল বা সময় হয়নি আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের পরস্পরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার। লাইলির মুখটা চেনা চেনা লাগছিল। কিন্তু সেতো ছেলেবেলার কথা। এবং অত্যন্ত ব্যক্তিগত কথা। এখান থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরের একটা গ্রাম্য ইস্কুলে পড়ি তখন। সপ্তম কী অষ্টম শ্রেণিতে। পঞ্চম শ্রেণির একটি ছাত্রী, ইস্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে 'কাঠবেড়ালি' ছড়াটা আবৃত্তি করেছিল। সেই ছবিটা লাইলিকে দেখে বার বার মনে পড়ছিল আমার। কারণ, তাছাড়াও ওর গালে একটা কাটাদাগ ছিল, সেটার জন্যই আরও চেনা মনে হচ্ছিল। সেই ঘটনার পর থেকে মেয়েটিকে আমরা ছেলেরা, আড়ালে কাঠবেড়ালি বলে উল্লেখ করতাম। সেও ব্যাপারটা জানতো। খুবই সুশ্রী, ফর্সা এবং ঝকঝকে চেহারার কিশোরী ছিল সে এবং কাঠবিড়ালির মতই ছটফটে স্বভাবের। এই লাইলিই সেই মেয়েটি। কাছে এসে চোখ পাকিয়ে লাইলি আমাকে খানিক দেখে জব্বারকে উদ্দেশ করে বলল, এ

কারে লইয়া আইছেন আপনে ? অ্যাঁ ? এ আমি কারে দ্যাখথে আছি ? কেষ্টাদাদা কী আমারে চেনথে পারলেন ?

প্রসঙ্গত, লাইলিকে যেমন, 'কাঠবিড়ালি' আবৃতির করার জন্য কাঠবিড়ালি নাম পেতে হয়েছিল, বদলা হিসাবেই 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি আবৃত্তির জন্য আমি 'কেষ্টা' বলে খ্যাতি পেয়েছিলাম। সেই কারণে ছোটদের কাছে কেষ্টাদাদা। বললাম, কাঠবেড়ালি !

হায়রে ! ফেলে আসা শৈশব কৈশোরের কষটে পেয়ারা, টোপা কুল আর অদ্ভুত সম্মোহনের দিনগুলি ! লাইলি এমন ভাবে আমার কাছ ঘেঁষে আদুরে মেয়ের মতো দাঁড়ালো যে এ অঞ্চলের মুসলমান মেয়েরা কোনো কালেই খুব একটা বোরখাপন্থি না হলেও, এতটা ভাবাই যায় না। সে বলতে গেলে, প্রায় যেন বহুকালের দূরত্ব পেরিয়ে হঠাৎ, অভাবিত ভাবে এক হারিয়ে যাওয়া প্রেমিক অথবা ভাই, অথবা তারও অধিক আপন যদি কেউ হয়, তাকে কাছে পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা এক নারী, তার সব লজ্জা, কুণ্ঠা, বাধানিষেধ উপেক্ষা করে যে আচরণ করতে পারে, এই ব্যাপারটা তারই তুল্য। কথাটা বলতে, এই বয়সে আর লজ্জা করে লাভ নেই, ঐ বয়সে, দু বছরের জুনিয়ার সেই পুঁচকে মেয়েটি রূপে গুণে এবং মেয়ে হবার গৌরবে আমাদের অনেকেরই হৃদয় চাঞ্চল্যের কারণ হয়েছিল। তখন তো চেতনায় মুগ্ধতা ছাড়া অন্য কোনো স্থূল প্রায়োজনিক ছট্‌ফটানি ছিল না, বা যেটুকু ছিল, তার প্রকাশের চিন্তা বা আলোচনা কখনোই হৃদয় বৃত্তিকে অতিক্রম করত না। সেই লাইলির আজ মেয়ের বিয়ের কথা ছিল। সেই বিয়েটা কাল হবে। একটা ভয়ঙ্কর কারণে আজকের বিয়ে ভেঙে গেল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এবং প্রায় বলা যায় কোনো গল্প বা উপন্যাসের ইচ্ছাপূরণ পরিণতি হওয়ার মতো ঘটনাটি গতি পেতে চলেছে। অথচ, এই কাহিনীতে কল্পনার ভেজাল দেব না বলে, লেখাটিকে আমি ধরাবাধা উপন্যাস হিসাবে উপস্থাপিত করতেও প্রয়াস নিইনি। তথাপি, আমার মনে ভীতি আছে, মুজতবা আলির শব্দ ব্যবহার করে বলতে গেলে, যেটা হয় যে, 'সন্দেহ পিচেশ' কূট-পাঠককুল ব্যাপারটিকে ইচ্ছেপূরণের গল্প বলেই অভিহিত করবেন। তা করুন, তাতে সত্যের ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

খাওয়া দাওয়া, গল্প গুজবে চললো আরো খানিকক্ষণ। তারপর একে একে ছোটরা যে যার বাড়ির দিকে রওনা হলে, হক, মঞ্জুদা, ধলু আর আমিও উঠলাম। প্রথমেই ধলুর বাড়ি। সে, পরে একদিন তার বাড়ি থাকব, এরকম কথা আদায় করে চলে গেল। মঞ্জুদার বাড়িটা বেশ তফাতে, তবে আমাদের সঙ্গে একদিকেই যেতে হবে। খানিকটা এগিয়েও দিতে হবে তাকে। তারপর আমরা

ফিরব। যাবার আগে মঞ্জুদা বলল, হক, আমি বাওনের পোলা, তুই মোছলমান। তমোও আশীব্বাদ করি তোর ভাল হউক। তুই যা করলি আইজ, আশা করি, প্রার্থনাও করি, এয়ার সব কিছু যেন সফল হয়। বেয়াকের মঙ্গল হউক। মঞ্জুদার মুখে এরকম আকোপূর্ণ কথা আগে কখনও তেমন শুনিনি। বিশেষ করে 'শ্যাহেগো' সম্পর্কে।

মঞ্জুদাকে এগিয়ে দিয়ে, হক আর আমি ফিরছিলাম নির্জন রাস্তা ধরে। গত রাতটা প্রায় জেগেই কাটাতে হয়েছিল। আজকের সারাটাদিন কেটেছে নানা ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্যে। শরীর আর বইছিল না। এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়লাম, তাতে আজ রাতটাও কতটুকু বিশ্রামে কাটবে বলা দুষ্কর। এখানে এলে, আমার নিজস্বতা বলতে কিছু থাকে না। এর আগে যতবার এসেছি, পুরোনো, নতুন, যাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, তারা আমাকে ঘিরে একটা উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করত। গান, বাজনা, গল্পগুজবে, এমন কী, কিছু কিঞ্চিৎ নেশাভাঙ করে আমরা যেন ফিরে যেতে চাইতাম ফেলে আসা মদির দিনগুলোতে। সেই সফর সময়গুলি বাছা হতো দুর্গা পূজার মরশুমে। তখন শরৎ তার অনিবার্য মনখারাপ করা মগ্নতায় আচ্ছন্ন রাখত, আর সেই মগ্নতাটিই তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভোগ করার এক অদম্য আকুতিই পেয়ে বসতো তখন। এক একটা রাত যেত, প্রতি ভোরে অন্য এক বিষণ্ণতা, যেটা আশু বিচ্ছেদের জন্য মনটাকে একটু একটু করে বৈরাগী করে দিত এবং তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটত চলে যাওয়ার দিনটিতে। গোটা নিসর্গবৃত্ত, তখন যেন সেই ভিন্ন বিষাদের গৈরিক বসনে স্তব্ধ গম্ভীর এবং এভাবেই সে যেন মূল শারদী 'মনখারাপ করা' মগ্নতায় মিশে গিয়ে নবমী নিশির শেষ প্রহরের শিবরঞ্জনীর সুর ছড়িয়ে দিত চরাচরে।

এবারের সময়টা শরত নয়, গ্রীষ্ম। জ্যৈষ্ঠের প্রখরতায়, উদ্দেশবিহীন ভাবেই এসে পড়েছিলাম এবার। মাঝে বেশ কয়েক বছর আসা হয়নি। লোক মুখে, সংবাদ মাধ্যমে নানান খবর শুনি, দেখি। দেশটাকে নিয়ে কোথায় যে চলেছে এরা। এত হত্যা, আর রক্তপাত, আর উন্মত্ততা ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে, মানুষের ভাল করার নামে! কোথায় যেতে চায় এরা, কোথায় নিয়ে যেতে যায় সমাজটাকে, দেশটাকে, কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। অবশ্য ওসব বড়ো বড়ো ব্যাপার স্যাপার বোঝার বা জানার প্রয়োজন বা আগ্রহ আমার নেই। আর বিশ্বের কোথায়ইবা নেই এইসব? ছোট পরিসরের মানুষ আমি, আমার বুকের মধ্যের জমিন টুকুতে যাদের বসবাস, তাদের খবর টুকু পেলেই আমার চলে। সেই ছোট্ট ভূমিখণ্ডটিই, ছেড়ে যাবার পর থেকে, যেন একটু একটু করে এক মস্ত বড় গ্রহের আকৃতি পেয়েছে! সেইই আমার দেশ। সেখানে কোনো অনাচার, উপপ্লবতা, রক্তপাত আমাকে ভীষণ কাতর করে, ধ্বস্ত, ক্লান্ত করে।

তাই এবার এসেছিলাম একটু ভেতরে ঢুকে এখানের মানুষদের বর্তমান যাপিত জীবনটা একটু ভালভাবে পরখ করতে। প্রথম পদক্ষেপেই গ্রীষ্মের প্রখর্যের সঙ্গে বাস্তবের, বিশেষত, একেবারে সদ্য বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে পড়েছি। ফলে সকালে ব্রিজে দাঁড়িয়ে যে পাতার ঘর বাঁশের খুঁটির কাহিনীর স্মৃতিমন্থন করছিলাম, এক ধাক্কায় তা পিছনে সরে গিয়ে বর্তমান তার বাস্তবতার হা-মুখ ব্যাদান করল। আর একথা তো সবাই জানে যে অতীতকালের স্নিগ্ধতা বর্তমানের নিত্য বিবর্ণতায় আদৌ লভ্য হয় না। অতীতের রোজ নামচা এযাবৎ যথেষ্টই করা হয়েছে, এবার এদের এক্ষনের জীবন যাপন দেখা যাক।

হাঁটতে হাঁটতে ইস্কুলের কাছের দিঘিটার পাড়ে এসে পৌঁছোলে, হক বলল, ঘাটলায় এট্টু বওন যাউক। দিঘিটা প্রাচীন। একসময়ে বিরাট আকৃতির ছিল, বোঝা যায়। এখন মাঝখানটাতে খানিক জল, বেশির অংশটাতেই কাশ, ঢোল কলমির ঝোপঝাড়। শুধু তিন পাড়ে ঘাটলার অবশেষ দেখে অনুমান হয়, এক সময় এটি কতবড় ছিল আকৃতিতে। দিঘিটি উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত। পশ্চিম তীরে সারি সারি মন্দির। কোনোটি দেবী সিদ্ধেশ্বরীর, কোনোটি বা শিবলিঙ্গের। নিঃঝুম এই রাতে, জনমানব শূন্য, অদূরবর্তী পরিত্যক্ত প্রাসাদপ্রতিম অট্টালিকাটির অবস্থানের সঙ্গে গোটা নিসর্গ এক অদ্ভুত শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠের মেঘহীন ঝকঝকে আকাশে জোছনার প্লাবন, কী যে অর্থ হয় তার, কার জন্য এ আয়োজন?

আমাদের দুজনেরই পরস্পরের কাছে অনেক জানার এবং বলার অনেক কথা ছিল। কিন্তু শরীর ও মন এতই বিবশ এবং ক্লান্ত, যে কেউই কিছু বলতে পারছিলাম না। এখান থেকে হকের পৈতৃক নতুন বাড়ি বা পুরোনো বাড়ি সমান দূরত্বেরই। বেশ কিছুক্ষণ নির্জীব পড়ে থাকার পর, হক, বলল, না, ল' বাড়ি যাইয়া খানিক ঘুমাই। কাইল ম্যালা কাম আছে। আইজ এট্টু বিশ্রাম দরকার। সুতরাং আবার চলা। এবার ঘরের পানে। হক এখন আর চটুল নেই। কী এক গভীর চিন্তায় মগ্ন সে। জানতে চাই, কীরে টায়ার্ড?

না, ভাবনায় পড়লাম।

বিয়ের?

না। বিয়াতো অইবেই। হয়ত কাইলই, বা দুই চাইর দিন পর। মুই ভাবতে আছি শওকতের কথা। ভাবতে আছি না, ভয়ও বাসতে আছি মোনে মোনে।

ভয় ক্যান?

মোর সন্দেহ শওকত এই সেলিমেগো চক্করে আছে। আর হেডো কাইলকার লোকাল কাগজেই বোঝতে পারমু। খবরে। হয়তো বাড়ি যাইয়াও শোনতে পারি কিছু।

তোর কী মোনে অয়, শওকতও অ্যারেস্ট অইতে পারে?

অসম্ভব না। অথবা এতখুনে অইছে কীনা কেডা জানে? বাড়ি গেলে বোজতে পারমু হয়তো।

তয় তো সর্ব্বনাশ! কাইল বিয়াডা অইবে ক্যামনে?

বিয়া, যদ্দুর মোন লয়, কাইলই সারাইয়া ফ্যালান লাগবে। কারণ শওকতের খপ্পরের থিহা বুইনডারে এই সুযোগে বাচানের চেষ্টা করতে অইবে। অনেক দিন থিকাই আব্বুজানের লগে এই নিয়া বাত করার চেষ্টা করছি, কিন্তু হেনায় তালাক ব্যাপারডা একছের অপছন্দ করেন।

হেলেন?

হেলেন তো বাচইয়া যায়। ও অনেককাল ধরইয়াই ব্যাপারডা নিয়া নছিফার ধারে মন খুলইয়াই কইছে, ভাবি, মোর পোলারাতো বড় অইছে, হ্যারাও চায়না মোর এরহম অসম্মান অউক। বড়ডাতো মোরে হ্যার ধারে লইয়াই যাইতে যায়। খালি আব্বুজানে কষ্ট পাইবে বলইয়া মুই মত দিই নাই। মুই হাচাই ঐ জালিমডার হাত থিহা মুক্তি চাই।

হক যা বলল, তার সারার্থ এই যে শওকত যদি অ্যারেস্ট হয়ে থাকে বা ভবিষ্যতে হয়, আর তার কারণ যদি সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা হয়, তবে ঐ অভিযোগে হেলেন সমাজ এবং রাষ্ট্রের সাহায্য চাইতে পারে, যে সে এইরকম একজন মানুষের সঙ্গে সংসার করতে চায় না, তার কাছ থেকে নায্যত তালাক চায়। হকের বিশ্বাস, বাংলাদেশি ইসলামি সমাজ এবং রাষ্ট্র তার এই আরজি কবুল করবে। এ ছাড়াও অন্য অভিযোগতো আছেই।

বুঝলাম হক সহজ যুক্তিতে ব্যাপারটি সমাধানের চিন্তা করছে। কিন্তু এর সবটাই এখন 'যদি'র স্তরে। যদি এটা হয় তবে ওটা হবে। কিন্তু শওকত শুধু অ্যারেস্ট হলেই তো অপরাধটা প্রমাণ হবে না। আদালতে তার অপরাধ প্রমাণিত হতে হবে এবং সে এক দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। অপরাধ প্রমাণ করা, এসব ক্ষেত্রে খুব সহজ নয়। তারপর, ধরা যাক, বিচারের আগেই, তার অন্যান্য আচরণের জন্য তালাকের আর্জি হেলেন চাইল এবং সেই আর্জিকে আরো জোরদার করার জন্য এই বর্তমান অভিযোগটাও তালাকের অন্যতম কারণ হিসাবে সে দাখিল করল। সে ক্ষেত্রে কী তারা শওকতের সম্ভাব্য জঙ্গী সহচরদের বিষ নজরে পড়বে না?

এদেশের যা পরিস্থিতি, তাতে তার নিরাপত্তা কে দেবে? বাংলাদেশি ইসলামি সমাজে এই মুহূর্তে সন্ত্রাস-বিরোধী এবং সন্ত্রাসী– কাদের শক্তি এবং প্রভাব বেশি? একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে সাধারণ এবং শান্তিকামীদের সংখ্যাই সমাজে বেশি।

কিন্তু শান্তিকামীরাতো কখনোই সন্ত্রাসী বা অঘটন সৃষ্টিকারীদের মতো সংগঠিত বা সঙ্গবদ্ধ হতে পারে না। এইসব সাত সতেরো জটিল চিন্তা মাথায় নিয়ে মোতাকাকার নয়া বাড়ির উঠোনের কাছে পৌঁছোলাম। বৈঠকখানা ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। উঠোনের রাস্তায় পা রাখতে না রাখতেই দুটো জোরালো টর্চ মুখের ওপর পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফৌজি কণ্ঠে নির্দেশ 'হল্ট'! হক চাপাস্বরে বলল, শওকত বোধহয় অ্যারেস্ট অইছে, বাড়ি সার্চ হইতে আছে। ডরাবি না। কথাবার্তা, যা সয়ত্য হেয়াই কবি। আমাগো মিথ্যা কওনের কোনো কারণ নাই।

আমি এই মুহূর্তে আর সারাদিনের বন্ধুবর্গের কাছে পরিচিত সেই "স্যানে" নই। এখন আমার পরিচয় হবে আমার পাশপোর্ট, যেখানে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা আছে, আমার জাতীয়তা ভারতীয়, সুতরাং বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষমাণ ফৌজি এবং পুলিশকর্মী ও কর্তারা যদি বাংলাদেশি সন্ত্রাসীর সঙ্গে একজন ভারতীয়দের যোগসূত্র নিয়ে সন্দিহান হয়ে কিছু কূটপ্রশ্ন তোলেন, তবে যা একখানা গপপো দাঁড়াবে, তাতে আমার 'দ্যাশের বাড়ির' স্মৃতি, সত্তা এবং ভবিষ্যৎ তো পিণ্ডি পাকিয়ে যাবেই, আরো যা যা হবে, সেসব ভাবতেও অধোবস্ত্র হরিদ্রা বর্ণ হবার সম্ভাবনা। শুধু ভরসা হক। যতটুকু জানি, সে এবং মোতাকাকা এক সময়ে মুসলিম লিগ অনুসারী হলেও, সর্বসাধারণের কাছে প্রিয় মানুষ হিসাবে সম্মানিত। এখানের লোকেরা জানে যে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন না করলেও তারা তৎকালীন রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নে ধ্বস্ত মানুষদের যথেষ্ট সহায়তাই করেছে। এজন্য মোতাকাকা এবং তাঁর পরিবারের প্রভাব শুধু স্থানীয় সমাজেই নয়, জিলান্তরেও অনেকটাই। রাজনৈতিক বিশ্বাস যাই থাকুক, এরা সাধারণকে নিয়েই আছে।

বৈঠকখানায় ঢুকে দেখা গেল অবস্থা ততটা জাড্যাপহ নয়। দুজন ফৌজি এবং জনা তিনেক পুলিশ অফিসার মোতাকাকার সঙ্গে বসে আছেন। আমরা ঢুকতে একজন পুলিশ অফিসার ভদ্রভাবেই জানালেন যে তাঁরা আমাদের অপেক্ষায়ই বসে আছেন। হক জিজ্ঞেস করলো, বলেন, কীভাবে আপনেগো খেদমত করতে পারি?

অফিসার আমাকে দেখিয়ে মোতাকাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, এনার কথাই কী আপনে কইছিলেন?

হ। অর বাবায় এই হানের ইস্কুলের মাষ্টের আছেলেন। আমার বড় ভাইর ল্যাহান। ও বছরে দু বছরে এক আধবার আয়, দ্যাশের টানডা এহনও কাডাইতে পারে নায়। অর শ্বশুর বাড়িও এই খালের ওপার। তয়, এদ্যাশে আইলে শহরে পেরথম মোর এই পোলার বাসায়ই ওডে। এক লগে মেট্রিক পাশ

করছেলে। বন্ধু ছোডকাল থিহা। কাকা কী নার্ভাস হয়ে বেশি কথা বলছেন? অফিসার আমাকে ও হককে বসতে বলে, বললেন, হক সাহেবেরে তো জানি। দু একবার সাক্ষাৎও অইছে সভা সমিতিতে। আপনের পরিচয় চাচা মেঞার কাছ থিকা জানলাম। একটা ঝামেলার কামে আইছি। শওকত আনসারি নামে একজন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীরে আইজ বারটা একটা নাগাদ গ্রেপ্তার করছি আমরা। হ্যার ধারেই শোনলাম হে সকালে এই বাড়িতে আইছেলে। এ হান থিহাই ফেরার পথে মাদ্রাসায় গেছিল হে, হেইহানেই অ্যারেস্ট করি। আপনে বিদ্বান্ মানুষ, মেহ্মান। আশাকরি আপনের কাছে ভ্যালিড পাশপোর্ট ভিসা ইত্যাদি আছে।

হ্যাঁ!

একটু দেখাবেন?

আমার কাঁধের ঝোলার মধ্যে, এখানে আসলেই, এইসব জিনিস আমি মজুত রাখি। কখন দরকার হয়? পাশপোর্টটি বার করে অফিসারের হাতে দিলাম। তিনি খুব খুঁটিয়ে সেটি দেখে ফৌজি অফিসারদের একজনের হাতে দিয়ে বললেন, ঠিকই আছে। তবু ফৌজিটিও অনুপুঙ্খ দেখলেন। কতবার এদেশে এসেছি, সে সব, আসার সময়, মাস ইত্যাদি খুঁটিনাটিও দেখলন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনে তো বেশির ভাগই পূজার সময়, মানে শরৎকালে আসেন, এবার এখন এলেন? মানে ভিসা আর সফরের সময়টি দেইখা তাই মনে অইল আরকী।

আমার এক বন্ধুর কন্যার বিবাহে যোগ দিতে। হঠাৎ ফোনে জানিয়েছিল।

বিবাহ কবে?

আজই ডেট ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা গুরুতর কারণে ডেট এবং পাত্র অদলবদলের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সম্ভবত কাল অনুষ্ঠানটি দুপুরে হবে। আপাতত এরকমই ঠিক আছে।

- গুরুতর কারণটা কী কওন যাইবো? - অফিসার ঢাকাজিলা বা সংলগ্ন এলাকার লোক মনে হলো। আমি উত্তর দেবার আগেই হক্ বলে উঠল, কারণডা আমি কই যদি আপনেগো আপত্তি না থাকে। বলমু?

- বলেন না। অসবিদা কী?

হক আনুপূর্ব সমস্ত ঘটনার বৃত্তান্ত জানালে ফৌজি এবং পুলিশ মনে হলো সন্তুষ্ট হলেন। মোতাকাকা হককে জিজ্ঞেস করলেন, জোগার নাই যন্তর নাই এরহম এটটা সাদি ঠিক করলি? ইদিকে এই বিপদ।

হক একটু ঝাঁঝালো স্বরেই বলল, কীয়ের বিপদ? শওকত জিহাদি অ্যারেস্ট হইছে হেইয়া? না হ্যার কোনো দায় মোরা আর নিমুনা। হ্যার লগে বুইনের বিয়া যহন ঠিক করছেলাম তহন বোজতে পারি নায় যে হে এটটা জালিম। কিন্তু মুক্তি

যুইদ্দের সোমায় হ্যার যা পরিচয় পাইছি, তহনই হ্যারে কইয়া দেছেলাম যে ভবিষ্যতে যদি হ্যার ব্যবহার আদম জাতের ল্যাহান না অয়তো, মুই, মোরা, এমনকী হেলেনও হ্যার লগে সোম্পোক্ক রাখমু না। হেলেন জানাইয়া দেছে হ্যারে হে তালাক দেবে।

- তুই এয়া কও কী ? - মোতাকাকা খুবই অস্থির হয়ে পড়েন। আমি হককে চুপ করতে বলে কাকার পাশে বশে তাঁর পিঠে হাত বুলোতে থাকি। বলি, অস্থির হবেন না কাকা। আজ প্রথম দিনের আলাপে শওকতের যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তাতে হেলেনের মত মেয়ের ওর সঙ্গে ঘর করা কোনো ধর্ম বা ন্যায় সঙ্গত হয় না। আমি মুসলমান না হলেও, ইসলামি শাস্ত্র এবং শরিরতি বিধি নিষেধ কিছু জানি। আমি হকের সঙ্গে এক মত।

আমাদের আলাপ আলোচনা শুনে ফৌজি এবং পুলিশ অফিসারেরা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদের আর বেশি কিছু জানার আপাতত দরকার নেই। তবে এই ভাই সাহেবকে নিয়ে হক ভাই যদি একদিন শহরে আসেন আলাপ করব। না, এই 'কেস' এর সংক্রান্ত ব্যাপারে নয়। আপনার এঁদের সঙ্গে সম্পর্কটা দেখে বড়ো ভাল লাগলো। আসবেন একদিন। আল্লাহ্ হাফেজ। মোতাকাকা অতিকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে অফিসারদের বললেন, বাবারা, এই পোলাডা মোর নিজের পোলাগো ল্যাহানই। দ্যাখফেন, অর য্যান্ কোনো তক্‌লিফ্ না অয়। আপনেরা যহন অরে বিদ্যাশি কইলেন, মোর কলিজায় বড়ো ঘা লাগলে। আমরা আজাদি চাইছেলাম, পাইছেলামও ঠিকোই, তয়, হেয়ার লগে বাজইয়া যে এতো দুঃকও আইবে হেডাতো ভাবিনায়।

কিন্তু চাচা মিএগ, এইসব কথা কইয়া দুঃখ বাড়াইয়াতো লাভ নাই। যা ঘটনা সেইটাতো ঘটনাই। যাউক, অনেক কষ্ট দিলাম, রাইত অহন দ্যাড়টা। শুইয়া বিশ্রাম নেন।

অফিসার এবং অন্যান্য যারা ছিল চলে গেল। এখন আমরা তিনজন। হক মোতাকাকাকে জিজ্ঞেস করল, আপনেরে না জিগাইয়া বড় পোলার বিয়া ঠিক করছি, এথে আপনে না খোশ্ হয়েন নায়তো ?

তোর বিচার বিবেচনার উপার মোর বরাবইরই ভরসা আছেলে। কিন্তু হেই তুইইতো শওকতরে ঠিক করছিলি। আইজ দ্যাখ কী অবস্থায় পড়লাম।

একতা হাজারবার আপনে কইতে পারেন। তয় ভবিষ্যতে কেডা কোন রহম অইবে, হেডা এক আল্লায় ছাড়া আর কেউ কী জানে ? যহন ঠিক করেছেলাম, তহন শওকতরে সবদিক দিয়াই বেয়াকের পছন্দেরইতো অইছেলে।

হে কতাও ঠিক। এহানে মাইয়াডিরে দ্যাখ্‌ছোনি ? হ্যার মতামত, দুলাসাহেবের মতামত এসব জানোন লাগেনা ?

হক তখন ছেলে এবং মেয়ের পরস্পরের পছন্দের কথা কাকাকে খুলে বললে, বৃদ্ধ একগাল হেসে বললেন, হালায় তয় জুয়ান অইছে। হেতো এহনও জানে না? নাকি জানে?

না, কওয়ার সোমায় অইলে কই?

তয় কী কাইল বেয়ানে উডইয়াই শহরের বাসায় যাবি?

হ, হেরেহমইতো ঠিক করছি। কিন্তু এই শওকতি অশান্তিডা লইয়া কী করমু হেডা এটটা উদ্বাগ। তয় একতা ঠিক যে মোরগো তরফ থিহা এই কেস মোরা লড়মু না। যায়েন হুইয়া পড়েন যাইয়া। শরীরের উপার দিয়া অনেক ধকল গেছে আইজ। মোরাও ঘুমাবার চেষ্টা করি।

মোতাকাকা দুহাত বুকে রেখে, উচ্চারণ করলেন, আল্লাহ্ তোমার শোকর্ গুজার করি। দুনিয়ার বেয়াকরে মাফ করো আল্লাহ্। বেয়াকের উপার তোমার রহমত বর্ষিত হউক।

চৌদ্দ

একদিনের পক্ষে ধকলটা, শারীরিক এবং মানসিক উভয়তই বেশ বেশিই হয়েছিল। অতিরিক্ত ক্লান্তির পর ঘুম আসা সহজ হয় না। শরীর থাকে টেনসড এবং মনের মধ্যের চিন্তাগুলো প্রায় বাঁধনছেঁড়া কষ্ট শাসিত, প্রায় বুনো জানোয়ারের মতো যেন দাপাদাপি করতে থাকে। আমাদের দুজনের অবস্থাও প্রায় তাই। এখনো রাত ভোর হতে প্রায় ঘণ্টা চারেক বাকি, মানে অতটা সময় আমরা ঘুমোতে পারি, যদি ঘুম আসে। কিন্তু আসে কই? হক বলে তোর আইজ সাইদ্যের পেহার গেল। অদ্দুর থিহা আইলি, কাইল রাত্তিরেতো আলফাল চৈদ্দকত্তার প্যাচাল পাড়ইয়া ঘুমাইতে দিলাম না। নছিফা কইছিলো, মানুষটারে এ্যাটটু বিশ্রাম নিতেও দিলেন না, বেয়ানে উডইয়াই ছোডলে। তয়, দ্যাখফেন, দুফরইডায় য্যান এ্যাটটু আরাম করইয়া হালাবৌগো আল্লাদ সোহাগে কিছু বিশ্রাম পায়েন। আমি জানতে চাইলাম, তোর বৌ তো দেহি মরিয়ম বিবি। তুই? মানে তোকে এবারে আমি এখনো চিনে উঠতে পারিনি এখনো। কলেজ লাইফে তোর পরিবর্ত্তনটা, মানে ইস্কুল জীবনের তুলনায়, ভীষণ মৌলবাদি ঘেঁষাই ছিল, যতটা মনে পড়ে। তুই খুব অসহিষ্ণু ছিলিস। হিন্দু জাতটার ওপর খুব রাগ ছিল তোর।

তমো কিন্তু তুই কাইল রাইত নয়টার সোমায় মোর বাসায়ই উডলি? কেমন?

হ্যাঁ। কারণ, মোতাকাকার ছেলে আজ্রাইল হবে না, এ বিশ্বাসটাও যদি না থাকে, তবে এদেশে আর আসা উচিত হবে না। এমনই আমার মনে হয়েছিল। তুই তখন, মানে, কলেজ লাইফের কথা বলছি, যখন আইয়ুব খান সাহেব এদেশের সার্বভৌম নায়ক; অসম্ভব অচেনা হয়ে যাচ্ছিলি। আমরা বন্ধুরা, বিশেষত মাণিক, যে মুক্তি যুদ্ধের সময় নিহত হয়েছিল নিজের দলের হাতেই এবং শহীদ পদবাচ্যও হয়নি, তার মৃত্যুটাতো আমি ভুলতে পারি না।

মাণিকের লইগ্যা মোর দুঃখ আফশোস এক দবিয়া। তমো কই, ও রাজনীতির মানুষ আছিলো না। হেসব ম্যালা কতা, ঘুমাবি না?

না। ঘুম আসছে না। আমার অনেক হিসাব মিলাবার প্রশ্ন আছে। জানি, আজকের তোদের পারিবারিক বিপর্যয়ের এই সমটায়, সেসব আলোচনা খুবই

অযৌক্তিক এবং অন্যায়। তবু জিজ্ঞেস করি, তুই কী আমাদের কলেজ জীবনের দিনগুলিতে ভুল পথে যাচ্ছিলি না?

হ্যাঁ এবং না। কিন্তু 'স্যানে', তোরে জিগাই, ঐ সোমায়ডায় তোর আর মোর, অবস্থানগত পরিস্থিতিডা কী আছিলো, হেডা মনে আছে? তোর তহন এক অবস্তা, মোর অন্যরহম। অথচ দুইজোনেরই টিকইয়া থাকতে অইবে। তুই ওপারে যাইয়া, এইসব অবস্থার থিহা নিস্কিতি পাবি। মুই, নিচের তলার মোছলমান, আতরাফ, জোলা, মুই ক্যামনে কী করি, ক্যার দুয়ারে দাড়াই, হেকতাডা ভাবছো? হেয়া কিন্তু তোরা উচা জাইতের হিন্দুরা ভাবনায়। মুসলিম লিগ একটা আশ্রয় তহন। তুই কী জানো, ভাষা আন্দোলনেও মুসলিম লিগ অচ্ছুৎ অইলো ক্যান? অথচ হেই আন্দোলনের অধিকাংশই পাকিস্তান চাইছিল আবার ভাষা আন্দোলনেও সামিল আছিলো?

জানি কিন্তু মেলাতে পারি না। আমি ওয়াহিদুল হককে জানি, যিনি একদা মুসলিম লিগের সমর্থক ছিলেন বলে, আমার সামনে কেঁদেছিলেন। তার সাথে আমার গভীর আত্মীয়তা ছিল। বলেছিলেন, না, বুঝে হলেও, ভুল পথে গিয়েছিলামতো।

আল্লাগো আল্লা, তুইতো হেলে অনেক কিছুই জানো। তমো কই, মুসলিম জাহানের অ্যাটটা নিজস্ব দ্যাশের প্রয়োজন আছিল, পাকিস্তান হাসেল ছাড়া, হেডা কিন্তু পুরা অইতো না, বোজঝো কথাডা?

হকের কথায় আমি নতুন ভাবনায় ভাবিত হলাম। কিন্তু, আসল সমস্যার সমাধান কী, এই মর্মে আমার নির্ঘুমতার উত্তরতো পেলাম না। অথচ এবার ঘুম দুচোখ ভেঙে আসছিল। হককে সে কথা বলতে বললো, যতক্ষণ পারো ঘুমাইয়া ল। তয় মোরা তো এ্যাটটা ক্যাচালে পড়ছি, দ্যাখথেই পাইতাছো, কাইল একবার হেলেনের লগে তোর যা মোনাসিফ, কতা কইয়া যাইস, আর আমারেও জানাইস। মোরা কিন্তু তোরে পরিবারের থিহা আলাক ভাবি না। এবার ঘুমাবার চেষ্টা কর।

কিন্তু চেষ্টা করলেই কী ঘুম আসে? আসে না। বললাম, হক, ঘুম বোধহয় আজ আর আসবে না। অদ্ভুত ব্যাপার ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু ঘুমোতে পারছি না, ছেড়েদে, বরং কথাই বলি। আচ্ছা, যীশুদা কোথায় আছেরে? আমি বিষয় পরিবর্তন করার চেষ্টা করলাম। হক খুব ক্ষুব্ধ ভাবেই যেন জবাব দিল,

ক্যান, হ্যারকথার দিয়া তোরগো দরকারডা কী?— মানে, এখানে তার কিছু আক্ষেপের কথা আছে। মানে, এতদিন পর মানুষটার কী গতি হয়েছে, সে কথা জানার দরকারইবা কী। কেনো এই প্রশ্ন? বললাম, দেখ, আমি তো কিছুই জানি না, মানুষটার কথা কিন্তু খুবই মনে পড়ে। জানতে ইচ্ছা করে, সন্ন যীশুদা এরা

আছে না নেই, যদি থাকে, কোথায় আছে, কেমন আছে, বেঁচে আছে কীনা। হক বললো, বাঁচইয়া আছে, তয় হ্যারা তোরগো হিন্দু ভদ্দরলোক সোমাজের কেউনা, মুসলমান সোমাজোরও কেউনা। হ্যারা হ্যারগো মতন আছে। কেউ জাইত পাইত লইয়া টালাইলেও হ্যারা টলবে না। ঐ আছে একমতন। তয় একতা কইতে পারি ভাল আছে, বেশ আছে।

এমন কোনো সহজ উপায় এদেশে হয়েছে যেখানে 'জাইত পাইত ছাড়া মানুষেরা বসবাস করে? বেশ থাকে? একথা আমার জানা নেই। তারা তাহলে কোন্ সমাজের? হক বলল, হ্যারা মাতুযা সোমাজে যোগ দিছে। মতুয়া জানোতো?

হরিবোলা? হরিচান্দ ঠাকুরের দল?

হ' ও কওয়া যায়, নাও কওয়া যায়। এহেক সোমায় এহেক তাবে আছে। হ্যারা কহনো হরিচান্দের হরিবোলা। খালি নাচে আর গায়। হ্যারগো কোনো জাইত ধম্ম নাই। আবার কহনো মারফতি, কহনো আবার কিষ্টমন্তরি। হয়তো মাইজ ভাণ্ডারিও।

হক যা বললো, সংক্ষেপে তা এই যে, রায় বাড়ির আশ্রয়টাও সন্নর পক্ষে নিরাপদ হয়নি। জেডামণির তখন মরণাপন্ন অবস্থা। প্রতিবেশী অধীর চৌধুরী তখন দেশে একা থাকেন। তিনি সন্নকে আশ্রয় দেবার নামে নিয়ে গেলেন। কী? না ও আমার লইগ্যা এটটু রাঁধবে বাড়বে, অর মতন থাকবে। মায়নাকড়ির কথা নাই। একটা আশ্রয়তো পাইবে। খাওনের ভাবনাতো নাই। সবাই ভাবল, তাইতো আপাতত, থাকুকনা এভাবে। তবে অধীরের ওপরে বেশির ভাগ লোকেরই তেমন বিশ্বাস ছিল না। তাকে প্রায় সবাই একজন যৌন-ধান্দাবাজ বলেই জানতো। কিন্তু অন্য উপায় ছিল না বলে, কেউ কিছু বলেনি। কে আর এরকম একটা দায়িত্ব নেবে? ভেবেছিল, আপাততো থাকুক—পরে দেখা যাবে। কিন্তু অধীর তার শেষ বেলাকার শেষের স্রোতে বেসামাল হলো। সন্নও বাধ্য হয়ে দেহধর্মে ধরা দিল। এ নিয়ে হৈচৈ ও হলো। আর একথা কী চাপা থাকে? গ্রাম গাঁয়ের ব্যাপার, অনেকেই জানলো। সন্নর চৈতন্য হতে সে পালাল। পালাবে কোথায়? সেই যীশুদা। যীশুদা তখন সন্নকে বাঁচাবার তাগিদে, সমাজ সংস্কার সব বিসর্জন দিয়ে তাকে বললো, তাইলে আয় মোরা মোগো মতো থাহি।

- এই সময়টাতেই ঐ ধোপাদের ভূতের বাড়ি তাদের আশ্রয় হয়েছিল, যার কথা ধলু আমাকে বলেছিল। কিন্তু সে আশ্রয়ও গ্রামীণ সমাজে প্রকৃত আশ্রয় হয় না, হয়ও নি। সমাজ তাদেরকে ত্যাজ্য করলো। তাতে অসুবিধে ছিল না। সমাজের আর আছেটা কী? কিন্তু সুবল সখি শওকতের সাহায্যে একরাতে হামলা করলো ঐ ভূতের বাড়িতে। সন্ন আবার ধর্ষিতা হলো এবং তা, যীশুদার

চোখের সামনেই। যীশুদাকে তারা, অর্থাৎ ধর্ষকরা বেঁধে রেখেছিল। তারপর একটা পুলিশি হুজ্জোত হয়, সুবল সখিরা সবাই ধরা পরে। সন্ন সুবলকে চিহ্নিত করেছিল এবার। সেটা পুলিশের সামনেই। পুলিশ আগের বারের কেসের সাথে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছিল এবারের ঘটনার। সুতরাং নিরঞ্জনেরা অ্যারেস্ট হলো। পুলিশের জেরায় সে একবার করেছিল সবটাই। যাহোক, শেষতক, তাদের সাজা হয়েছিল দশ বছর করে। তারা এখন কোথায় কেউ জানে না।

ধর্ষিতা, লাঞ্ছিতা সন্নকে নিয়ে যীশুদা, তারপর গ্রাম ছেড়ে, বাড়িঘর বিক্রি করে। আশ্রয় নিয়েছিল বরিশাল শহরে। সেখানে এক অজানা পল্লিতে ঘর বেঁধেছিল তারা। একমাত্র হক জানতো তাদের অবস্থান। কারণ, ঐ ভুতুড়ে বাড়ির হুজ্জোতের পর, যীশুদাদের সহায় হিসাবে হক আর ধলু ছাড়া আর কেউ ছিল না। এমনকী মঞ্জুদাও না। তাদের নতুন জীবনের হদিস একমাত্র হক আর ধলুই জানতো। আর কেউ না। হব্বোলাদের জাত পাতের ব্যাপার নেই। তারা শুধু হরিবোল বলে একে অন্যকে গ্রহণ করে। এর অনেক ব্যাখ্যা, অনেক বৃত্তান্ত, কিন্তু আসল ব্যাপারটা হলো সমাজে পতিত মানুষের উদ্ধার। মানুষ সামাজিক একটা আশ্রয় পাবে। মহাপ্রভুতো এই চেয়েছিলেন তাঁর বৈষ্ণবী ধারায়। সে কারণে হরিচান্দও মহাপ্রভু।

মহাপ্রভুর ধারাটাতো হব্বোলাদেরও মূলাধার। কিন্তু হক অতসব ভাবেনি। সে চেয়েছিল, এইসব সমস্যার মধ্যের থেকে যীশুদায়েরা একটা অন্তত সমাধানে পৌঁছোক। হব্বোলা সম্প্রদায় সেই ব্যবস্থা তাদের দিয়েছিল। তদবধি তারা সেইভাবেই জীবনযাপন করে চলেছে। সংক্ষেপে গোটা ব্যাপার এই।

তারা ভাল আছে, বেঁচে আছে, তাদের দুটি সন্তান মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে - এই সংবাদ আমার কাছে এক অপূর্ব আশার আনন্দ এনে দিল। হককে বললাম, সকাল থেকে এইটুকু জানার জন্য আমি বড় আঁকুপাঁকু করছিলাম। এতক্ষণে একটা শান্তি হলো। এবার বল, কাল আমাদের কর্তব্য কী? হক বললো, কাইল তুই একবার হৌর বাড়ি যাইয়া দ্যাহা দিয়া আয়, হ্যারা নিচ্চয়ই খবর পাইছে যে তুই আইছো। সাত-পাচ ভাববে হ্যানে। হ্যার পর কায়দা করইয়া মোরে এটটু সোমায় দেতে অইবে। বোজতেই পারতে আছো, মোর মুশকিলডা কী কেসেমের। তোর সাহায্যডা দরকার। তুই কাইল হৌর বাড়ি দ্যাহা দিয়া, এ্যাটটু সোমায় লইয়া হেলেনের লগে এ্যাটটু বাতচিত কর। মুই ওদিক সামাল দিয়া দুফইর নাগাদ আইয়া পড়মু, বোজজো?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ না - হ। তুই এহেক সোমায় এহেক রহম কথা কইতে আছো ক্যান্?

মানে?

মাইনে। কহনও এহানের আমাগো ভাষায় কথা কইতে আছো, আবার কহনো কইলকাতইয়া ভাষায়। তহন য্যান তোরে পরপর মোনে অয়।

আচ্ছা, এহন থিহা আর হেরহম অইবে না। আসলে অইব্যাস বোজজোতো। অইব্যাস। অনেকদিন ধরইয়া ও দ্যাশে আছিতো। ধলুও বলছিল কথাটা।

ও অইব্যাসটা ছাড়লে ভাল অয়। ওডা একছের ভাল ঠেহিনা।

সত্যিই তাই। আমি একেক সময় একেক ভাষায় কথা বলছি। খেয়ালও করিনি। এখানকার ভাষায় কথা বলতে তো আমার কোনো অসুবিধে নেই। তাহলে কেন 'কইলকাতার ভাষা' এসে যাচ্ছে? অন্যায়। তবে সেটা সামাল দেওয়া আমার পক্ষে তেমন অসুবিধের কিছু নয়। এখন অসুবিধে যেটা, সেটা হলো, কাল আমি হেলেনের সঙ্গে কী কথা বলবো? হক এতবড়ো দায়িত্বটা আমার ওপরে দিল। প্রায় ছবছর আগে ওকে দেখে গিয়েছিলাম। সেটা ছিয়াশি সাল। এখন বিরানব্বই। এর মধ্যে কত ঘটনাই না ঘটেছে। সেবার শওকতের সঙ্গে আমার আলাপই হয়নি। কারণ, সে তখন বোধহয় এটটু গা ঢাকা দেওয়ার অবস্থায় ছিল। হেলেন এবাড়িতেই ছিল। কথা হয়েছিল অনেক, কিন্তু শওকতের বিষয়ে নয়। ও কিছুই বলেনি। শুনিওনি কিছু। এখন তার সাথে কী ভাবে এতসব নিয়ে আলোচনা করবো, বুঝতে পারছি না। সব থেকে বড়ো কথা, তালাকের বিষয় নিয়ে ব্যাপার।

ঘণ্টা দেড় দুয়েক হয়তো ঘুমিয়েছিলাম। হকের হাঁক ডাকে উঠে পড়তে হলো। ও বললো, মুই যাই। তুইও হৌর বাড়ি এটটু দ্যাহা দিয়া আয়। দুফইরে জব্বারের ওহানে দ্যাহা অইবে। আর যা কইলাম। হেলেনের লগে কথা বাত্রা কইস বুজাইয়া, তালাকের কথাডা মাথায় রাহিস, বোজজো?

কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না মেয়েটাকে আমি কী বলবো? তালাক নিয়ে কী ওর সঙ্গে কোনো কথা আমি বলতে পারি? কতটুকুন বয়স থেকেই না ওকে দেখেছি। হায়! মুসলমানদের সমাজ জীবন নিয়ে কোনো দিন কিছু ভাবনা করার প্রয়োজন হয়নি। কারণ, তাদের সঙ্গে ব্যাপক মেলামেশার সুযোগ বা প্রয়োজন তো সেকালে ছিল না। স্বাভাবিক আগ্রহও ছিল না। ইস্কুলে যাতায়াতের পর থেকে যেটুকু মেলামেশা সম্ভব হয়েছিল। তাও খুবই সীমিত দু একটি পরিবারের সহপাঠিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব-র খাতিরে। একী এক আতান্তরে এসে পড়লাম। আমার একটা অহংকার ছিল যে, ছোটবেলা থেকে এখানে মানুষ হয়েছি, এদের বিষয় আমি অনেটাই জানি। কিন্তু কার্যগতিতে দেখলাম কিছুই জানি না প্রায়। সম্পূর্ণ এক অজানা অনাবিষ্কৃত মহাদেশ যেন এদের সমাজ। হিন্দু সমাজের জটিলতা বহুল আলোচিত, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল অবশ্য, কিন্তু মুসলমান সমাজে যা

দেখছি এখন। তাতো শুধু জটিলতা নয়। এযে এক অসহায় বন্ধন দশা, এক পেছন পানে চলার হুড়োহুড়ি। শিক্ষাও সেখানে সামনের রাস্তা যেন পরিষ্কার করে না। সেখানে সব কিছুই যেন পূর্ব নির্ধারিত। তার কোনো প্রায়োজনিক রদবদলের রাস্তা নেই, যদি শরিয়ত তা অনুমোদন না করে। আমি নানান চিন্তা মাথায় নিয়ে বড়ো অসহায় বোধ করতে লাগলাম।

শুয়েই ছিলাম। হক বেরিয়ে গিয়েছিল। আমার শ্বশুর বাড়ি এখান থেকে খুব দূরে না। একটু পরে গেলেও চলবে। আজকে দিনটাতে কীভাবে কী হবে সেইসব নিয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় হেলেন এক কাপ চা নিয়ে ঢুকলো। 'দাদায় ওডলেন নাকী?' - এরকম এক স্বাভাবিক স্বরে সে কথা বলবে এমন ভাবিনি। বললাম, আয়। বয়। আছো কেমন?

যেমন দ্যাখতাছেন।

দ্যাখলাম আর কই? কাইল থিকা তো নানান হুজ্জুতে সময় কাডলো।

পোলাগো খবর ক।

পোলারা ভাল আছে। কাইল যহন পুলিশ মিলিটারিরা আইলে, টেলিফোনে বেয়াক হ্যারগো কইলাম। বড়জোনে ছাফ্ কইয়া দেলে, তালাক দেও। অমানুষের লগে থাহনের দরকার নাই। অনেক অইছে, এবার ছ্যাক্ দেও।

তুই কী ভাবছো?

তালাক। হেয়া ছাড়া আর রাস্তা দেহিনা। পোলাগো ভবিষ্যৎ ভাবতে-অইবে।

হ্যারে মানুষটা সয়ত্যই অতডাই খারাপ?

- হেয়ার থিহাও এ্যাটটু বেশি। আপনেরে বেয়াক কতা কইতে পারমু না। দাদা ডাকিতো। তা যাউক হেকথা। কৃষ্ণা আছে কেমন? পোলাপান কয়ডি হ্যার? মোর কথা মনে আছে?

কৃষ্ণা আমার বোন। ওর সহপাঠিনী ছিল। খুবই বন্ধু দুজনে। তারও জীবনটা খুব সহজ হয়নি। হেলেনকে তার দুর্দশার কথা বলতে সে খুব দুঃখিত হয়। বলে, আমাগো ক্যারও নসিবে কী এ্যাটটুও শান্তি ল্যাহে নায় আল্লায়? মোরা কী এমন পাপ গুনাহ করছিলাম? মানুষের, বিশেষ করে মেয়েদের জীবনের এই দুর্ভাগ্য নিয়ে কী বলা যায়? আমি একজন পুরুষ, আমিও কোনোনা কোনো ভাবে হয়তো অনেক অন্যায়ই পরিবারের মেয়েদের ওপর করে থাকি, যে বিষয়ে আমি ওয়াকিবহাল থাকি না। যারা এসব সয়, মানে, যাদের এসব সইতেই হয়, তারাই জানে, যাতনাটা কী? প্রেম বা দৈহিকতা এর পুরোটা দূর করতে পারে না। হেলেন আর কৃষ্ণার আমার সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তুল্যমূল্য। কারণ, সেই সম্পর্ক এমন একটা বয়সের এবং সময়ের যখন বোন বলতে একটা ধারণা প্রায়

ব্রাহ্মণের কাছে যজ্ঞোপবিতের পবিত্রতার মতো নিষ্কলুষ ছিল। একথা মুসলমানের আজানের ধ্বনির মতো শান্তিবাহী এবং হিন্দুর গায়ত্রীমন্ত্রের মতো গভীর ও স্নিগ্ধ। হায়, মানুষ যে কোথায় আশ্রয় পাবে!

'পোলায় কয়, অসোম্মান অনেক সইছো, এবার হ্যার গন্তে হ্যারে পড়তে দেও। হ্যার রাস্তাডা না ধম্মের, না মনুষ্যত্বের। ইসলাম আর যাই কউক, ক্যাওরে অমানুষ অইতেতো কয় নায়। হে ধম্মডারে ফন্দি হিসাবে নিছে। সুতরাং হেয়ার ফল হে ভোগ করবে।' হেলেন নিবাত নিষ্কম্প ভাবে এইসব কথা বলে যায়। আমি জিজ্ঞেস করি, তার ওপর তোর কোনো টানই কী আর নাই?

- না। বহুকাল ধরইয়াই নাই। খালি আব্বুজানেরে দুঃখ দিমুনা বলইয়া দাতে দাত কামড়াইয়া আছেলাম। আর না। আমি মন ঠিক করইয়া ফ্যালাইছি দাদা।

কী ভীষণ বিতৃষ্ণার জন্ম হলে, একটা মেয়ে, তার স্বামী, যে তার সন্তানের জনকও, তাকে এভাবে ত্যাগ করতে পারে মনে প্রাণে, সে কথা ভেবে আমি যারপরনাই বিষণ্ণ হলাম। হেলেন বলল, আপনে ভাববেন না, আমি শক্তই আছি। আপনে কাম সারইয়া আয়েন যাইয়া। ইদিকে সাদির ব্যাপারডা আছে, অনেকটাই বোধহয়, আপনারই দ্যাখথে অইবে। ভাল অইছে যে আপনে আইছেন। এই সোমায় আপনের আওনডা থ্যান্ আল্লার বরকতের ল্যাহান।

পনেরো

গ্রাম গাঁয়ে শ্বশুর বাড়ির পাশের গ্রামে বন্ধু গৃহে রাত কাটালে, শ্বশুর বাড়ির লোকেদের ভীষণ মেজাজ বিগ্‌ড়োয়। তার উপর দুদিন হলো এসেছি। তাঁদের একটা খবর তক দেওয়া হয়নি। কথাটা মনে পড়িয়ে দিল হেলেন। ভেতরে যাবার আগে বলে গেল যে সে নাশ্‌তা আনতে যাচ্ছে। হাতুমুখ ধুয়ে একটু তাড়াতাড়ি 'নাশ্‌তা পানি' করে যেন ওদিকের ব্যাপারটা সামাল দিই। ভাইপোর বিয়ে বলে কথা। মেজভাই একা পারবে কেন ?

শাশুরি ঠাকরুণ বিবেচক মানুষ। তাছাড়া ছোটবেলা থেকে দেখেছেন। সুতরাং সব খবর তাঁকে বলতে প্রশংসাই করলেন। বললেন, তয় তুমি নাইয়া ধুইয়া, তাড়াতাড়ি একটু খাইয়া, দু'ফইর তামাইত বিশ্রাম করো। হ্যারগো এই রহম একটা বিপদ। তোমারে হ্যারা ভালবাসে। আইয়া পড়ছ যহন, বিপদে, কাজে কম্মে পাশেতো দাড়াইতে অয়। গ্রাম জীবনে এই একটা ব্যাপার এখনও আছে এবং এই মনোভাবটা আমার হৃদয়কে খুবই নাড়া দেয়।

থাক্‌গে, বুড়ি ছোঁওয়া ব্যাপারটা হয়েছে। এখন যথাআদিষ্ট কর্ম করতে সমস্যা নেই। তবে বিশ্রামটা জরুরি। না হলে, একবার জব্বারের ওখানে গিয়ে পড়লে কতক্ষণে ফুরসৎ হবে, বা কী অবস্থায় গিয়ে পড়ব কে জানে ? দেশের বাড়িতে যতবার এসেছি। এরকম আতান্তর অবস্থায় কখনো পড়িনি। যখনই এসেছি, একটা উৎসব, পুনর্মিলনের আড্ডা, দাওয়াত বা নেমন্তন্ন খাওয়া, পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন ইত্যাদির উষ্ণতায় দিনগুলো কাটিয়ে গেছি। ফেরার সময়ে সবাই চোখের জলে বিদায় জানিয়ে বলেছে। আবার কবে আবা ? আওন যাওন বন্দো করইও না। এবার এসেই পড়লাম এরকম এক অবস্থায়।

আদোকাঠির খালের ওপরে ব্রিজটাতে দাঁড়িয়ে স্মৃতিতে এলো সন্ন, যীশুদা, নিরঞ্জনদের পুরোনো কথা। যীশুদার একরোখা, একতরফা প্রেম, সন্নর দূরদৃষ্ট, লাঞ্ছনা, শেষ পর্যন্ত তাদের মিলন। তা যেভাবেই হোক। এর মধ্যে যখন জব্বারের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে এইসব আশা-নিরাশা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ এবং

পুনরায় স্বপ্নের উদ্ভব, তৎসহ হেলেনের জীবনে ভাঙচুরের মাধ্যমে সমস্যার ওরকম একটা নিষ্পত্তি, এই সবই যেন আমাকে কীরকম এক বিমূঢ় অবস্থার মধ্যে ফেলল। আমি এই অঞ্চলের মানুষদের যে ভাবে চিনতাম এবং বিশ্বাস করতাম যে এদের আমি সত্যই চিনি এবং জানি, এবারে এসে, এই দুটো দিনেই মনো হলো, না, এখানে অনেক রূপান্তর এদের মধ্যে ঘটে গেছে। প্রাক্তন সরলবর্গীয় অবস্থাটার মধ্যে যেন একটা জটিল সরীসৃপ কখন ঢুকে গেছে। সেটা এখানকার হিন্দু-মুসলমান দুই সমাজের আবহমান কালের দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং ভালবাসাবাসি বা ঘৃণা বিদ্বেষী ব্যাপারের মতো সরল তরল নয়। এই জটিলতাটা আমাদের প্রজন্মের কাছে খুব সহজবোধ্য নয়। যাঁরা আজকে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে গল্প উপন্যাস বা প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখতে গিয়ে, একদার প্রায় অসম্ভাব্য এক সুসম্পর্কের সুসমাচার লিখে তৃপ্তি পান এবং ভাবেন, একটা চমৎকার অসাম্প্রদায়িক দয়িত্ব পালন করা হলো, অথবা, একই ভাবে উভয়ের সমাজের মধ্যের বিপরীত সম্পর্কের কথা আলোচনা করে মনে করেন প্রকৃত ইতিহাসকে বিবৃত করা গেলো, তাঁরা দুপক্ষই বোধহয় একই রকমের মোহগ্রস্ততায় ভোগেন। যাহোক, অত বড় গম্ভীর বিষয়ে কিছু বলার মতো হিম্মৎ বা বিশ্লেষণী ক্ষমতা আমার নেই বলে, আমি ঘটনাগুলো যেমন দেখছি, তেমনি বলছি। কারণ, দেশটা ভাগ হয়েছে ষাট বছরেরও অধিক কাল আগে। তা নিয়ে হুতাশ করে, আজ আর কোনো ফায়দা হবে না। এর দোষে এই হয়েছে, তার দোষে সেই হয়েছে—এসব কপচে গবেষণাপত্র ক্রমশ স্তূপীকৃতই হবে। তার মধ্যে আরো অনেক সাপের বাসাও হয়তো হবে, তাতে এখনকার সমস্যার কিছু উন্নতি হবে বলে মনে হয় না। জমি এবং কৃষি নির্ভর এই গ্রামীণ সমাজটার যেন কক্ষচ্যুতি ঘটেছে। হয়তো সেটাই এই সমাজের স্বাভাবিক পরিণতি অথবা নিয়তিও বলা যায়। অথবা আমার সবাই কী এই অবস্থায় দেশটাকে পৌঁছুইনি ?

আমার বর্তমান সমস্যা এই যে, এক্ষণের এই গ্রামীণ মানুষগুলোর জীবনের জটিলতাটা ভিন্ন ধরনের এবং আমার কাছে তা অপরিচিত। দেশ ভাগ করার সপক্ষে, যদি সদিচ্ছার দিকটির কথা বলা হয়, বলতে হবে, সেটি হল, একটি গ্রামীণ আবদ্ধ দশা থেকে সেখানের মানুষগুলোকে একটা স্রোতাভিমুখী করা। এই স্রোতটা যদি যথার্থ অর্থ এবং সমাজ-রাজনৈতিক ধারায় প্রবাহিত হতো, তবে তার সুফল হয়তো হতো বহুমুখী। কিন্তু তাতো হলো না। অথবা যদি হতোও, বাঙালি সমাজের কতোটা কী কল্যাণ হতো, সেসব প্রগাঢ় গবেষণার বিষয়। আপাতত প্রাক্তন সেই আবদ্ধ দশা থেকে মুক্তি পেয়ে, অনেক রক্তের বিনিময়ে বাঙালি কী পেয়েছে, তাই দেখা যাক।

যাঁরা বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের নিয়ে লেখালেখি বা আলোচনা করেন, তাঁদের মধ্যের সিংহভাগ জনেরাই প্রাক্তন গ্রামজীবনের সুস্থিতির কথা নিয়েই সুখস্মৃতির রোমন্থন করেন। এঁরা বেশির ভাগই ভূমি এবং চাকরি নির্ভর মধ্যবিত্ত মানুষ। তাঁদের নস্টালজিয়াকে, বিশেষত, যারা ভূমিকে আশ্রয় করে এখানের সমাজ তৈরি করেছিলেন একদা, তাঁরা প্রায় সার্বজনীন ভাবেন। যেমন, এখানে এসে পুরোনো রাস্তাঘাটের বাড়িঘরের বেহাল দশা দেখে, সেসবের একদার জৌলুসের কথা ভেবে আমি মনমরা হচ্ছি এবং ভাবছি যে ঐ মন্দিরটা একদিন কত সুন্দর ছিল, ঐ জমিদার বাড়ির অট্টালিকাটা, আহা, কী ছিল, আর কী হয়েছে বা, এরকমই নানান অনুষঙ্গ, যা একদা ছিল, এখন নেই, অথবা এমন অবস্থায় আছে, যা নিতান্তই দুঃখদায়ক। এটা ভূমি নির্ভর মানুষদেরই নস্টালজিয়া। সাধারণ চাষি থেকে মহারাজাধিরাজ যাঁরা ভূমি নির্ভর, তাঁরা এই অবস্থার শাশ্বত স্থায়িত্বে আস্থাবান এবং এই অস্তিত্বকে তাঁরা যাবচন্দ্র দিবাকর অচল অটল রাখতে চান। এজন্য এই নস্টালজিয়া। চাক্‌রি বা ব্যবসা যাদের পেশা ছিল। তারা কিন্তু এই নস্টালজিয়ায় তেমন আক্রান্ত নন। আবার এও বিচার্য- ঐ সব যখন স্ব-মহিমায় ছিল, তখন জব্বারদের বা তাদের পূর্ব-প্রজন্মের মানুষদের অবস্থা কেমন ছিল? তারা কী প্রয়োজনীয় সব উপকরণ নিয়ে তাদের গেরস্থালিতে সচ্ছল ছিল? ঐ ধ্বংস প্রায় জমিদার ভবনটিতে যে সব দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাবুরা বারো মাসে তের পার্বণের জাঁকজমক করতেন, তাঁরা কী জব্বারের মতো মানুষদের দুঃখ দুর্দশায় আদৌ বিচলিত বোধ করতেন? তাহলে জব্বারেরা সেই স্মৃতিতে আমাদের মতো বিচলিত বা স্মৃতিকাতর হবে কেন? তবুও অতীত-চারিতার একটা স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে, মানুষ প্রাক্তনকে বড়ো ভালবাসে। কিন্তু বিচারে বসলে তো মানতে হয় যে দেশটা ভাগ হয়েছিল বলেই জব্বারের, হকের বা তাদের চাইতেও মুসলমান গোষ্ঠীর নীচের তলার মানুষেরা বা হিন্দু সমাজের নমশূদ্র সমাজের যারা এখনো এখানে আছে, তারা, আজ যে জায়গাটায় আছে, সেখানে পৌঁছোতে পেরেছে। সাধারণ মুসলমান ব্যবসায়ীদেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

দেশ ভাগ বা পরবর্তী প্লবতা সর্বসাধারণের জীবনেই গভীর দুঃখ ডেকে এনেছে একথা মিথ্যে নয়। কিন্তু আজ যে আমরা জাতধর্ম নির্বিশেষে জব্বারের মেয়ের বিয়েতে এক জায়গায়, একসঙ্গে মিলিত হয়ে, খাওয়া দাওয়া, হাসিঠাট্টা ইত্যাদি করতে পারছি, তা কী একটা মহৎ অর্জন নয়? এরকম অজস্র অর্জনের দৃষ্টান্ত প্লবতার সময়ের অসীম দুঃখের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। যেসবের মধ্য থেকে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের ছবি আমরা পেতে পারি। সেসবের জন্য হয়তো মূল্যটা অনেক বেশিই দিতে হয়েছে। কিন্তু সেটা তো ইতিহাসের নির্বন্ধ। তাছাড়া মূল্য দেওয়ার পিছনে তো হাজারটা কারণ ও রয়েছে উভয় সমাজেরই।

এখন যে জটিলতার মধ্যে এসে পড়েছি এবং ভাবছি যে এই অবস্থাটা এখানে মানায় না। তাও সঠিক ধারণা নয়। জগতের সর্বত্র সব কিছুই ক্রমশ জটিল হবে এবং একমাত্র এই অঞ্চলটিই সরল থাকবে, যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম একদিন, এরকম আশা করাটাই এক ধরনের বদ্ধ চিন্তা। শওকত বা তার মতো লোকেরা সন্ত্রাসী হবে না, হক একদিন লিগের রাজনীতি করতো বলে, আজকের পাকিস্তান পন্থীদের সঙ্গে সহমত হবেই, যীশুদা-সন্ন প্রাক্তন গ্রামীণ সমাজ শাসন অনুযায়ী যে যার জাতেই থেকে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বাঁচতে পারবে না, বা, হেলেন তার স্বামীকে নষ্ট স্বভাবের এবং সন্ত্রাসী যোগাযোগের কারণেও পরিত্যাগ না করে, তার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করবে, বা যা কিছু স্থিতিশীলতার পরিপন্থী সেসব ঘটবে না, এরকম হওয়াটাই কী আশা করেছিলাম আমি? না। ভাল মন্দ দুরকমেই এ অঞ্চলের অনেকটাই রূপান্তর হয়েছে। শুধু আমার তৃপ্তি হতো, যদি দেখতাম যে মানুষের, বিশেষ করে গ্রামীণ গরীব গুর্বোদের জীবন যাত্রার মোটামুটি হাল ফিরেছে। যে সবুজ, সজীবতা একদিন এখানে ছিল, অকারণে তার বিলুপ্তি ঘটানো হয়নি। কিন্তু সে তৃপ্তি পাচ্ছি না। মানুষেরা এখানেও ভাল নেই। এটাই আসল কথা। কিন্তু মানুষেরা কোথায় ভাল আছে এই গ্রহে?

সারা দুপুর মরার মতো ঘুমিয়ে যখন উঠলাম, দেখি মাথার কাছে একটা চেয়ারে হক বসে আছে। বললো, আইছি খানিক আগে। কাকিমায় চা খাওয়াইলেন। পোলার বিয়ার কথা কইতে আছেলাম এত্খুন। তোরে উডাইলাম না ইচ্ছা করইয়াই; তয় ঘুমডায় তোর উপকার অইবে। রাইতেতো আবার উদিগে কাজকম্ম আছে।

পোলায় আর হ্যার মায় কয় কী? —আমি আবার পুরোনো ভাষায় কথা বলি। হক বলে, আর কৈলোম ভাষা পাল্ডানো যাইবে না। এইরহমই চলবে। নাইলে বেয়াকে কৈলোম পর পর ঠাওড়াইবে। কী কইলাম বোজজো? হেলে অসুবিদাও ম্যালা। উনি কেডা? কোন্হান দিয়া আইলেন? কোন্ বাড়ির? চৌদ্দ কতার জবাব দেতে অইবে হ্যানে। বললাম, ঠিক আছে। বৌ, পোলায় কয় কী? আচুক্কা খবরডা দিলি। বৌ খামড়ায় নায়?

না। খুউব মজার এ্যাট্টা কতা কইছে। কয়, কতায় কয়, ওঠ্ ছেমড়ি, তোর বিয়া। এয়া দেহি, উল্ডা। তয়, খুশি অইছে সাইদ্যের। কয়, এ্যাদ্দিনে মেঞায় এ্যাট্টা বুজ্দারের ল্যাহান কাম করছে। হারা জেবন তো খালি আকামের পাইন মারইয়া গ্যালে। এডা, অন্তত এট্টা কামের কাম অইছে।

হে আইছে?

হ, বাড়ি পাডাইয়া দিছি। আসলে উদিগে মানসিক ব্যাপারতো এ্যাট্টা আছে। শত অইলেও জামাই তো। হেলেন বা মোর কতা ছাড়ইয়াদে। বুড়া বুড়ি রইছেনা?

হেকথা ঠিক। তয় হেলেনের লগে সকালে আমার কথা অইছে। ও যে এতটা শক্ত ধাতের মাইয়া বোজতে পারি নাই।

আসলে, মনের দিক দিয়া অনেক দিন আগেব থিহাই তৈয়ারি হইতে আছিল। আব্বুজানেরে কইছেও অনেকবার। শওকতই রাজি অইতে আছেলে না। এবার আর হ্যার কতা না শোন্‌লেও অইবে। ব্যাপারডা অইছে নিখরচায় বৌ পাইতে আছেলে। উল্ডা পয়সা কড়ি আদায় করতে ভালই হ্যার ধার দিয়া। মাতব্বরি করইয়া বেড়াইতে মনের আল্লাদে। হেরহম বৌ কেউ তালাক দেতে চাইবে ক্যা ?

বাড়ির লোকেরা কেউ কিছু কয়নায় ?

না। ক্যাওরইতো অমত নাই। তুই আওয়ার পর নাকি হ্যার বাপে আইছেলে। আব্বুজানে হ্যারে বইতেও কয়েন নায়। আম্মু নাকি কইছেলে, বয়েন বেয়াই সায়েব। খুবই আফশোসের কতা, শওকত—এইডুক কইতে না কইতে, হেলেন আইয়া নাকি কইছে, এ্যাদ্দিন পর আইলেন যে! এতকাল তো দেহিনায় আপনেগো ক্যাওরে। মোরে যহন গো পেডানে পিডাইতে, তহন তো কতবার কইছি, মোরে বাচায়েন। তহন তো কইতেন হেডা নাকি মোছলমানের হক্। হেতে অন্যায় কিছু নাই। হাদিছে নাকি আছে, কোরাণ শরিফেও। মুইতো জানি কেতাবে, শরিয়তে আরও অনেক কিছুই আছে। আপনের বওনের আর কাম নাই। আপনেগো বেয়াকের সামনে মুই ঘোষণা দেলাম, তালাক, তালাক, তালাক। শওকত আন্‌ছারি আইজ থিকা মোর ধারে বেগানা পরুষ। দেন মোহরের পয়সা ফেরৎ চাই না, ওড়া আপনেগো খয়রাত দেলাম। মামলায় দরকার অইবে হ্যানে। হ্যারতরফ থিহা তালাক অনেকদিন তামাইতই চাইছিলাম, হে দেনায়। আইজ মুইই দেলাম। এডা লইয়া কোনো বাহানা যদি করেন, ঝামেলা বাড়বে। মুই কৈলোম অনেক কিছুই জানি।

হ্যার বাপটাও মানুষ ভাল না। হেলেনের ঐ ভাব দেইখ্যা ডরে পলাইয়া গ্যাছে।

তাইলে তো কাম অনেক আউগ্‌গাইছে। হেলেনের ধারে এয়া লইয়া বেশি কথা হয় নায় আমার। তয় যেডুক হইছে, বোজলাম হ্যার লগে না থাকাই মোঙ্গোল।

পোলাগো ধারে ফোনে সব জানাইয়া দিছি। বড় পোলায় শীগ্‌গীরই আইয়া মায়রে হ্যার ধারে লইয়া যাইবে কইছে। পোলারাও বেয়াকে মায়ের ধারা পাইছে, এডা ভাল।

একটা অস্বস্তি আপাতত কাটলো। এরপর শওকতের পরিবার আর কোনো প্রশ্ন সামাজিক ভাবে তুলবার সাহস পাবে কীনা, বা হেলেন কী অবস্থান নেবে, এই সব কথা আলোচনা করতে গেলে হক জানালো যে সেরকম সম্ভাবনা প্রায় নেই। যদিও আমার কাছে ব্যাপারটা একেবারেই হঠাৎ, কিন্তু হক বললো যে

সমস্যাটা যেহেতু দীর্ঘকালীন, সে কারণে এ নিয়ে আর কারুরই কিছু করার নেই। আর শওকত যে মামলায় পড়েছে, তার ফয়সালা কী হবে, কবে হবে, বলা দুষ্কর। আপাতত, এ নিয়ে তার খুব একটা মাথা ব্যথা নেই দেখে, আমি ভিন্ন প্রসঙ্গ তুললাম। জানতে চাইলাম, জব্বারের মেয়ের বিয়ের যে এই রদ-বদলটা হলো, এ কারণে হক এবং তার পক্ষে কিছু সতর্কতার ব্যবস্থা করার দরকার আছে কী না। কারণ, ব্যাপারটার সঙ্গে তো সন্ত্রাসীদের একটা প্রায় সরাসরি বিরোধ তৈরি হয়ে গেল।

হক বললো, দ্যাখ্, এসব লইয়া ভাবতে বইলে তো সামাজিক কাজকম্ম সব বন্দো রাখথে হয়। সন্ত্রাস ব্যাফারডা তো আইজ দুনিয়া শুদ্দা বেয়াক খানেরই ব্যাফার। তয়, আমি যদ্দুর বুজি, য্যারা এইসবের মইদ্যের মাথা, হ্যারা এইসব ছোডো খাডো ব্যক্তিগত ঘডনা লইয়া মাথা ঘামাইবে না বলইয়াই মনে অয়। তমো, আইজ বেয়ানে আমি থানায় খবর দিয়া সব জানাইয়া দিছি। হ্যারাও কইছে যে উপযুক্ত পুলিশ পাহাড়ার বন্দোবস্তো করবে। আমার আর জব্বাইয়ার এ্যাটটু বাড়তি খরচ অইবে আর কী। কিন্তু হেয়াতো যা হওয়ার অইবে। এহন ল' যাই দুইডা বাজে। চাইরডার মধ্যে কাম শ্যাষ করণ লাগবে।

সরা কহন ?

সাড়ে তিনডা চাইরডার মইদ্যেই ইচ্ছা।

তোগো লগ্নটগ্নের ব্যাপার কিছু আছে নাকী ?

না, হেরহম কিছু নাই, তমো কেউ কেউ হিন্দু-পঞ্জিকা মতে কিছু দিনক্ষণ, লগ্ন টগ্ন দ্যাহে। শরিয়তি মতে হেরহম কিছু নাই। সাদি বিয়ার ব্যাফারডা এছলামি শাস্তরে এ্যাট্টা মস্তো ছওয়াবের কাম। আর বেয়াক সোমায়ই আল্লার সোমায়, হে কারণে শুভ। ছওয়াবের কাম যহন করবা তহনই আল্লার বরকত পাবা। এছলামে এডাই কয়।

ভালই। সহজ নিয়ম। আমাগো মতো ম্যালা ঝঞ্ঝাট কিছু নাই। উকিল, মৌলবিরা আইছে ?

এতখুনে আওন তো উচিত। ল' যাই। দুফইরে খাইলি কিছু, না খালি ঘুমাইলি ?

না, দশটা সাড়ে দশটায় মাছের ঝোল ভাত খাইয়া ঘুম দেছেলাম, তহন।

আর দেরিনা, ওহানে যাইয়া হ্যানে চা খামু। কাকিমায়রে কইয়া যাই। কাকিমা অর্থাৎ আমার শ্বাশুরি এসে জানতে চাইলেন, রাতে ফেরা হবে কীনা। হক উত্তর দিল, না কাকিমা, ও আইজ্‌গা মোগো। কাইল দুফইরে এহানে খাইবে। তয় আই যাইয়া। পোলার বিয়া, দোয়া করবেন। পরে একদিন পোলা-বৌ দ্যাহাইয়া লইয়া যামু হ্যানে।

ষোলো

দিওয়ানা ফকিরের প্রেম—

বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা হয়নি। ছেলে, বৌ নিয়ে হক আর নছিফা চার পাঁচ দিন খুব হৈ চৈ করে দাওযাত খেয়ে ও খাইয়ে শহরের বাসায় ফিরে গিয়েছিল। যাবার আগে হক বলেছিল, শুক্কুর বার তো এ হানে ছুটির দিন। তুই সন্ন আর যীশুদার ব্যাপারে জানতে চাইছিলি বারবার। নানান ঝঞ্ঝাটে দেল্ খুল্ইয়া কত বাত্রা কইথে পারি নাই। জিগাই, হ্যারগো লগে দ্যাহা করণের ইচ্ছা আছে? হেলে শুক্কুর বার হৌর বাড়ি থিহা ছুটি লইয়া মোর ওহানে আয়। হ্যারগো লগে দ্যাহাডা করাইযা দিমু হ্যানে। মুইও যাইনা অনেকদিন।

উওম প্রস্তাব। পাঁচ পাঁচটা দিন নানান ব্যস্ততায় কেটেছে। শুক্রবারের আরো তিনদিন বাকি। এর মধ্যে আশপাশ গ্রামগুলো এবং পুরোনো পরিচিতদের মধ্যে যারা এখনো আছে তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে হকের সঙ্গে যীশুদাদের কাছে যাওয়া যাবে। এবারে বড়ো খাপ্ছাড়া ভাবে দিনগুলো কাটলো। ইচ্ছে ছিল মুসলমান চাষি-গৃহস্থদের একেবারে ভেতরে গিয়ে, তাদের বর্তমান পরিস্থিতির হাল-হকিকৎ জানার চেষ্টা করব। কিন্তু মন মোতাবেক হলো না। আসলে কী যেন পেতে চাইছি। কিন্তু কিছুতেই তার সন্ধান পাচ্ছি না। এতো বিবর্ণ আর বিষণ্ণ তো এই অঞ্চল ছিল না। বছর দশ পনেরোর মধ্যে কয়েকবার এসেছি। এতটা ছন্নছাড়া তো দেখিনি। দিন দিন গোটা অঞ্চল যেন বেশি বেশি করে শ্রীহীন, প্রাণহীন হয়ে উঠেছে। ন্যনাধিক তিন দশক বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এতদিনেও তার এই হলে!

বাজার এলাকাটা যেহেতু, আশপাশ দশটা গ্রামের কেন্দ্রে, এটাই বরাবর প্রাণবন্ত ছিল। প্রয়োজন ছাড়াও মেলামেশার, আলাপ আলোচনার, খেলাধুলার আয়োজনের হরেক ব্যাপারই এখানে হতো, এখন সে সব প্রায় নেই। গঞ্জটা জিলাসদর হয়ে ওঠায়, সবার গতি এখন সেদিকে। আমোদ ফুর্তিও সেখানেই।

যাতায়াত আগে পায়ে হেঁটে হতো, এখন রাস্তাটা পাকা হওয়ায়, অটো চলে, জলপথটা শুকিয়ে গেছে। বাজারটা তাই প্রায় লক্ষ্মীছাড়া। সাধারণ শাকসবজি, মাছ ডিমও শহরের বাজার থেকে আনতে হয়। কী যে হয়েছে সব। গ্রামে খেলাধূলো পর্যন্ত হয় না। উঠতি বয়সীদের সেদিকে মনই নেই। সব কিছুই একদিন ছিল। এখন নেই।

আছে একটা জিনিস, সেটা আঞ্চলিক রাজনীতি। সেই নিয়ে দলাদলি, মারামারি, কোন্দল। ইউনিয়ন কাউন্সিলের ক্ষমতা দখল। কোনো কাজকর্ম নয়। গ্রামগুলো একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে যেন। তার কোনো প্রয়োজনই যেনো নেই। তবু ওই আমার গ্রাম। কারুর প্রয়োজন না থাকতে পারে, তাকে আমার বড়ো প্রয়োজন। তাইতো আসি। দুঃখ পেতেই আমি যেন।

কিছু আধুনিক ঠাট বাট ঢুকেছে গ্রামজীবনে। সভ্যতার খুদ্‌কুঁড়ো। মোবাইল, বিদ্যুৎ, প্যাকেটের অখাদ্য। তাতে লাভ হয়েছে এই যে, পরম্পরাগত কোনো সামগ্রী নেই আর, বদলে যা এসেছে তা এই স্থানের পক্ষে বড়ো বেমানান। এখান থেকে বেশ কিছু দূরের বিল অঞ্চলে চমৎকার পেয়ারার চাষ হতো একসময়। মরশুমে দেদার পাওয়া যেত। চাষ হতো খিরই, মর্মা, শসা, কলা আরো হরেক ফল পাকুড়ের। বাজার ছেয়ে থাকতো সেই সব সামগ্রীতে, এখন তা কদাচিৎ দেখা যায়। মুক্তি যুদ্ধের সময় সেসব নষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু তারপরে আর গড়ে উঠল না কেন?

পেয়ারার কথা মনে হতে সন্নর মুখটা ঝিলিক দিয়ে গেল। সঙ্গে যীশুদার। একটা পাকা বা ডাঁসা পেয়ারার খুশিতে সন্ন তার সুডোল, সুন্দর বুক দুটি যীশুদার সামনে উন্মুক্ত করতে দ্বিধা করতো না। তার লালচে ঠোঁটে যীশুদার কালো পুরু ঠোঁটের আদর নিত। তখনকার বিচারে, এমনকী এখনকারও, ঐসব অসভ্য আচরণ অক্লেশে করতো সে। তাদের শেষ পর্যন্ত মিলন হয়েছে জেনে বেশ খুশি লাগলো। তাহলে তাদের সঙ্গে শুক্রবার দেখা হবে। সন্ন কী শেষ পর্যন্ত যীশুদাকে ভালবাসতে পেরেছে তাহলে? না শুধুই প্রয়োজনের সহবাস?

বছর তিনেক আগে যখন এসেছিলাম, তখন এক প্রেমিকের দেখা পেয়েছিলাম। গল্প করার মতো প্রেমের ঘটনা, এ অঞ্চলে খুবই দুর্লভ। একটা ব্যতিক্রমী ঘটনার কথা মনে পড়েছে। সে ছিল একজন সাধারণ কামলা। জনমজুর মানুষ, কিন্তু ভীষণ প্রেমিক। রোগা পাতলা চেহারা। সব সময় গান গাইত—বেদের মেয়ে জোছনা পাগল করেছে। সঙ্গে বছর পাঁচেকের একটা মেয়ে। সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতো তাকে নিয়ে কাজকম্মের খোঁজে। একদিন গঞ্জ থেকে দুপুরে হেঁটে ফিরছি, তখন আলাপ। খালপাড়ের ধেনো জমিটার কিনারে একটা কড়াই গাছের

নীচে বসে মেয়েটাকে 'সোলেমানী খাবনামা' ফাল্‌নামা'র 'তাবীর' বোঝাচ্ছিল। দেখে কৌতূহল হওয়ায় নাম পরিচয় জিজ্ঞেস করে আলাপ করেছিলাম। নাম ফকির। তার প্রেমিকা এবং বিবির নাম রস্‌না। মেয়ের রেক্সোনা। ফকিরের অক্ষর জ্ঞান আছে মোটামুটি। মেয়ে কিছু বুঝছিল কিনা সেদিকে তার খেয়াল ছিল না। সে পড়ে যাচ্ছিল জোরে জোরে। বিষয়, কোন স্বপ্ন দেখলে কী ফল ফলে তারই বৃত্তান্ত। যেমন, সে মেয়েকে বোঝাচ্ছিল, 'খাবে চক্ষু দেখিলে—আনন্দ লাভ হইবে। চন্দ্রের আলো দেখিলে—আর্থিক ক্ষতি হইবে বা চন্দ্র কোলে লইতে দেখিলে টাকা পাইবে বা পোলা হইবে' এইসব। মেয়ে বলছিল, খিদা পাইছে। আম্মার ধারে যামু। ফকির বলেছিল, তোর আম্মায় পানির কলসি উদ্‌লা রাখছেলে। হেয়ারতাবির খুব খারাপ।

ফকির বলছিল, রস্‌নারে মুই বড়ো ভালবাসি। রসনার লইগ্যা মুই পেরান তামাইত দেতে পারি। তয় হে আমারে দ্যাখথে পারে না। হে অন্য মানুর ধারে যায়। তমো এই যে রেক্সোনারে দ্যাখথে আছেন, হ্যার ধার দিয়াই তো পাইছি। —এবারে এসে দেখলাম ফকির প্রায় উন্মাদ। ঘোর নেশাসক্ত। চেহারা অসম্ভব খারাপ হয়ে গেছে। মেয়েটাকে নিয়ে সেই কড়াই গাছটার ছায়ায়ই বসে কাঁদছে, আর রস্‌নার জন্য দুজনেই আক্ষেপ করছে। বাড়ি কাছেই, বেশাইনখান। এই বাড়িটাতেই বেশির ভাগ সময় থাকে, অসময়ে খাবার পায়, তাই। কখনো রসনার উদ্দেশ্যে গান গাইছে, কখনো অকথ্য গালও দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে বললো, রসনা আমারে ছাড়ইয়া চলইয়া গ্যাছে। বলে মেয়েটাকে জড়িয়ে সে কী কান্না। তার ধারণা রস্‌না আসলে তাকেই ভালবাসে, কিন্তু ঐ লাংচুনির পোয় হ্যারে লোভ লালস্‌ দ্যাহাইয়া, ফুস্‌লাইয়া নেছে। মোর কীনা ট্যাহা জমি, ভাল ঘরবাড়ি নাই, হ্যার লইগ্যাই হে গেছে। তো কী করমু কয়েন? মোরে আল্লা তাল্লায় যুদি না দে, মুই পামু কই? —জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা কে? বলল, ওই মুই য্যার গাছের নাইরখোল, সুবারি পাড়ি, বাগান সাফ করি, হেই আজাহার আলি। হক্‌ সাইবে এহন মোগো মাতব্বর। হ্যারে কইলাম, এ্যাট্টা সালিশি ব্যবস্থা করইয়া ব্যাফারডা মিডাইয়া দেন। তো হক সাইবে রসনারে ডাইক্যা জিগাইছেলেন, ফকিররে ছাড়লি ক্যা? —রসনা কইলে, ওডা না-মরদ। অর লগে ঘর করমু ক্যামনে? আয়চ্ছা কয়েন, মুই যুদি না-মরদ অই তো এই মাইয়াডা অইলে ক্যামনে?

তুমি জানতে চাইলে না?

চাইছেলাম তো। কয়, তুই কী ভাবছো ওডা তোর মাশুল? ওডারে মুই লইয়া যামু, অর উফরে তোর হক্‌ নাই। আয়চ্ছা, অরেও যুদি লইয়া যায়, মুইকী বাচমু? মুই থাকমু কী লইয়া?

তালাক হয়ে গেছে?

মুই দি'নায়। হে দিছে। ব্যাডা যুদি না-মরদ অয়, হ্যারে তালাক দেওয়ার হক্ নাকি মাগিগো থাহে। এহন মুই করি কী কয়েন? মাইয়াডারেই বা পালি ক্যামনে। ছাড়ইয়াই বা দিই ক্যামনে, কয়েন? আল্লা হালায় পো হালায় মোর কী দশা হরলে? আল্লার মায়রে একবার পাইলে হ্যার ফলনাতা হরতাম।

তুমি তো নেশাভাঙ করতে না, এখন করছ না কী?

না নেশা করি নাই। পয়সা পামু কই? এ্যাটটু গাজা খাইছি। পয়সা থাকলে তো নেশা খাইয়া পড়ইয়া থাকতাম।

মানে গাঁজাটা ঠিক নেশার পর্যায়ে পড়ে না এখানে। কিন্তু ফকিরের কথা শুনে এবং অবস্থা দেখে, মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। জানিনা সে সত্যিই পুরুষত্বহীন কীনা, অথবা রস্না কোনো ভিন্ন বাসনায় তাকে ত্যাগ করেছে। অবুঝ মেয়েটা বোধহয় এসবের কিছুই বুঝতে পারছে না। ফকিরের কান্না তাকেও সংক্রমিত করেছে হয়তো। মানুষটাকে সেবার কী খুশি আর ফুর্তিবাজ দেখে গিয়েছিলাম। তখন পূজার সময়। একটানা প্রায় দুঘন্টা ধুনুচি নাচ করেছিল। ছেলেরা রস্নার প্রতি তার ভালবাসার আতিশয্য নিয়ে খুব পিছনে লাগছিল, ঠাট্টা মশকরা করছিল। আজ তার এই অবস্থা। ফকিরের শ্রেণীর মানুষেরা আগেও দরিদ্র, হা-ভাতে ছিল, এখন যেন আরো বেশি হয়েছে। এরা প্রায় পুরুষানুক্রমে জন-মজুর বা রাখাল বাগাল। জমি-জমা হয়তো কোনো কালে ছিটেফোঁটা ছিল, সে কবে হয় কেউ কেড়ে নিয়েছে, নয়তো পেটের দায়ে বেচে দিয়েছে। এখন প্রায় গ্রামীণ ভবঘুরে। কত দেশত্যাগী হিন্দুর ছাড়া ভিটে দখল, বেদখল হয়েছে। কত বাগান, অনাবাদি জায়গা ধানের জমি হয়েছে। কিন্তু তাতে এদের কোনো হিস্যা নেই। তারা সেখানে গতর খাটিয়েছে দৈনিক পেটভাতায়, নয়তো সামান্য মজুরির বিনিময়ে। মালিকানার সুযোগের জন্য যে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা বা অর্থের দরকার, কোনো কালেই তারা তা পায়নি। এখন তো গ্রাম মোটামুটি গেরস্থ শূন্য। সুতরাং রকমারি কাম কাজই বা পাচ্ছে কোথায়? এ অঞ্চলে চাষের ব্যাপারটা এখন এসে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র পাট আর ধান চাষে। রকমারি ফসলের কথা কেউ ভাবে না। ভাবে না ফল-পাকুরের বাগিচার কথাও। জমিও পরিমাণে বেড়েছে বটে ছেড়ে যাওয়া বাড়িগুলো চটিয়ে। কিন্তু গুণগত মান বজায় নেই। আর চাষের কাজ লোকগুলো কটা দিনই বা পায়! গোটা দেশের কথা জানি না, তবে এই অঞ্চলটাকে যেন একেবারে ধরে বেঁধে জবরদস্তি বন্ধ্যা করে দেওয়া হয়েছে ফকিরের জীবনটার মত। চাষিরাও যেন যখন আর জমির শ্বাস প্রশ্বাস বা সুখ দু:খের কথা বুঝতে পারে না।

মনে মনে ফকিরকে বললাম, কেঁদো না ফকির, দেখো তোমার রস্‌না একদিন নিশ্চয় তোমার কাছে ফিরে আসবে, যেমন যীশুদার কাছে সম্ন ফিরে এসেছে। যেমন হকের ছেলে কামরুল এই দুদিন আগে পেলো জব্বারের মেয়ে হাসুকে। পাওয়ার কথাতো ছিল না। কোথাকার কোন্ বাজিতপুরের একজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হলো মেয়েটার, কিন্তু কামরুলের গোপন ভালবাসাই জয়ী হলো শেষতক। কোনো প্রেমই বিফলে যায় না। এইরকম অনুচ্চারিত কিছু কথা মনে মনে আউড়ে ফকির আর তাব মেয়েকে নিয়ে ঘরে ফিরলাম। জানতাম, এখানে এলে তাদের সারাদিন অভুক্ত থাকতে হবে না। সাধারণত হয় না।

খেয়ে দেয়ে ফকির আর তার মেয়ে একটা লম্বা ঘুম লাগালো। এই বাড়িটার এখনো একটা মস্ত সুবিধে এই, যে ফকিরদের মতো মানুষেরা সময়ে অসময়ে দুটো খেতে পায়, যা হোক, লম্বা বারান্দাটায় শুয়ে বসে বিশ্রাম নিতে পারে। এ অঞ্চলের মোটামুটি সম্পন্ন চাষি-গেরস্তরাও এই ধারাটা বজায় রেখেছে এখনো। কিন্তু সেরকম গেরস্থালি আর কয়টা? এই মানুষগুলোরই হয়েছে মরণ। তারা যে বিনা প্রতিদানে গৃহস্থের সাহায্য কোনোদিন নিত বা এখনো নেয়, এমন নয়। কিছু না কিছু, টুকটাক কাজ করে দিত, দেয়ও। তার জন্য গেরস্তকে যেমন বলে করাতে হয় না। তেমনি নগদ পয়সা দেওয়ারও রীতি নেই। আসলে দেয়া নেয়ার এই জাতীয় পরম্পরাটাই সমাজ থেকে মুছে যাচ্ছে। গ্রামীণ মূল্যবোধের অর্থনৈতিক কাঠামোটাই যে আর নেই। আসলে যে কথা আগে একবার বলেছি সেই কথাটাই পুনশ্চ বলতে হয়। মাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকলে যে মূল্যবোধ সমাজকে ধারণ করে রাখে, সেই সম্পর্কটা আল্‌গা হয়ে গেলে সেই মূল্যবোধগুলো ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে। এখানে এখন কৃষি ভিত্তিক পরম্পরার সামাজিক অবস্থাটা লুপ্ত হয়ে মানুষের মধ্যে এসেছে একটা নৈরাজ্যের মনোভাব। এর সূচনা অনেক দিনের। নাগরিক আধুনিকতার সুষম বিকাশ যদি ঘটতো, তাহলে হয়তো নতুন কোনো মানবিক মূল্যবোধ বর্তমানের শূন্যতাকে ভরাট করতে পারতো। কিন্তু উপমহাদেশের খুব কম স্থানেই তেমনটি হয়েছে। এখানেতো একেবারেই হয়নি।

সতেরো

তার বদলে পেলে

অতিদ্রুত দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। আর গোটা পাঁচেক দিন হাতে আছে। আগে যতোবার এসেছি, প্রত্যেকবারই শারদী উৎসবের সময় আসা হয়েছে। ফলে, প্রকৃতি, উৎসব এবং এইসব গরীব গুর্বো মানুষগুলোর সাময়িক উত্তেজনায় বাল্যস্মৃতি রোমন্থন করে দিনগুলো কাটিয়ে গিয়েছি। এবার এই রুক্ষ জ্যৈষ্ঠের প্রখরতায় এসে সেই ফুরফুরে ভাবটা আর পেলাম না। বরং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষগুলোর জীবনের ঊষরতা, বিবর্ণতা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে মানুষগুলো আদপেই ভাল নেই। যীশুদা, মঞ্জুদা, ধলু, হক, জব্বারদের সঙ্গে আগেরবারগুলোতে এক আধদিন দেখা সাক্ষাৎ হতো বটে, তবে যেহেতু এই অঞ্চলে তারা মোটামুটি শিক্ষিত জন এবং সামাজিক কৌলিন্যের অধিকারী, খুব একটা মেলামেশা করিনি। অবশ্য শিক্ষা বা কৌলিন্যের কথাটা এদের ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে খাটে না। সেরকম মানুষ গ্রামে এখন থাকেই না। তবে আমি যাদের সঙ্গে সাধারণত মেলামেশা করি বা করতে চাই, তাদের তুলনায় এরা শ্রেণীগত ভাবে আলাদা। সেই বিভেদটা, গ্রামীণ বিচারে আর্থিক অবস্থার তারতম্যের, শিক্ষাগত তারতম্যের বিভেদ। এরা নিজেদের ভদ্রলোক হিসাবে আলাদা শ্রেণীরই মনে করে থাকে। কেন জানি না আমি এদের সঙ্গে খুব একটা একাত্মবোধ করি না। ফকিরেরা ছোটলোক। সে অর্থে দেখছি, যীশুদাও ছোটলোক হয়ে গেছে। ধলু ভদ্রলোক স্তরে উন্নীত। যীশুদা তার প্রেমকে মর্যাদা দিতে, বা সফল করতে অন্যের বৌ হয়ে যাওয়া সন্নকে লোকায়ত পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছে বলে। এই প্রায় বিলয় হয়ে যাওয়া সমাজেও ব্রাত্য। সে সন্নকে নিয়ে 'মতুয়া' হয়েছে। জাত-ধর্ম বিসর্জন দিয়েছে।

ঐ সময়টায় আমি যদি এখানেই থাকতাম, যদি এমন হতো যে আমার মানসিক বিকাশটা এই মঞ্জুদাদের মতই থাকতো, তবে আমিও বোধহয় মন থেকেই যীশুদাদের ত্যাগ করতাম। দেশ ছেড়ে, বৃহৎ আবর্তের মধ্যে পড়ে আমি এই কুটিলতার থেকে মুক্তি পেয়েছি। তাই, যীশুদা-সন্নর সংসারে একবার উঁকি

দিয়ে দেখার আগ্রহ আমাকে আকুল করেছে। এর মধ্যে যে তাদের একটা প্রতিবাদী সত্তা কাজ করেছে, সেটা আমার শ্রদ্ধেয় মনে হচ্ছে। তারা মুসলমানওতো হতে পারতো। কিন্তু তা তারা হয়নি। হলেও আমার আপত্তি হতো না। হক পরে বলেছিল যে, তাদের ইচ্ছা সেরকমই ছিল, কিন্তু হকই নিষেধ করে। কেন? এদেশে মুসলমান করা বা হওয়ার ঘটনার তো অভাব নেই। হক বলেছিল এখন নাকি মুসলমান হলেই আগের মতো সামাজিক মর্যাদা বা সুযোগ আর পাওয়া যায় না। নিরাপত্তাও সে অর্থে তেমন পাওয়া দুষ্কর। আরো নাকি নানান ফ্যাকড়া আছে কীসব। তার চাইতে তারা যে মতুয়া হয়েছে, সেটা তাদের পক্ষে ভাল। মতুয়ারা নিজেদের মতো থাকে। ছোটো গোষ্ঠী, ঝামেলা কম। এদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গেও অসুবিধেয় পড়লে সেখানের মতুয়ারা এদের আশ্রয় দেবে। আমি নিজেও জানি, মতুয়ারা সহজিয়া। কিন্তু তারা আদৌ বাউল বৈরাগীদের মতো ছন্নছাড়া নয়। ঘোরতর গৃহস্থ, তবে ধর্মকর্মের ব্যাপারে সহজপন্থী। দাঙ্গাফ্যাসাদ, হানাহানিতে থাকে না। জাতিভেদ মানে না। কৃষিকাজ বা সাধারণ খেটে খাওয়া জীবন যাপনেই সন্তুষ্ট থাকে। সমাজের মূলস্রোত বলতে তেমন কিছুই আর নেই এখন। বহু বহু দিন আগে থেকেই হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজই আঞ্চলিক রকমারি লোকায়ত ধারায় আশ্রয় নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে আসছে। ফলে, মুসলমান সমাজের নীচের তলার মানুষেরা, মাইজভাণ্ডারি, মারফতি প্রভৃতি শাখা প্রশাখায় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখছে। হিন্দু নীচের তলার যারা, তারা মতুয়া, বাউল, বোষ্টম বা অনুরূপ কোনো ধারায়। মূলধারা বলতে, এইসব অঞ্চলে প্রকৃত শরিয়তি ধারা বা সনাতনী ব্রাহ্মণ্য ধারার মানুষ বিশেষ কেউ নেই। সবই ছেঁড়া ছেঁড়া। কিন্তু লোকায়ত ধারাগুলিকে নিন্দা না করেও বলা যায় যে এর দ্বারা বৃহৎ কোনো সমাজ সৃষ্ট হচ্ছে না। হওয়া সম্ভবও নয় বোধকরি। জগতটা আর ততো সহজ নেই।

যীশুদাদের বাড়িতে যাওয়ার দিন রাস্তায় হকের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক কথা হয়। সে বলে, আসল সমস্যা হইল অশিক্ষা আর কুশিক্ষা। মোরা য্যারা শরিয়ত মানি, হ্যারা এমন কড়াকড়ি করি যে হেহানে মাইনসের দোম যায় আটকাইয়া। যেমন এক কালে তোগো সমাজে আছেলে। আধুনিক বেয়াক কিছুই হেহানে বে-শরিয়তি। রসুলল্লা সাল্লাল্লাইহু আলায় সাল্লাম যে শিক্ষার ব্যাপারে অত উদার আছিলেন, হেনার য্যারা আইজকার 'উম্মতি', তেনারা রসুলের হুকুমের তাৎপজ্জডাই বোজে না। শিক্ষার নামে, হে কারণ, যেডা হ্যারা চালাইতে চায়, হেডা চৌদ্দশো বছর আগেও আছেলে না। আর য্যারা ছোডো ছোডো দলে ভাগ হইয়া মাইনসের মইদ্যে ভাব ভালবাসার গান গায় বা প্রেচারাদি করে, হ্যারাও ঐ পুরনো বুলিই

কয়, শিক্ষার অভাব হেহানেও ম্যালাই। তয়, হ্যারগো এ্যাট্টা গুণ এই যে, হ্যারা কোনো ক্যাচাল ফ্যাসাদে থাহে না। নিজেগো মতই থাহে। হেতে হ্যারা আউগ্গাইলো না পাউছাইলো হেয়ার চিন্তা করণের মানুষ নাই। নতুন শিক্ষা দীক্ষা ছাড়া কিছু উন্নতি ক্যাওরই অইবে এমন বাসিনা। হক একটা ব্যাপক সংকটের কথাই বলতে চাইছে।

হকের কথার মধ্যে যুক্তি আছে। কিন্তু তার নিজের সমাজে সে যুক্তি প্রকাশ্যে বলায় বাধাও আছে ঢের। রাজনীতি ব্যাপারটা এখানে কী আঞ্চলিক, কী জাতীয় সর্বত্রই ধর্মের গোঁড়ামির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। লোকায়ত স্তরের ব্যাপারটাও প্রকৃত শিক্ষার অভাবে, বদ্ধ জলাশয়ই। সেখানে পারস্পরিক বিভেদের ভীতিটা এমন যে দেখলে মনে হবে, তারা যেন যে শিক্ষায় শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষের জন্ম হয়, তার থেকে দূরেই থাকতে চায়। অসংস্কৃত তো সবাইই অসংস্কৃতই থাকব, নতুন করে নিজেদের মধ্যে ভেদ আর বাড়াবো না। এটা যেমন একটা মোটামুটি দার্শনিক স্থিতি, তেমনি ব্যক্তিক স্তরে, সনাতনী সমাজের বন্ধন-শৃঙ্খলা না মেনে, নেশা ভাঙ করা, প্রেমের ক্ষেত্রে সহজগামিতা, সামাজিক নৈরাজ্যের এক ধরনের অবাধ স্বাধীনতা ভোগ সেসবও আছে। এই স্বাধীনতা তাদের কোথায় নিয়ে যাবে, তা নিয়ে কোনো দার্শনিক প্রস্থানের চিন্তা কারুর আছে বলে মনে হয় না।

বাস থেকে নেমে সেদিন হক আর আমি একটা রিক্স নিয়েছিলাম। শহরের একেবারে শেষ উত্তর প্রান্তে প্রায় বস্তিমতো একটা এলাকা, সেখানে যেতে হবে। হক বলছিল, তোর বোধ হয় ভাল লাগবে না। যীশুদা যে বাড়ির পোলা, হে এরহম এ্যাট্টা পরিবেশে থাকপে ভাবতে পারি না। তয় মুই কৈলোম যীশুদার ব্যাপারডা এ্যাটটু ভিন্ন চোউক্ষে দেহি। হে আর যাই হউক, শিক্ষা দীক্ষা যাই থাহুক ভদ্দরলোক বাড়ির পোলাতো, হেয়ার এ্যাট্টা অহংকার তো থাহে? না কী কও? তয় হেমোমায়ের হ্যারগো পরিবেশটাও কী এমন ভাল আছেলে?

কথা সয়ত্য।

মানুষটা সন্নর মতো এ্যাট্টা খয়রাতির মাইয়ারে ভালবাসইয়া সবই ত্যাগ করলে, গেরামে হ্যার নামে কুচ্ছার পর কুচ্ছা, কিবা হিন্দু কিবা মোছলমান, কেউইতো রেয়াৎ করে নায়। মোরগো মইদ্যে মঞ্জুদা, ধল্উয়া আর আমি ছাড়াতো কেউই দাড়ায় নায় হ্যার পাশে। ইস্কুলের মাস্টেররা, বাজারের য্যারা মাতব্বর আর তোগো সোমাজের যত বাওন, বৈদ্য, কায়েস্থ আছে এমন কী কম্মকার বা নো-মো মোগো মইদ্যের য্যারা শিক্ষিত—বেয়াকেই তো হ্যারে দুশ্চরিত্তির, মালউয়া, ছোডোলোক কইয়া গাইল দিতে ছাড়ে নায়। তমো,

সন্নরে, ঐ পরের বিয়া করা, দুইবার বলাৎকার হওয়া মাইয়াডারে হে ভালবাসইয়াই ঘর বান্ধলে। হেয়া য্যামন ঘরই হউক, আর যে জায়গায়ই হউক, এডা এ্যাট্টা বড়ো কতা না? সন্নরে এটটা মানুষ হিসাবে সোম্মানতো দিছে

সয়ত্যই বড়ো কথা। খুব বড়ো পেরাণের মানুষ ছাড়া এডা কেউই করতে পারে না। দয়া করইয়া আশ্রয় দিতে পারে। দয়া করইয়া বিয়াও ঝোকেম মাথায় করা যায়? তয় হেই দয়া একসময় যে আবার সুবিদা নেওযার রাস্তায় যায়, আর রক্ষাকরে ভক্ষক বানায় হেরহমওতো এ অঞ্চলে আমরা কোম দেহি নায়, নাকী কও?

হ। কিন্তু এডাতো হেয়া না। অল্পবয়সে যীশুদার মতো প্রেম পিরীত, ঐ এ্যাটটু চটকাচটকি সুবিদা পাইলে অনেকেই করে। কিন্তু ভালবাসাডা এতদিন বাচাইয়া রাহা খুব মামুলি কতা না, বোজজো? বিশেষ করইয়া মোরগো ল্যাহান ব্যাকোয়ার্ড জাগায়।

বোধহয় ব্যাকোয়ার্ড বলেই প্রেমের এই প্রকাশটি অ-বিকৃত ভাবে সম্ভব হয়েছিল। এই হৃদয়বত্তা অবশ্যই দুর্লভ, যে কোনো সমাজে দয়া বা করুণা নয়, দৈহিক আকর্ষণের ক্ষণিকত্বের অনিবার্যতা নয়, এ যেন অন্য এক বোধ, যে বোধে প্রেমিক যদি জানেও যে উদ্দিষ্ট দয়িতা তাকে ভালবাসে না, পছন্দ করে না, তথাপি তার জন্য সে জীবনের সব আয়াস, আয়োজন এবং নিশ্চিন্ততা পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারে।

টালির চালাওয়ালা একখানি ঘর। সামনে বেড়াঘেরা একটি বারান্দা, যেটি ঘর হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। বাইরে খানিকটা বারোয়ারি উঠোন, পাশে বাইরের দিকেই একটা জলের কল। যীশুদার গ্রামের বাড়িটা ছিল পাকা মেজের, কাঠের ফ্রেমওলা, টিনের ছাউনির। বড় উঠোনওলা, নানারকম গাছগাছালির মধ্যের সেই বাড়িটার স্মৃতি আমার কাছে বড় উজ্জ্বল। এখন এই বাড়িটি দেখে আমার তা মনে পড়লো আরো বেশি করে। কিন্তু সে পার্থক্য শহর নগরের সঙ্গে সুস্থিত গৃহস্থ গ্রামের।

হক বলছিল, আমাগো দলের মইদ্যে এক মঞ্জুদা ছাড়া গেরামে আর কেউ নাই। মুই আধা থহি শহরে, আধা গেরামে। ধলউয়া অবইশ্য আছে হেহানে। বাকি য্যারা হ্যারা বেয়াক বাইরে বাইরেই থাহে। কেউ চাকরির খাতিরে, কেউবা, বিশেষ করইয়া হিন্দু য্যারা, হ্যারাতো অনেকেই জন্মের মতো হিন্দুস্থান গ্যাছে গিয়া। নোমো পাড়ার কেউ কেউ আছে, য্যারা কাছাকাছি ইস্কুল কলেজে মাষ্টেরি করে। আর গেরামে তো কোনো মদ্য-বিত্ত পোলাই নাই দেখলি। কিন্তু যীশুদার গেরাম ছাড়াডা তো বাইদ্য অইয়া। হ্যারেতো থাকতেই দেলে না।

ক্যান্ থাকলে কী অইতে ?

তোর কী মাতা খারাপ ? থাকতে ক্যাম্নে ? তোগো জাইত সোমাজের চরিত্তির তুই জানো না ? না শহরবাসী অইয়া, ভিন্ন দ্যাশে যাইয়া বেয়াক ভুলইয়া গ্যাছো ?

না ভুলি নাই। ভুলুম ক্যামনে ? কুট্লামিতে আমাগো সমাজ পৃথিবীর সেরা। অবইশ্য তোরাও যে হেয়ার ভাগ পাও নায় এমনতো না। মানুষ তো একই জাগায় অইছি, আলো হাওয়াও একই গায় লাগছে। আমি ভাবি, গেরাম ছাড়ইয়া যাইয়া দুইডা লাভ অইছে আমার। একটা অইল, এই গেরাম দ্যাশটারে যে এতো ভালবাসি হেডা বোজতে পারলাম, আর এ্যাট্টা, শহরে না গ্যালে তো বোজতামই না পৃথিবীডা কতো বড় আর মানুষে মানুষে ভেদাভেদের ব্যাপারডা কতো খারাপ, তুচ্ছ। আমরা আসলেই কতো খারাপ মানুষ, বেয়াকেই।

ক্যান্, কইলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের অন্য শহরে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের ব্যাপার, কূটলামি, এসব নাই ? নাকী হেহানে সয়ত্যযুগ চলতে আছে এহন ?

আছে সবই। তয়, প্রতিবাদ হয় কোনো কোনো তরফ থিকা। তক্ক বিতক্ক হয়, এইসব কুআচার নিয়া। গেরামে তো হেইডা অয়না। হেহানে খারাপটাই এক তরফা। তমো কই গেরামের থিকা অনেক শিখছি, হেই শিক্ষারও তুলনা নাই। গেরাম শহর দুই জাগার থিকা শিক্ষা না পাইলে মানুষের কষ্ট দুদ্দশা বোজোন যায় না। মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না পুরাপুরি। আমার ছোডো কালের যেসব স্মৃতি এইসব অঞ্চল নিয়া আছে, তার মইদ্যে এহানের মাইন্সের অন্তকরণের মমতাডাই প্রধান। শিক্ষা পাইলে এই মানুষগুলা যে কী অইতে পারত, হেয়া বৃহত্তর বইশ্যালের গাভা, গৈলা, বানরিপাড়া অঞ্চলের এক সোমায়ের উন্নতি দ্যাখলেই বোজা যায। হেই উন্নতির ধারা পাচ্চিম বঙ্গে আওয়ার পরও হ্যারা বজায় রাখছে, যদিও ভিন্ন পরিস্থিতিতে। পরিস্থিতির সুযোগটা হেহানে বেশিই পাইছে। হেই সুযোগ কামে নাগালের শিক্ষাডার পরম্পরাডাও হ্যারগো আছেলে।

যীশুদা এবং সন্ন কেউই ঘরে ছিল না তখন। একটি বছর কুড়ি বাইশের ছেলে, হক বললো যীশুদার ছোট ছেলে। বলল, মা, বাবায় দুইজনেই হরিচান্দ ঠাহুরের আশ্রমে গেছে। আপনেরা বয়েন, মুই যাইয়া ডাইক্যা লইয়াই। ছেলেটি বেশ। হক পরিচয় দিলে, আমাদের দুজনকেই প্রণাম করলো। তার গলায় তুলসী কাঠের মালা। গায়ের রঙ যীশুদার মতোই ঘোর, কিন্তু চোখ মুখে সন্নর চোখা ছাপটা স্পষ্ট, যতটা আমার মনে আছে। নাম বললো, বসুদেব। যীশুদাদের উপাধিতো 'সেন'। কী জানি সেটাও সে পরিত্যাগ করে অন্য উপাধি নিয়েছে কীনা। যীশুদার আগেকার দিনের কথাগুলো মনে পড়ছিল। অত্যন্ত ছোট বয়সে মাকে হারায়। বাপ ছিল একটু অলস প্রকৃতির। যীশুদাকে মানুষ করে তার দিদি।

বয়সে প্রায় তার মা হওয়ারই উপযুক্ত। বাবা অলস প্রকৃতির হলেও খারাপ মানুষ ছিল না। জমিনির্ভর পরিবার। কামলা, হালিয়া রেখে জমির চাষ হতো। খাওয়ার অভাব ছিল না। কিন্তু অসম্ভব দুঃখের কপাল। দু'দুবার বিয়ে করেছিল, কিন্তু একজনও টিকল না। প্রথম পক্ষে এক ছেলে আর এই দিদি। যীশুদা তার মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল। দিদির বিয়ে দেওয়া হয়েছিল হোসেনপুর নামে দূরের একটি গ্রামে। কিন্তু সেখানেও দুর্ভাগ্য। বছর তিনেকের মধ্যে তারা ফেরৎ দিয়ে গিয়েছিল বিন্তিদিদিকে। দিদিকে ঐ নামেই আমরা ডাকতাম। বিন্তিদিদি বাপের বাড়িতে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই নাকি যীশুদার মা মারা যান। আমি যখন বিন্তিদিদিকে দেখেছি তখন সে প্রায় প্রৌঢ়া। খুবই স্নেহশীলা, বিশেষ করে যীশুদাকে সন্তানবৎই ভালবাসত দিদি। আগের পক্ষের দাদা ছিল মোটামুটি দোষেগুণে মানুষ। কিন্তু বৌদি ছিল অসম্ভব স্বার্থপর এবং কুটিল। সে কারণে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকতো। দাদাও পরে এই নিত্য অশান্তির কারণে, বাধ্য হয়েই সৎ-ভাই সুলভ আচরণ শুরু করেছিল। প্রথম দিকে তেমন ছিল না ও অবশ্য। তাও যতদিন বাবা বেঁচেছিল, সংসার একান্নবর্তীই ছিল। যীশুদার বয়স যখন বছর কুড়ি, বাবা তখন মারা যায়। তবে মারা যাবার আগে সে বড়ো ছেলেকে ডেকে, পাড়ার দু-একজন মুরুব্বির সাক্ষাতে বিষয় আর বাড়িঘর আলাদা করে দিয়ে, বিন্তিদিদিকে দায়িত্ব দিয়ে যায় যীশুদার দেখভাল করার। কিন্তু দাদা ক্রমশ ভিন্ন মানুষ হয়ে গিয়েছিল। তার হৃদয়বত্ত্বাটা আর ছিল না যেন আদৌ।

কিন্তু তাতেও বৌদির রাগ বা আক্রোশ কিছু কমেনি। বিন্তিদিদিকে সে 'বাজা', 'ঢলানি', 'ছাড়উয়া ভাতারি' ইত্যাদি অপবিশেষণে ভূষিত করতো। বিন্তিদিদিকে আমি যখন দেখেছি, তখনো তার শরীরের বাঁধন গড়ন ভাল। অবৎসাদের যেমন হয়। বোধহয় সে কারণেই তাদের বৌদির ভাষা অত অসংযত হতো। এসব ক্ষেত্রে গ্রামীণ স্তরে যৌন কুৎসা থাকেই। তার সত্যতা থাকুক বা না থাকুক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়তো সত্যতা থাকতো কিন্তু গোটা ব্যাপারটা সহৃদয়তার সঙ্গে বিচার করার মতো স্ত্রী বা পুরুষ কোনো মানুষই এসব ক্ষেত্রে সাধারণত থাকে না। সুবিধেভোগী পুরুষেরা মজা লোটে এবং নিজেদের সামাজিক সুনাম বজায় রাখার স্বার্থে ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে এইসব মেয়েদের কাকা, জেঠা, মেসো বা মামা, দাদার ছদ্মবেশ নেয়। স্ত্রীলোকেরা তাদের 'দেবা ন জানন্তি' কোনো ঈর্ষার কারণে, সদাসর্বদা ঠোঁট বাঁকিয়ে 'বিন্দাবন লীলার' কাহিনীর চাট্‌নি বিলোয়।

বিন্তিদিদির বর আবার অচিরেই বিয়ে করেছিল, কিন্তু শোনা যায়, সে সংসারেও তার কোনো সন্তান হয়নি। সুতরাং প্রকৃত বাজা কে সেটা পরবর্তী

কালে বোঝা গিয়েছিল। পরে যীশুদার মুখ থেকে এইসব খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত যখন শুনি, সে তার স্বভাবসুলভ ভাষায় বলেছিল, আসলে বোজজো, ঐ হালায় নিজেই অইলে ফোপড়া। বলাবাহুল্য এ কথাটা বোঝার মতো তথাকথিত 'অপ-বিদ্যা' অর্জনের সুযোগ বা বয়স তখনো আমায় হয়নি। 'ফোঁপড়া' কথাটার সঙ্গে ছেলেমেয়ে না জন্মানোর রহস্যটা কী, তখন বুঝিনি। পরে যীশুদাই বুঝিয়ে বলেছিল, ঐ বাজা-পুরুষ আর কী। আর এসব ক্ষেত্রে অসম-সামাজিক সম্পর্ক-অনেকই ঘটতো।

তবে বিন্তিদিদি যে 'নিষ্পুরুষ' জীবন কাটাতো না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। তাদের বাড়িতে ভূষণ মাঝি বলে একজন জোয়ান হালিয়া কাজ করতো। লোকটি বিয়েথা করেনি। গরীব এবং সংসারে নিতান্তই একা। যীশুদাদের বাড়ির চৌহদ্দিতেই ছিল তার থাকার ব্যবস্থা। বাড়ির আমবাগানটার পাশে গোয়াল ঘর সংলগ্ন একটা কুটিরে সে থাকতো। খেতো বিন্তিদিদিদের সঙ্গেই। এরকম ব্যবস্থা আমাদের অঞ্চলের গরীব, অবস্থাপন্ন প্রায় গৃহস্থ বাড়িতেই থাকতো।

যীশুদার আগ্রহে আমি কখনো কখনো তাদের বাড়িতে রাত কাটাতাম। যীশুদা তখন নিরলস ফেল করে করে আমার সহপাঠী। তাকে পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য বিন্তিদিদিও চাইতো আমি মাঝে মাঝে ওখানে যেনো থাকি। এইরকমই এক সময়ে, অন্তত তিনদিন ঘটনাটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাদের ঘরটা ছিল পাকা মেজের টিনের ছাউনি এবং কাঠের ফ্রেমের। সামনের বারান্দাটা ঘর হিসাবেই ব্যবহার হতো। মাঝের ঘরটা বড়ো, যেখানে চাল রাখার জন্য বড়ো বড়ো মটকি এবং অন্যান্য আসবাবপত্র রাখা থাকতো। বারান্দার দুপাশে দুটো শোবার ঘর। বাড়িটা দক্ষিণমুখী। বারান্দার বাঁদিকের ঘরে শুতো যীশুদা, ডানদিকেরটায় বিন্তিদিদি, আর আমি থাকলে বারান্দার ডানদিকে পাতা একটা চৌকিতে শুতাম। রাত্রে পড়াশোনা শেষ হলে যীশুদা তার ঘরে শুতে চলে যেতো।

মাঝে মাঝে বিন্তিদিদি, বারান্দায় আমরা যখন পড়তে বসতাম, বসে বসে কুরুস কাঁটায় কীসব বুনতো টুনতো। কখনো গল্পটল্প করতো, কখনো বা ভূষণও এসে যোগ দিত। একমাত্র পরীক্ষাটরীক্ষা না থাকলে, আমরা এইসময়টায় খোশ্‌গল্প করতাম বা ভূষণের গান শুনতাম। বৈচিত্র্যহীন পল্লিজীবনে এরকম সব সান্ধ্য বা নৈশ স্মৃতির মাধুর্য এখনো মনে করলে মনটা কেমন যেন উদাসীন হয়ে যায়। ব্যাপারগুলো কখনো কখনো ঘটতো বলে আমার কাছে তা বেশ উপভোগ্য ছিল। তখন যদিও ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ি, তবু ভূষণের পরণকথা, রূপকথার গল্প এবং রূপভান্‌ কইন্যার গাথা শুনতে বড়োই আকর্ষিত বোধ করতাম। জীবন বড়োর সাধারণ বিনোদনে তৃপ্ত হতো তখন।

ব্যাপারটা এইরকম একটা সময়েই আমার খেলায়ে এসেছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ভূষণ বিন্তিদিদির কাছে প্রায়ই গভীর রাতে আসে। বিন্তিদিদির ঘরের পশ্চিম দিকে বাইরে আসা যাওয়ার একটা দরজা ছিল। ভূষণ এলে, বিন্তিদিদিকে সে খুব সন্তর্পণে আওয়াজ দিত। যত আস্তেই দরজাটা খোলা হোক না কেন, শব্দ একটু হতোই। আমরা জেগে উঠে তাকে আওয়াজের বিষয় জিজ্ঞেস করলে, বলতো, বাইরে গেছিলাম। বাইরে মানে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে। কয়েকবার এরকম হলে আমি কৌতূহলী হয়েছিলাম, কারণ, বৌদি যদিও ভূষণের বিষয়ে কখনোই কিছু বলেনি, তবু বিন্তিদিদি পরপুরুষাক্ত, এই কথাটা বার বার শুনে আমার মধ্যে একটা বয়সোপযোগী এবং স্থানোপযোগী সন্দেহ দানা বেঁধেছিল। একদিন সন্দেহ সত্যে পরিণত হলো এবং তখনকার মানসিক গঠন তথা শিক্ষানুযায়ী বিন্তিদিদির ওপর একটা ঘৃণা আর বিরক্তিও বোধ করতে লাগলাম। এটা ভাবতেও আজকে আমার গ্লানিতে মাথা কাটা যাচ্ছে। ঘৃণা বোধটা কেন? কিন্তু আজকের বিচারবোধ বা সহনশীলতা, ঔদার্য সে যুগে কেউ তো আমাদের শিক্ষা দেয়নি। কিছু পরম্পরাগত কুশিক্ষা এবং ভণ্ডামিকেই তখন আমরা আদর্শ বা সঠিক হিসাবে মনে করতাম। ঘটনার স্বাভাবিকতা নিয়ে বিচার করতাম না। মানুষের অসহায়তা বুঝতাম না।

বিন্তিদিদি, পরে শুনেছি, স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে নাকি প্রায় দশ বারো বছর অপেক্ষা করেছিল যে তার বর দ্বিতীয় বিয়ে করলেও, তার একটা সম্মানজনক সামাজিক অবস্থানের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তা করা হয়নি। বাড়িতে এবং পাড়ায়, বৌদি এবং প্রতিবেশী মহিলা পুরুষদের কল্যাণে তার চরিত্র বিষয়ে মুখরোচক গালগল্প প্রথম থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার নিঃসঙ্গতার সমস্যা, যুবতীসুলভ শরীর মানসদাহের কথা, কোনো সমাজেই কেউ বিবেচনার দৃষ্টিতে বিচার করে না, এখানেও করেনি। সমাজটা কোনো কালেই সে রকম ছিল না। থাকাটা উচিত বা সম্ভব কীনা বলা মুশকিল। বিষয়টার জটিলতাতো অনেক।

ভূষণ ছোটবেলা থেকেই তাদের বাড়িতে রাখালি, পরে হালিয়াগিরি করতো। বাপের বাড়িতে ফিরে আসার পর এই বাল্যসাথী কিন্তু চাকর ভূষণই তার মানসিক সঙ্গী হিসাবে, এসব ক্ষেত্রে যতটা সম্ভ্রম ও সতর্কতা সম্ভব, সেইভাবে তার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই সম্পর্কিত হয়েছে। শরীর সম্পর্ক এসেছে অনেক পরে। তখন তারা দুজনেই পঁয়তিরিশ অতিক্রান্ত। কিন্তু সেই সম্পর্কটা যতটা জেদের বশে, ততটা প্রয়োজন বশে নয় এমনই মনে হয়েছিল আমার পরে। পাড়া গাঁয়ে ঐ বয়সী একজন মহিলার প্রয়োজন খুব বেশি উগ্র থাকতে পারে। একথা আমার আজ মনে হয় না। অর্থাৎ সে প্রয়োজন প্রাক্তন অভ্যাসবশত

হয়তো ঘটে, কিন্তু সে কারণে ঐ সামাজিক অবস্থানে, বিন্তিদিদির মতো প্রায় অনভিজ্ঞ এবং প্রায় প্রৌঢ়া একজন মহিলার পক্ষে ভূষণের মতো একজন তথাকথিত নিম্নজাতের মানুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে যাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। এর পিছনে বৌদি তথা পড়শিদের নিরন্তর খরজিহ্বার প্রকোপ ছাড়াও আরেকটা আশঙ্কাও নিশ্চয় ক্রিয়াশীল ছিল বলে আজ আমার মনে হয়, যে ভাইকে মানুষ করে, বড় করে, ভবিষ্যতের কিছুটা সুখস্বপ্নের আশা তার ছিল, সে যখন বিয়ে করে সংসারী হবে, তখন যদি তার উপস্থিতি তাদের সহ্য না হয়, সে কী করবে? সুতরাং যা থাকে কপালে ভেবেই বিন্তিদিদি গৃহত্যাগ করেছিল ভূষণের সঙ্গে প্রায় প্রকাশ্যেই। কিন্তু ব্যাপারটা নিঃশব্দে গোপনে হলেই হয়ত তার সম্মান কিছুটা বাঁচতো। লাঞ্ছনাটা অতদূর পর্যন্ত গড়াতো না। ব্যাপারটা সেরকম হয়নি।

প্রথম যে রাতে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি, সেদিন দরজার শব্দে আমার ঘুম ভাঙেনি। ঘুমটা ভেঙেছিল পাশের ঘরের কিছু অর্থপূর্ণ শব্দে। সেসব শব্দের একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। একে আমার মাথায় সন্দেহ এবং কৌতূহলটা ছিলই। তার ওপর ঐ শব্দ এবং ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তা, আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। ফিস্‌ফিস্ করে বললেও দুএকটা কথা বোঝা গিয়েছিল। 'তুমি যে এইরহম পেরায়ই আও, যদি কেউ ট্যার পায়?' 'কোনো কিছু যদি ঘডইয়া যায়?' 'ক্যাম্‌নে, হেলেতো তোমার বিয়ার পরেই অইতে বা এ্যাদ্দিনে তো কোমবার মেললাম না, কিছুতো আয়নায়।' 'আগে অয় নায় বল্‌ইয়া পরে অইতে পারবে না, ব্যাপারডা বোধ হয় হেরহম না। জানি না তো, ক্যাম্‌নে কী ঘডে। বিয়ার ষোল বচ্ছর পরও গভ্‌ভো অইতে দেখছি।' এইসব কথাগুলো মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। এরকম তিনদিনের অভিজ্ঞতা, পরপর না হলেও আমার হয়েছিল। তারপর আর সুযোগ হয়নি বা তার প্রয়োজনও ছিল না। সেদিনের ঘটনা রাতে ঘটেনি। ঘটেছিল দিনের বেলা এবং প্রকাশ্যে। কারণ সেটা ছিল রীতিমত একটা ঘোষিত বিদ্রোহ। আগের রাতে সেদিন ও বাড়িতে ছিলাম। পরদিন সকাল থেকে বৌদি যথানিয়মেই অশ্রাব্য ভাষায় বিন্তিদিদিকে গালমন্দ করছিল। যীশুদা এবং তার দাদাও পরস্পর ঝগড়া করছিল। ঝগড়ার বিষয়, জমিজমার ভাগ বাঁটোয়ারা সংক্রান্ত এবং বিন্তিদিদির স্বভাবচরিত্র। এর আগে বৌদি নানা কথা বললেও দাদা কখনো চরিত্র নিয়ে কোনো কথা বলেনি। সেদিন নাকি বাজার থেকে ফেরার সময় কোনো পড়শি শুভানুধ্যায়ী তাকে ভূষণের বিষয়ে একটু সতর্ক হতে পরামর্শ দিয়েছিল। অথবা নৈশ-ব্যাপারট্যাপার তাদেরও নজরে পড়েছিল। ঝগড়ার প্রাক্কালে কথাটা দাদা বলেই ফেলে। 'শ্যাষ তামাইত একটা চাকরের লগে নষ্ট অইলি?'

দাদা বলেছিল।

সাধারণত বিন্তিদিদি, তার মৃদু স্বভাবের জন্য অথবা মনে পাপবোধ থাকার জন্যই এসব কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর করতো না। অসহায় অবোলা প্রাণীর মতো চোখের জলে ভাসতো। সেদিন দাদা ভূষণের ব্যাপারে ঐ সব বলায় যীশুদা একেবারে হতভম্ব হয়ে বিন্তিদিদির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, একথা যদি সয়ত্য অয়—আমি তোর লগে থাহুম না। এবার বিন্তিদিদি আর পারেনি। বলেছিল, তোমাগো আসল ব্যাপারডা তো বাবায় আমারে যে পাচকুড়া জমি লেইখ্যা দেছেলে হেয়ার লইগ্যা ? তো হে জমির ধান তোমারই খাইও। আমার দরকার নাই। এ বাড়িথে ফিরইয়া আইয়া তামাইত দাসী বান্দির কাম না করইয়া তো একবেলাও খাই নাই। তোমাগো অসম্মানের কামও দেহন দষ্টব্যে কিছু করি নাই। তয় আইজ করমু। —বলে সে অত্যন্ত দৃপ্তভাবে ভূষণের ঘর থেকে তাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে বলল, আমি অরে ভালবাসি। ও জাতের হউক, বেজাতের হউক, যদি কেউ আমারে এ্যাটটুও সুখ শান্তি বা সোম্মান দিয়া থাকে, হেয়া অর ধারেই পাইছি। আমি এহনই অর লগে বাড়ি ছাড়ইয়া গেরাম ছাড়ইয়া যামু গিয়া। তোমাগো লগে আমার কোনো সম্পর্ক থাকলো না আইজ থিহা তোমাগো ধারে মরা। -বলে সে ভূষণের দিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ডোঙ্গাহান ঘাডে আছে ? — ভূষণ ঘাড় কাত কবে জানালো আছে। —তাইলে চলো।—বলে তার হাত ধরেই খালের খাটের দিকে প্রায় ছুটে চলে গেল। আমরা ওখান যারা ছিলাম, ঘটনার আকস্মিক নাটকীয় পরিণতিতে কিছুই বলতে পারছিলাম না। শুধু যীশুদা একটা জন্তুর মতো আর্তনাদ করে উঠে তাদের পিছনে ছুট লাগালো। আমিও। কারণ, আমার মধ্যে বিন্তিদির বিরুদ্ধে অনেক ঘৃণা এবং ক্ষোভ জমা হয়ে থাকলেও, তাকে বড়ো ভালবাসতাম। ব্যাপারটার এরকম একটা পরিণতি আমি চাইনি। ঠিক ঐ সময়টায়, বিন্তিদিদির ভূষণের সঙ্গে গোপন সংসর্গজনিত যে ক্লেদাক্ত অনুভূতিটা আমার ভেতরে ছিল, তার কথা মনে ছিল না। আমরা পাড়া গায়ের বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে বড় হচ্ছিলাম। স্বাভাবিক অস্বাভাবিক নারী পুরুষ সম্পর্কের চাইতে, উচিত অনুচিত বিষয়টাই আমাদের বেশি করে শেখানো হতো এবং সেটাও নারীপুরুষের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে। এই ব্যাপারে হিন্দু, মুসলমান কোনো সমাজেই বিশেষ বিভেদ ছিল না। নারীদের ক্ষেত্রে ঔচিত্য অনৌচিত্যের ব্যাপারটা, সবাই জানেন, একটা ভিন্ন মানদণ্ডে বিচার করা হয়ে থাকে এবং তা আজও। সেক্ষেত্রে আমি বা যীশুদাও, বিন্তিদিদির মতো একজন বিবাহিতা হিন্দু ভদ্রঘরের মহিলার পুরুষান্তরে জৈব-আসক্তিকে স্বাভাবিক ভাবে বিচার করার শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলাম না। তার ওপর প্রণয় পাত্রটি এক্ষেত্রে ভিন্ন জাতেরই শুধু নয়, তথাকথিত নীচু জাতের এবং চাকর। তার স্বামী যে

তাকে, কোনো সুযোগ না দিয়েই ত্যাগ করে, প্রায় অনতিবিলম্বে দারান্তর গ্রহণ করলো, সেটা আমরা হিসাবেই আনলাম না। কিন্তু বিন্তিদিদির চলে যাওয়ার মুহূর্তে, হয়তো তা আমাদের অল্প বয়সের কারণেই হবে, তার দোষের কথাটা আর স্মরণেই থাকলো না। তার স্নেহ, ভালবাসা, নিঃস্বার্থ সেবাযত্নের মধুর দিনগুলোর স্মৃতিই আমাদের দুজনকে খালের ঘাট পর্যন্ত দৌড় করালো। কিন্তু আমরা কী তখন চাইছিলাম আদৌ যে, বিন্তিদিদি ভূষণকে যখন ভালই বাসে এবং সেও যখন বিন্তিদিদিকে সম্মানের সঙ্গেই চায়, তখন তারা ঘর বেঁধে বাড়িতেই বা গ্রামের অন্য কোথাও থাকুক? বা তারা আদৌ ঘর বাঁধুক? না, এবং সেটাই পুরুষদের নিহিত স্বার্থ। সেটা একেক বয়সী পুরুষের ক্ষেত্রে একেক রকম, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তার মূল যে পুরুষদের স্বার্থ রক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাতে সন্দেহ কী? এক্ষেত্রে বোধহয় তথাকথিত শিক্ষিত অশিক্ষিতেও প্রভেদ নেই।

সেদিন খালের ঘাটে গিয়ে যীশুদা যখন বিন্তিদিদির পায়ে পড়ে তার আচরণের জন্য মাফ চাইল এবং আমরা দুজনেই তাকে ফিরে আসার জন্য, সব কিছু ভুলে গিয়ে আগের মতো হওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করছিলাম, বিন্তিদিদি, সেই সরল, স্বল্পশিক্ষিতা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং ভীরু বিন্তিদিদি যে প্রশ্নগুলো আমাদের করেছিল, তখন তার মর্ম আমরা বুঝতে পারিনি। বুঝেছি অনেক পরে, কিন্তু তখন কেউ কাউকে বলার মতো, বিশেযত, বিন্তিদিদির কাছে তার বক্তব্যের নির্ভূলতা স্বীকার করার মতো অবস্থানে ছিলাম না। বিন্তিদিদি বলেছিল, তোরা যেডা চাইতে আছো হেডা আর হয় না। ঐ সোমাজে আমার আর জাগা হওয়ার সম্ভাবনা নাই, ইচ্ছাও নাই। তোগো ছাড়ইয়া যাইতে আমার কষ্ট হইতে আছে ঠিকই, তয়, তোরা এহন যা ভাবইয়া আমারে ফেরতে কইতে আছো, দুইদিন পর হেই ভাবনা তোগো কৈলোম আর থাকপে না। তহন কিন্তু আমারে একজোন খারাপ চরিত্তিরের মাইয়া মানুষই ভাববি। আর, আগের মতো হইয়া থাকনের কোনো উপায় আমার নাই, তোরাও ভূষণ আর আমার একলগে থাকনডা মান্ইয়া নেতে পারবি না। যাইতে আমাগো অইবেই। জানিনা, হয়তো এডাই ভাল অইলো।

বিন্তিদিদি এও বলেছিল যে এই সিদ্ধান্তটা সে এবং ভূষণ হঠাৎ করে নেয়নি। অনেক ভেবেচিন্তেই নিয়েছে এবং তারা পরে কী ভাবে জীবন যাপন করবে তাও ঠিক করাই আছে। সংসারে যে যার মতো বাঁচে, যা চায়, তার কিছু অন্তত পায়। তারাইবা সব আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দেবে কেন? এই অসম্মানের এবং অনিশ্চিত জীবনের ভার সে আর বহন করতে চায় না। নতুনভাবে বাকি জীবনটা

কাটাবার একটা চেষ্টা করার জন্যই তারা খোলাখুলি এভাবে সবাইকে জানিয়েই চলে যাচ্ছে। আমরা জানতে চেয়েছিলাম, কোথায় যাবে তারা, কীভাবে ভবিষ্যতে যোগাযোগ করা যাবে তাদের সঙ্গে। সেটা তারা বলতে রাজি ছিল না। শুধু বলেছিল, তাতে লাভ নেই। তারা এই বাড়ি এবং বাড়ির লোকদেরই ছেড়ে শুধু যাচ্ছে না। তারা এই সমাজটাই পরিত্যাগ করছে। তারা দেখতে চায়, নতুনভাবে বাঁচা যায় কীনা।

ভূষণ আগে কোনো কথা বলেনি। নৌকোয় উঠে বিস্তিদিদিকে হাত ধরে উঠিয়ে বলেছিল, মোর সমাজেও জাগা পামু না মোরা। হেহানেও অসোম্মান। মোগো বিচ্‌রাইয়া বাইর করতে অইবে, কোথায় একজন মোর ল্যাহান মানুষও হ্যার ভালবাসার মানুষরে লইয়া সোম্মানের জীবন পাইতে পারে। কামডা সোজা না, তয়, চেষ্টা করণে দোষ কী? আপশোস, চেষ্টাডা আগে করি নায় ক্যান।

তারা যদি ঝগড়া, রাগারাগি করতো, আমরাও দুকথা ভালমন্দ বলতে পারতাম। কিন্তু তারা দুজনেই মানসিক ভাবে এমন নির্ভার ছিল যে আমরা কিছু বলার সুযোগই পেলাম না। আমি শুধু বিস্তিদিদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভূষণ যদি তোমারে ছাড়ইয়া দে, তহন তুমি কী করবা? —বিস্তিদিদি বলেছিল, ওডা অবিশ্বাসের কথা। ভবিষ্যতের কথা কেউ জানে না, যদি হেরহম অয়ই, তহন আবার নতুন করইয়া ভাবোন যাইবে। হারা জীবনের ভাবনাডা কী এক লগে ভাবোন যায়?

আমাদের দুজনকে খালপারে হতভম্ব এবং ধ্বস্ত অবস্থায় রেখে, দুজনে দুখানা বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দিয়েছিল। মনে অনেক সংস্কার এবং দ্বিধাবশত ক্ষুব্ধ হলেও একটা প্রশান্তিও সেদিন যেন অনুভব করেছিলাম।

এরপরে আর দেশে থাকাকালীন বিস্তিদিদিদের কোনো খবর শুনিনি।

আঠারো

জোছনায় নীল শায়রের শালুক এবং সন্ন

বসুদেব 'এহনই হ্যারগো ডাইক্যা আনতে আছি, আপনেরা এ্যাটটু বয়েন' বলে, সেই গিয়েছিল, এলো প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে। এই সময়টাতে হক আর আমি নানান পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম। সেই প্রসঙ্গেই যীশুদাদের বাড়ি, পরিবার এবং বিন্তিদিদির এত কথা বললাম। ভেবেছিলাম, আমি এসেছি এতকাল পর, একথা শুনলেই যীশুদা সঙ্গে সঙ্গে সন্নকে নিয়ে ছুটে চলে আসবে। কিন্তু সেই যীশুদা আর নেই। দেখলাম সে একজন এখন একেবারেই ভিন্ন মানুষ। যাকে ছোটবেলায় বোকাসোকা, সরল সোজা এবং আবেগপ্রবণ একজন চঞ্চল যুবক হিসাবে দেখেছি, এখন সে একজন ধীর স্থির, গম্ভীর প্রকৃতির প্রায় বৃদ্ধ মানুষ, যদিও শারীরিক বাঁধুনী, মুখের সদাসর্বদা হাসিটা এখনো সেইরকমই আছে। যে সব মানুষকে দীর্ঘদিন পরে দেখলেও চিনে নিতে অসুবিধে হয় না, যীশুদা সেই দলের। তফাতের মধ্যে চুলে বেশ পাক ধরেছে। সেটা অবশ্য বয়স বিচারে কিছুই না প্রায়। আমি হিসাব করে দেখলাম, সে এখন পঁয়ষট্টি, ছেষট্টির বৃদ্ধই, কিন্তু দেখে মনে হয় চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন হবে বড়ো জোর। সন্নও বেশ গিন্নিবান্নি।

স্বভাবসম্মত ভাবে যীশুদা আগের মতো ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা সে করলো না। সামনে এসে দুহাত জড়ো করে নমস্কার জানিয়ে বললো, জয়গুরু। কী ভাইগ্য আমাগো আইজ। তোমরা আমাগো ঘরে আইলা। —আমি আবেগচঞ্চল ছিলাম। উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতে, সে বললো, জড়াইয়া ধরনের অদিকারডা নিজের সম্প্রদায়ের মইদ্যেই রাখছি। জানো বোধায় আমরা আর আগের সোমাজে নাই। আমারও পেরাণডা চাইছেলে জড়াইয়া ধরতে, তয় তুমি যদি কিছু মনে কর, হে কারণ সামলাইয়া আছিলাম, ভাইডি।

হ, শুনছি, তোমরা মতুয়া অইছো, হবোলা। ঠিক তো?

না, মোরা সব সম্প্রদায়ের আশ্রম, আখড়ায়ই যাই। সম্প্রদায় হিসাবে আমাগো কণ্ঠিধারী বৈষ্ণবই কইতে পার। কিষ্ণমন্তরি।

জয়গৌর, না জয় নিতাই?

দ্যাহ, এ দ্যাশে তো আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ের আর তেমন অস্তিত্ব নাই, বোজলা না? হক ভাই কিছু মনে করইও না, হেই সোমায় তুমি আপইত্য না করলে হয়তো মুসলমানই অইতাম, এহন তো তোমাগো ধারে হিন্দু আর স্যান্ ভাইগো ধারে জাত খুয়ানইয়া বেজাত বৈষ্ণব। আবার যে সোমাজে আছি হেহানেও চৈদ্দডা দল। জাইতের জ্বালা গেল না। মোরা এটটু বড়ো গাছে নাও বানথে চাইছেলাম।

মোছলমান অইলেও এয়ার থিহা যে পার পাইতা, এমন বাসি না। —একথা হক জানায়। কিন্তু যীশুদা এরকম বিচার বিবেচনায় এবং নম্রতায় কথা বলা কবে শিখল? এটা কী বৈষ্ণবী জীবন চর্চার অবদান? সেই 'তৃণাদপিসুনীচেন'? যখন এই রকম একটা চিন্তা মাথায় নিয়ে যীশুদাকে কিছু প্রশ্ন করার উদ্যোগ করতে যাচ্ছি, হক বললো, থো ফালাইয়া এইসব ক্যাচাল। এ্যাদ্দিন পর একজাগায় অইছি কী ছাতার জাইত পাইতের ছেরাদ্দ করার লইগ্যা? আর কোনো কতা নাই মোগো?

হেইযাই ভালো। আয়ো বেয়াকে এ্যাটটু গুছাইয়া বই। তো কও ভাইডি কবে আইলা?

আইছি দিন পাঁচেক আগে। হকের বাড়িতে প্রেথমে ওঠছেলাম। এর মইদ্যে ওর পোলা আর জব্বারের মাইয়ার আচুক্কা বিয়া লাইগ্যা গ্যালে। হেইয়া লইয়া কয়দিন হৈচৈ গ্যালে।

আচুক্কা বিয়া? আগে ঠিক আছেলে না? --এ প্রশ্নের উত্তর দিল হক, বলল, আমাগো ওহানের বিয়া তো এইরহম আচুক্কাই অয়। সন্নর বিয়ার কথা মনে নাই? নিরঞ্জনইয়ার লগে? তয়, যীশুদা তুমিই কৈলোম আখেরে জেত্‌লা। নাকি কও?

আমি হলে প্রসঙ্গটা এভাবে তুলতে পারতাম না। সংকোচ বোধ করতাম। যীশুদা, সন্ন কী মনে করবে, আঘাত পাবে কীনা, অস্বস্তি বোধ করবে কীনা, এইসব সাত পাঁচ ভাবতাম। আমার মধ্যের শহুরে মধ্য বিত্তচিত পালিশটাই এর জন্য দায়ী। দেখলাম, সেসব আদৌ কিছু না। বরং যীশুদা চেঁচিয়ে সন্নকে ডেকে বলল, সন্নময়ী হোন্‌ছো? আরে পাকের ঘরডায় করতে আছো কী? এহানে আয়ো।—এতক্ষণে যীশুদাকে স্ব-ভাবে পাওয়া গেল। সন্ন ধীর পায়ে এসে দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো—চেচায় কিয়া? মুই এ্যাটটু চা জাল্ দেতে আছেলাম ওনাগো লইগ্যা।

আরে, এহন চা জাল্ দেলে অইবে? মোরা খামু কোতায়? —হক জানতে চায়। —যীশুদা এবং সন্ন দুজনেই এবার লজ্জিত ও বিব্রত হয় স্পষ্টত। যীশুদা জিজ্ঞেস করে বেশ অবাক ভাবেই, তোমরা মাইনে, মোগো ঘরে ভাত খাবা?

তয় কী এ বেলা মোগো উপাস করাইয়া রাখফা? ও সন্ন, ছেমরি তুই কতা কও না কিযা? —হক রীতিমত ঝাঁঝিয়ে ওঠে। যীশুদা আম্‌তা আম্‌তা করে জিজ্ঞেস করে, মাইনে, মোরগো হাতে স্যানেও খাইবে? তোমার কতা জানি। মেঞাগো কেউ কেউ মোগো লগে খায়, কেউ খায় না। আইজ কাইল আবার মেঞরাও খুব ছোয়া ছানা মানে দেহি। জাইত ও।

ক্যান্, তোমাগো আপইত্য আছে?

এবার যীশুদা আর সন্ন দুজনেই কেঁদে ফেলে। সে এক দীর্ঘ বাঁধভাঙা অশ্রুপ্লাবন যেন। বুঝলাম এরা এক কুয়ো থেকে আরেক কুয়োতে এসে পড়েছে। কোনো বৃহৎ জলাশয়ের খবর এদের কাছে এসে পৌঁছোয়নি। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম। হকতো বুঝেছিলই। আমি তাদের দুজনকেই শান্ত করে, যীশুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, বিন্তিদিদির ধারে আমরা দুইজোনে কতদিন পাশাপাশি বইয়া খাইছি, যীশুদা?

তহন তো জাইতে আছেলাম ভাই। এহন তো মোরা আর জাইতে নাই। এহন বেজাইত। না ক্যাওর ধারে যাইতে পারি, না কেউ মোগো ধারে আয়। দিদিগোও হেই অবস্থা।

দিদি কোথায়? তোমার লগে যোগাযোগ আছে তারগো?

আছে বরাবইরই। দিদিগো দ্যাহাদেহিইতো মোরাও এই সম্প্রদায়ে আইলাম। হ্যারা থাহে নবদ্বীপে। প্রেথমে মাদারিপুরে আছেলে। মুক্তিযুদ্দের সোমায় একদল গুরুভাইগো লগে ওদ্যাশে যাইয়া শ্যাষম্যাষ নবদ্বীপে আশ্রম করছে। এউক্কা মাইয়া, এউক্কা পোলা। পোলাডা ল্যাহাপড়ায় খুব ভাল অইছে। এম.এ. পাশ, ভাল সরকারি চাকরি করে। মাইয়ায়ও বি.এ.বিটি। ইস্কুলে মাষ্টেরি করে। দিদি ভূষণের লগে বাইর অইযা সমাজে জাত খুয়াইছে সয়ত্য। তয় জীবনে সুখী হইতে পারছে, শান্তিতেই আছে। এডা হাচাইও আনন্দের কথা। আর যে সোমাজে গেছি, হ্যারা মোগো ফ্যালইয়া দে নায়।

আমারও যে কী আনন্দ লাগতে আছে তোমার কথা শুনইয়া কইয়া বুঝাইতে পারুম না। তো তোমার তো দুগ্‌গা পোলা। হ্যারগো খবর কী? পড়াশোনা করাইতে পারছ?

দুইডাই গ্যারজুয়েট অইছে। বড়োডা বৌ লইয়া ঢাকা থাহে। ব্যাঙ্কে চাকরি। অফিসার। চৈদ্দ হাজার টাহা ব্যাতন পায়। মাজে মইদ্যে ছুডিছাডায় আয়।

ছোডডাও চাকরি করে একটা পরিবহন কোম্পানিতে। খারাপ না। তয়, এহনও হ্যার বিয়াডা দি নাই। দিমু শিগ্‌গীরই।

বঃ। তুমিতো হেলে এহন বড়োলোক, নাকি? চাকরি কী এহনও করতে আছো? হক কইছেলে, কী বাসে না কীসে চাকরি করতা নাকি?

হ। আর মাস তিনেক আছে। এক্‌সটেনশনে আছি। এবার অবসর নিমু। গুরুর কিরপায় ভালই আছি। অভাব নাই, তয় বড়োলোকীও নাই। ওথে মোগো বড়ো ভয় করে।

বড়োলোকীতে ভয় করে, কথাটা শুনে বড়ো ভাল লাগলো। যীশুদা, সন্ন এরা দুজনে দুজনকে পেয়েছে; বিন্তিদিদি, ভূষণ, তারা দুঃখ সাগর সাঁতরে জীবনে স্থিতি পেয়েছে। তাদের সন্তানেরা কৃতি হয়েছে। আর কী? জাত পাত ধুয়ে কী জল খেতো? দেশভাগের প্লবতার এটা নিশ্চয় একটা সদর্থক দিক। সমস্যা আছে। সমস্যা ছাড়া জীবন কোন যুগে সম্ভব ছিল? হয়তো এইসব ঘটনাগুলো ব্যক্তিরই ক্ষেত্রে শুধু, সামগ্রিক সমাজের নয়, তবু এই যাত্রায় আমি বড়ো সুখের আস্বাদ পেলাম। একদিন এই ঘটনাগুলো জড়ো হয়ে, সমাজের সর্বস্তরে সন্তুষ্টি, সমৃদ্ধি আসবে, এরকম একটা স্বপ্ন আমার মনে এলো। আমি যেন এইসব তাবৎ ভাঙচুড়ের মধ্যে একটা ভিন্ন সমাজ-নির্মাণের আয়োজন উপলব্ধি করলাম। এইই বা কম কী? সব সময়েই তো হতাশায় ভুগি।

সন্ন চা আনতে চলে গিয়েছিল। তিন কাপ চা আর এক প্লেট কুচো নিমকি ভাজা নিয়ে এসে বললো, আমরা তো নিরামিষ্যি খাই। মাছ, মাংস, ডিম, প্যাজ বারণ। আপনেরা খাইবেন হ্যানে কী?

বললাম, নিরামিষ্যি আমার অসুবিদা নাই। হক কী খাবি? তুইতো আবার শ্যাখ।

আণ্ডার ঝোল, ডাইল, তরকারি এইসব খামু। হ্যারা আণ্ডা খায় না, রান্ধনতো বারণ না। মুই মোছলমান, নিরামিষ্য খামু কিয়া?

না, রান্ধনে কোনো মানা নাই। হেয়া ছাড়া, অতিথ যা স্যাবা করবে, হেয়া করাডা তো গুরু স্যাবার তুল্য। যা, বসুদেব মোড়ের দোকান থিক্কা ডিম লইয়ায় গোডা দশেক।

আমি বললাম, পচ্চিমবঙ্গের নানা জাগায় দেখছি, বাবাজিগো ঐসব খাওয়া বারণ, তয় ঘোপে ঘাপে খায়। এক বাবাজি কইছিল, খাইতে দোষ নাই, খালি নামডা এটটু বদ্‌লাইয়া লইয়া খাইলেই অইলো।

হেয়া কেমন? যীশুদা জানতে চায়।

ঐ ধরো মাছেরে মাছ কইলে আর খাওন যাইবে না। হেডার নাম যদি রাহো

গৌর-পটল। তয় আর অসুবিদা নাই। গৌরের কৃপায় চল্‌ইয়া যাইবে হ্যানে। হেরহমই ডিমরে নাম দেও কোঁৎফল। শুদ্ধ অইয়া যাইবে হ্যানে।

যীশুদা বললো, এ দ্যাশে ওসব চলবে না। গুরুভাইরা বড়ো ভক্তিমন্তো, শুদ্ধাচারি। ট্যার পাইলে এই জাইতটাও থাকপে না। তহন যামু কোন চুলায়?

ক্যান্। জাইতের ভেদাভেদ নাই নাকি?

নাইইতো। তয় খাদ্যাখাইদ্যের বিচারডা আলাদা। - হক বলে।

ঐয়ার ল্যাজ ধরইয়াই তো জাইত পাইত ভেদাভেদ আয়।

না ভাই, অত বুজিনা। অনেক কষ্ট করইয়া এই এট্টা অবস্থায় এহন আছি। এই বয়সে হেডা নষ্ট করন যাইবে না। না অয় শাক পাতাই খাইলাম।

এহানে সব ধম্মেই কড়াকড়িডা বেশি। এই যে মুই বাহাস করার সোমায় লোম্বা চওড়া বাত্ কই, মুই কিন্তু কইলাম না যে গোস্তো-ভাত খামু। কইলাম আণ্ডা খামু। মাছ অইলেও চলবে। কিন্তু এহন্ বাজারে যাইয়া, এতো বেলায় মাছ পাইতে না। গোস্তো হয়তো পাইতে, আইজ কাইল শহরের দোকানে অনেক বেলা তামাইত থাহে। কিন্তু হেডা যদি জবাই করা না হয়? হেকারণ, গোস্তো চলবেই না। অবইশ্য হেডাও কৈলোম তোগো ঐ বাবাজি গো আণ্ডা আর মাছ খাওনের ল্যাহান। নাইলে গোস্ত কইতে বাদ দি নাকি কিছু?

সর্বশেষ যীশুদার সিদ্ধান্ত, 'তোমরা খাও ভাই, আমরা যহন ছাড়ইয়াই দিছি, ধরইয়া আর কাম নাই। হেয়া ছাড়া এ দ্যাশে মাছ কও, মাংস কও আর ডিম কও, বড় মাহেঙ্গা। মাছ তো পাওয়াই যায় না। হেদিন আর নাই।'

বসুদেব দোকান থেকে ডিম আর আলু পিঁয়াজ এনে তার মাকে বললো, এডা তোমার রানথে অইবে না। নিরামিষ্যডা তুমি রান্ধো পরে মুই এডা রানমু হ্যানে। আর হ্, খামুও। তোমরা খাও আর না খাও।

তুই ডিম খাবি?

খামুনা ক্যান্। মুইতো আর মোন্তর লইনায়। হোটেলে তো খাই।

কথাটা বোধহয়, সন্ন আর যীশুদার জানা ছিল না। তারা একটু আহত বোধ করছিল মনে হলো। যীশুদা বলল, তোর দাদায়ও খায় নাকি?

খায়না তয়? ঢ্যাকা গ্যালে মোরা বেয়াকই খাই।

কিষ্ট মন্তরীর পোলা অইয়া তোরা মাছ, মাংস, ডিম এইসব খাও?

ওসব আইজ কাইল বেয়াকেই খায়। মোগো খাইতে দোষ কী?

ব্যাপারটা অন্যদিকে গড়াচ্ছে দেখে আমি বললাম, যীশুদা, যুগটা পাল্টাইয়া যাইতে আছে। ওরা এই যুগের পোলাপান। আগের দিনের আচার বিচার ওরা

মানবে ক্যান্? হেয়া ছাড়া, এহানেই খালি দেহি এহনও জাইত ফাইত, ছোঁয়াছুঁয়ির বা খাদ্যাখাদ্য লইয়া ক্যাচাল। ও দ্যাশে কৈল্যোম কোনো সম্প্রদায়ের মইদ্যেই এসবের মাইন্যতা। হেহানে হিন্দুগো অনেকেই গরু খায় বাড়িতে রান্ধইয়াও। ভালই খায়। আবার এহানে ঢাকায়ও দেখছি বিখ্যাতগো মইদ্যে কেউ কেউ হালাল, হারাম মানে না। বেবাকের কথা জানি না, তয় একজন বিখ্যাত কবি এবং অইধ্যাপক, আমার ধারে কাছিমের মাংস খাইতে চাইছেলে। তো কই, অরগো, অরগো মতো চলতে দেও। তোমাগো তো অরা জোর করতে আছে না। তোমরাই বা জোর করো ক্যান্? য্যারা মানবে হ্যারা মানুক, য্যরা খাওনের হ্যারা খাউক।

যীশুদা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, হেয়ার লইগ্যাই তো ও দ্যাশে গেলাম না। দিদির পোলা মাইয়া দুইডাও ঐরহমই অইছে। হ্যারাও কিছু মানে টানে না। —আমি বললাম, ওরা পড়াশোনা করইয়া বড়ো অইছে। ভালমন্দ, ঠিক বেঠিক লইয়া নিজেরা বিচার করইয়া যেডা বোজবে সঠিক, হেইডা করবে। এথে দুঃখ পাওনের কী আছে? আর এসবতো মাইনসেই খায়।

যীশুদা এবং সন্নর বিয়ের ব্যাপারটার উল্লেখ করে হক বললো, হেই সময় ওহানকার হিন্দু সমাজে এই বিয়া নিয়াই যে হুজ্জোতি অইছিল, তহন কিন্তু তোমরা যেডা করছিলা হেডা বিদ্রোহ। হেডা যহন মানতে পারছিলা, এইসব মানতে আফইত্য কী?

না, সোমাজের ব্যাপারডা আছে না। তোমরা ঠিক বোজবা না।

তোমাগো সোমায় যেডা অইছিলো হেডাও তো সোমাজেরই ব্যাপার, নাকি? আসলে স্যানে, মোরা কী হিন্দু আর কী মোছলমান, আর হ্যারগো মইদ্যের য্যাতো টুকড়া টাকড়া গুষ্ঠি, বেয়াকেই খালি ঐ লোমের সোমাজের ডরে মরি। আমরা অন্যেরে যহন কই তহন এক কেছেমের বাহাস করি, নিজেগো আচার আচরণ অয় অইন্য রহম। মুই কিন্তু মোরে বাদ দিয়া, বা মোগো সোমাজের কতা বাদ দিয়া এ কথাডা কইলাম না। কী কইছি বোজজো? মাইনে, মুই কাছিম খামু না। আবার খামুও। তুইও গরু খাবিনা আবার খাবিও। এইরহম করতে করতেই এক সোমায় সব ঠিক অইয়া যাইবে।

ঠিকই কইছো। তয় আমার এ্যাট্টা ধন্দো রইয়া গেলো। যে এত পরিষ্কার চিন্তার মানুষ, হে আগে কী করইয়া লিগের সমর্থক আছিল, আর এহন বি এন পির রাজনীতি করে। তোরে এ যাত্রায় ঠিক বোজতে পারলাম নারে। তুই আসলে কী, কছেন।

মুই বিন এপ পির রাজনীতি করি, তোরে কইলে কেডা?

বাজারেই শোন্‌ছেলাম য্যানো কার মুহে।

রাজনীতির ব্যাপারডা সব দ্যাশেই আলেদা, এ দ্যাশে এ্যাট্টু বেশিই আলেদা। কিন্তু রাজনীতির কতা এই বৈষ্ণব গোসাইর বাড়িতে না কওয়াই ভাল। ওয়া বরং মোর বাসায় বইয়া অইবে হ্যানে। এহন এত্‌খুন যা আলোচনা অইতে আছিল হেই সবই হউক, কী কও যীশুদা?

একছের ঠিক। লোমের রাজনীতির কতা ছাড়াও মোরগো অনেক কথাই কওনের আছে।

আবার সেই পুরোনো কথায়ই একসময় ফিরে যেতে হয়। সন্ন আর বসুদেব রান্না ঘরে ব্যস্ত। আমি নিরঞ্জন আর সুবলরানির কথা জানতে চাইছিলাম। হকই এককথায় থামিয়ে দিল। বললো, ঐ ব্যাপারডাও থাউক। যে কথার আগাগোড়া বেয়াকটাই মাইন্‌সের কুআচারের কথা, যেয়ার মইদ্যে একফোডাও দেশের কথা, মাইনের কতা নাই, হে কথায় সোমায় নষ্ট করইয়া লাভ কী? হেয়া ছাড়া, এই মানুষ দুইডা তো হেই দোজখের আগুনের মইদ্য দিয়া পার অইয়া, মহব্বতের বেহেস্তে আইয়া ডেরা বান্‌থে পারছে, এহন আর হেই আজরাইলেগো দিয়া মোগো দরকারডা কী?

যে কথাটায় আমি পৌঁছোতে চাইছিলাম, সেটা হলো, সন্ন শেষ পর্যন্ত শুধু নিরুপায় হয়েই যীশুদাকে আশ্রয় করেছে, না তার মধ্যে ক্রমশ এই মানুষটির দীর্ঘ তপস্যা তিতিক্ষার কারণে প্রকৃত ভালবাসার উদয় শেষ পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। বিন্তিদিদির সঙ্গে ভূষণের প্রেম যে শরীর ছাড়িয়েও অন্য গভীরতায় ছিল, যা গ্রাম্য সমাজে সাধারণত দেখা যায় না, যার স্ফূর্তি পাওয়ার কোনো উপায়ই থাকে না, সে বিষয়ে প্রায় পুরোটাই ঐ বয়সে এবং ঐ যুগেও আমার বোধে এসেছিল। সংস্কারের আবিলতা থাকলেও, একসময় তা কেটে গেছে। তাদের দেখা আর পাইনি, কিন্তু ক্রমশ সংস্কারের মিথ্যে থেকে একসময় মুক্ত হয়ে, তাদের মনে মনে শ্রদ্ধা করেছি, জয় দিয়েছি তাদের নামে। যীশুদার বিষয়ে আমার কোনো ধন্দ ছিল না। কিন্তু সন্ন? সন্ন কী তার সুন্দরীসুলভ অহংকার ছুঁড়ে ফেলে যীশুদাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছে?

মনে তখনকার সেই আগান বাগানে, ছাড়া ভিটেয় উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর দিনগুলোর কথা। তখন সন্নর কত কাণ্ডই না দেখেছি। সন্ন যে অসামান্যা সুন্দরী ছিল, তার চোখ, মুখ, নাক ইত্যাদির বর্ণনায় সেকথা বলা যাবে না। সেসব, বা গায়ের মাজা ফর্সা রঙ, অনেক কিশোরী, যুবতীরই ঐ বয়সে থাকে। যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা. সে নিয়ে বলছি না। যে কারণে সন্নকে আমি অসামান্যা বলছি

তা ছিল তার অতি ঘন এবং দীর্ঘ বিপুল চুলের আয়োজন। আর অদ্ভুত দেহ সৌষ্ঠব। যেমন ডাঁটো লম্বা দেহকাণ্ড, তেমনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন। যে কোনো কিশোরী, যুবতী অথবা বয়স্কা রমণী ঐরকম দেহবল্লরীর জন্য গৌরব করতে পারে। অথচ সে ছিল প্রায় নিত্য উপোষী এক ভিখিরি বামুনের মেয়ে। যীশুদাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরাও ঐ উদাসী দিনগুলোতে, ওখানের ছাড়া ভিটে বা ঝোপঝাড়, পুরোনো জমিদার বাড়ির পুকুর ঘাটে অকারণে ঘুরে বেড়াতাম না। অন্য সব কিছু বাদ দিয়েও, সন্নর ঐ বিপুল কেশভার, যা দিয়ে সে কখনো কখনো নগ্নতাকেও বাধ্য হয়ে আবৃত রাখার প্রয়াস পেতো, সে যে কী আশ্চর্য সম্মোহে আমাদের আচ্ছন্ন করতো, তা আজও দেহে মনে শিহরণ জাগায়।

সেই পুকুর ধারের নিরালা ঝোপে, যেখানে কিশোরী সন্ন, যীশুদার ডাঁসা বা পাকা পেয়ারার, কিম্বা অন্য কোনো আকর্ষক খাদ্যবস্তুর লোভে যেতো এবং তার আলিঙ্গনে ধরা দিত, সেই গোপন জায়গাটি আমাকে প্রায়শই আকর্ষণ করতো। কাজটা হয়তো অনেকের কাছেই কুরুচির মনে হতে পারে এবং তখন উঠতি বয়সী আমারও মন যে খুব নির্মল ছিল তাও বলছি না। তবে তাদের প্রণয়লীলা দেখে আমি যে খুব আনন্দিতও হতাম, একথাও সত্য। আড়ালে থেকে আমি তাদের কাণ্ডকারখানা দেখতাম, কথাবার্তা যতটা শোনা যায় শুনতাম। সেইসব কথা যতটা প্রেম বিষয়ক, তাব চাইতে অনেক বেশি দুঃখের বারমাস্যা। যেভাবে আড়ালে থেকে, তাদের প্রেমপর্ব দেখা এবং আলাপচারিতা শোনার কথা আমি বলছি, তা কতটা সম্ভব, সেটা আজকের জনবহুল নগরবাসী কারুর পক্ষে অনুমান করা দুরূহ। কিন্তু যে স্থানে এবং যুগে, এটা সম্ভব ছিল, তার তৎকালীন জনহীনতা, প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর বিষয়ে যাদের ধারণা আছে, তারা নিশ্চয়ই সেটা অসম্ভব বলে মনে করবেন না। জমিদার বাড়ির পিছনের ঐ পুকুর ধারের ঝোপ-জঙ্গল-পূর্ণ স্থানটি সন্নদের বাড়ির থেকে সামান্যই দূরবর্তী ছিল। গ্রাম তখন নিতান্তই জনবিরল। তফাতের গ্রামান্তরে যাবার রাস্তাটিতে কদাচিৎ এক আধজন মানুষ হয়ত চলাচল করতো এবং ঝোপের মধ্য থেকে তা দেখা যেত। তথাপি ব্যাপারটি বিপদ সংকুল এবং ধরা পড়ার সম্ভাবনা একেবারে থাকত না এমন নয়। তবে, এতদ্‌সত্ত্বেও, প্রেম মানুষকে দুঃসাহসী করে একথাও মোক্ষম সত্য। কিন্তু সে কথা থাক।

যীশুদাকে পরে একদিন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল, —তুই জানলি ক্যামনে?

সত্য কীনা কও।

দেইখ্যাই যহন ফ্যালাইছো। তহন আর মিথ্যা কই ক্যামনে। তয় মঞ্জুদায়গো বেয়াকেই জানে যে, সন্নরে আমি ভালবাসি। আর হে কারণেই কই, সন্নর কোনো বিপদ অইতে পারে, তেমন কাম আমি অন্তত করমু না, বিশ্বাস যাইতে পারো।

ওরে একখান কাপড় তো দিতে পারো।

অসুবিদা আছে। বাড়ির মাইন্‌সে বা পাড়া পড়শিরা যহন জিগাইবে, পাইলি কই? কী জবাব দেবে হে। হেয়া ছাড়া আরও কথা আছে।

কী?

যীশুদা বলেছিল, সন্ন যহন বাড়িতে ঐ রহম চুল দিয়া নিজেরে ঢাইক্যা কাপড় হানে হুগাইতে দে, তহন তো অনেক বদ্‌মাইশই, ছোডো কও আর বুড়া কও, হুত্‌তি মারে। হেইরহমই কেউ কেউ এক আধ্‌খান কাপড় দিয়া গায় হাত দিতে চায়, সুবিদা নিতে চায়। হে কারণ, সন্ন আমারেও ভয় পায়। যদি কাপড়ের বদলে বেশি বাড়াবাড়ি করতে চাই। কী কইছি বোজজো? তয় তোরে কই, ঐ রহম আড়াল থিহা আর নজর রাহিস না। —আমি বড়ো লজ্জা পেয়েছিলাম এবং আর কোনোদিনই আড়ি পাতার ইচ্ছা আমার হয়নি। প্রয়োজনও না। কারণ এইসব বৃত্তান্ত যীশুদার কাছেইতো জানতে পারতাম। তখনকার বয়সে ঐটুকুতেই যথেষ্ট কৌতূহল মিটে যেতো।

এখন যীশুদার বারান্দায় আমরা তিনজনে যখন পুরোনো স্মৃতি আওড়াচ্ছি তখন, নানান কথার মধ্যেই এইসব আমার মনে পড়ছিল, আর অন্যমনস্ক হয়ে

ধলুর মনে সন্দেহ ছিল সন্ন যীশুদাকে আদৌ ভালবাসে কীনা। যে বয়সের কথা এতক্ষণ, নানাভাবে বলেছি, তখন যে তা ছিল না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তখন সন্নর লোভ ছিল, সৌন্দর্যের অহংকার ছিল, এককথায় যাকে ছিনালিপনা বলে তাই ছিল। তার তখনকার অবস্থার কথা চিন্তা করে, আজকের এই পরিণত বয়সের বিচারে তাকে খুব একটা কেন, আদৌ দোষ দিতে পারি না: দারিদ্য, শিক্ষা দীক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অবশ্যই যীশুদার বয়স আর চেহারার কথা চিন্তা করলে, সন্ন তাকে কিছুতেই অন্তর দিয়ে ভালবাসতে পারে না। মানুষটাকে বোঝার মত বুদ্ধি, বয়স বা হৃদয়বৃত্তি তার ছিল না। আমার জানতে ইচ্ছা করছিল যীশুদার তিতিক্ষা কী সন্নর ভালবাসা, তার প্রতি আকর্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল? আগেই বলেছি বিন্তিদিদি ও ভূষণের ব্যাপারে আমি, যেদিন তারা বিদ্রোহ করে চলে যায়, সেদিনই অনেকটা বুঝতে পেরেছিলাম,

পরে বিচার বুদ্ধি একটু পরিণত হলে, স্মৃতি রোমন্থনে পুরোটা। যীশুদা সন্নর ব্যাপারটার পরিণতি এবার এসে শুনলাম এবং দেখলামও খানিকটা। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা একমাত্র যীশুদা বললেই হয়তো বুঝতে পারব, নচেৎ একদিনে তা বোঝা সম্ভব নয়। অথচ আমি তো আকুল ভাবেই মনে মনে চাইছি যে যীশুদা যেন তার ভালবাসার জমার ঘরে শূন্য পেয়েই, অশ্বত্থামার মতো পিটুলি গোলা জল দুধ ভেবে পান করে নৃত্য না করে। মানুষটার জীবনে ভালবাসা, স্নেহ, মমতা ইত্যাদির বড়ো অভাব ছিল। আমি জানি, সেটা যেমন ঘরে, তেমনি পরেও।

রান্না হয়ে গেলে সন্ন খেতে ডেকেছিল। হক বলেছিল, যীশুদা আমাগো লগে বইবেতো? না, জাইত যাইবে? —যীশুদা শান্তভাবে বললো, জাইত তো কবেই ছাড়ইয়া আইছি। তয়, জাইত তো ছাড়ে না। শোনছেলাম কিষ্ণ মন্তরিগো নাকি জাইত বিচার নাই। এহন দেহি বেয়াক জাইতের, বেয়াক সম্প্রদায়ের মইদ্যেই জাইতের উচা নীচা, ছোয়াছানার ব্যাপার একই রকম। তয় ধরণডা আলাদা। মুই আগেও জাইত মানতাম না, এহনও মানি না। খালি মাছ মাংস ডিম এইসব আমিষ খাই না। হেসব পেরথমে ছাড়ছিলাম অভাবের লইগ্যা, এহন অইব্যাস অইয়া গ্যাছে, পিরবিত্তিও অয়না।

রান্না উত্তম। সন্নর সঙ্গে এতক্ষণ দুএকটা কুশল সংবাদ আদান প্রদান ছাড়া কোনো কথা হয়নি। খেতে খেতে রান্নার তারিফ করতে করতে, একটু রগড় করতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু সামনে বসুদেব। একটু সতর্কতা রাখতেই হয়। জিজ্ঞেস করলাম, সন্নর আমারে মনে আছে? —খুবই সপ্রতিভ ভাবে সে জবাব দিল, আছে না আবার। আপনে খুবই অসোইব্য আছেলেন? শুনছিতো বেয়াক।

কার ধারে? যীশুদায় কইছে?

আর কেডা?

আচ্ছা মানুষটারে তোর কেমন মনে অয়? মানে শ্যাষ পজ্জন্ততো হ্যার গলায়ই তো ঝুললি কীনা, হেইর লইগ্যা জিগাইলাম।

মানুষ ভাল না। একছের এমোন পাগোল যে উষ্টজ্ঞেয়ানও নাই। উষ্ট অর্থে উচ্ছিষ্ট এঁটো।

সন্ন যে এমন ইংগিতপূর্ণ কথা বলতে পারে এবং এতটাই গভীরে, সে অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। সেইসব দিনে তাকে নিতান্ত কম বুদ্ধি, অশিক্ষিত, একটি গ্রামীণ কিশোরী হিসাবেই জানতাম। তার একমাত্র প্রতিভা ছিল তার অসামান্য দেহসৌষ্ঠব এবং দীঘল চুল। এর বেশি জানার সুযোগও ছিল না। সন্নর

কথাটার তাৎপর্য অন্যরা কী বুঝেছে জানি না তবে বসুদেব তার মায়ের উপযুক্ত পুত্র। তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনুমতি নিয়ে উঠে পড়ল। বুঝলাম ব্যাটা এই বুড়ো বুড়িদের রসালাপের মধ্যে 'কাবাব মে হাড্ডি' হয়ে থাকতে চায় না। মুখ ধুয়ে মাকে বলে, আমি ওনাগো লইগ্যা পান সিগারেট লইয়াই। —বলে বেরিয়ে যায়। ছেলেটি দিব্য। হকও বলে, পোলাডাতো বেশ বুজদার। যীশুদার পোলা বইলইয়া মনেই অয়না। সন্ন বলে, য্যারে ঠাট্টাডা করলেন মাজইয়া ভাই, হে কিন্তু ভোলানাথ। কোনোরহম প্যাচঘোচ বোজে না। বাপের বাড়ির গ্রাম সুবাদে সন্ন হককে 'মাজইয়া ভাই' বললো। হক বললো, হেয়া আর মোরা জানি না, তুই সেনা বোজতে দেরি করইয়া নিজে পেহার ভুগলি, মানুডারে ও তফলিক দিলি। —সন্ন সব চটুলতা ভুলে খুব আন্তরিক ভাবেই শান্ত স্বরে বলল, না মাজইয়া ভাই, আমি হাচাইও খুব বোগদাই আছিলাম। নাইলে মানুষটারে খালি দ্যাখথে কালীর হাতের মুণ্ড বলইয়াই মুখ ফিরাইয়া আছেলাম ভেতরডা দ্যাখলাম না? ওডা এ্যাট্টা বড়ো পাপই করছেলাম আমি। তয়, আইজ আর মোর কোনো দুঃখ নাই।

যীশুদা কোনো কথা বলছিল না। খেতে খেতে মুখ টিপে হাসছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যীশুদা, সন্নরে গইয়া টইয়া এহনও ঠিকমত দেওতো? চুলডা অবইশ্য পেরায় আগের মতই আছে। কাপড় চোপড় তেমন বোধহয় না দিলেও চলে। নাকি?—কথাগুলো শুনে সন্ন যা বোঝার বুঝে যায় এবং ভীষণ লজ্জা পেয়ে, উঠে রান্না ঘরে ছুট লাগায়। যেতে যেতে বলে, আপনে এহনও অসোইব্যই আছেন। হক এই ব্যাপারগুলো ধরতে পারছিল না। জানতে চাইল, ব্যাপারডা ক্যামন য্যান্ অন্যরহম ঠেহি? —যীশুদা এবার একটু আপারহ্যান্ড নেয়। বলে, ঐ কথাউগ্‌গা তোমারে কওন যাইবে না। অন্তত এহন তো না-ই। সন্ন হেলে মোগো দুইজোনরেই পিছা মারবে। সুযোগ মতো একলা একলি একদিন কমু হ্যানে। তয়, খাস্ কতাডা কই, স্যানে যেডা এহন হাস কাইব্য করইয়া কইতে আছে, হেডা কৈলোম আসলে বড়ো দুঃখের কতা। আইজ আমাগো এ্যাট্টু সুসার অইছে দেইখ্যাই ঐকতাডা লইয়া মোরা ঠাট্টা করতে পারতে আছি। নাইলে এয়াতো কওয়ার বা আলোচনার কতা না।

যীশুদা তখনকার দিনে এইসব ব্যাপার নিয়ে এতো গভীর কথা বলতো না, বলতে জানতোই না। বরং তখন বয়স বা বুদ্ধি, যে কারণেই হোক, এসব কথা নিয়ে সস্তা, অশ্লীল রসের ভিয়েন করতো। কথাটা ওঠার পর সন্ন ভেতরে পালিয়ে যাওয়ার সময়, আমার মনে একটা গ্লানিবোধ এসেছিল, যেন, আমি

তার চুলের আবরণে আধঢাকা নগ্নতা তখনও আড়াল থেকে চাখ্ছি। যীশুদার কথায়, আমার সেই বিষণ্ণতার ঘোরটা অনেকখানিই কাটলো। তবু পুরোপুরি গ্লানিমুক্ত হতে পারছিলাম না। তাই কথার মধ্যেই আমি উঠে ঘরের মধ্যে গিয়ে অসংকোচে সন্নকে বললাম, আমি এট্টা বোকার মতো ঠাট্টা করইয়া অন্যায় করছি। আসলে তোরা ভাল আছো দেইখ্যা আমার এতো আহ্লাদ আর আনন্দ হইছে যে, একথাডা যে দুঃখ আর লজ্জার, হেয়া আমার মনেই আছিল না। তুই আমারে মাপ কর।

আমি আপনের বুইন না।

মুশকিলডা অইলে তহন তো আর বুইন বলইয়া ভাবতে পারিনাই। তহন যেন বৌদি বৌদি ভাব। এহনো পুরাপুরিই বৌদি। একছের ঠাট্টার সম্পক্ক। যাই অউক, মাপ চাই, ল' ওহানে বইয়া গপ্পো করি বেবাকে। —বলে তাকে হাত ধরে হিড়্হিড়্ করে টেনে আড্ডায় নিয়ে এলাম। হক ব্যাটা কিছুই বুঝতে না পেরে বললো, এয়া কী? পরের বৌ লইয়া টানাটানি ক্যান্?

যীশুদা বলল, ওর হক্ আছে।

মুই দোষটা করলাম কী? মোর নামও হক। আর পেরথম থিহা মুইই কী বরাবইর তোমাগো মদত করি নাই? তো হক্টা তো মোরই বেশি হওনের কতা।

হেকতা হাজারবার সত্য। তয়, সন্ন কীনা তোরে একছের হাচাইও বড়োভাইর ইজ্জত দে, হেকারণ এট্টুহানে পাইন মারা গ্যাছে। তোরে তো ডাহেও মাজইয়া ভাই কইয়া, তোর দাদারে ডাকে বড়ো ভাই, আর মোতাকাকারে তো হে ধম্মবাপই বানাইয়া রাখছে। এসব তো তোর জানা।

হকের মুখে স্নেহের আলো ঠিক্‌রে পড়তে লাগলো। সঙ্গে অনেকখানি বেদনা বিষণ্ণতার ছায়াও। হেলেনের প্রসঙ্গটা তুললো, বললোও সবিস্তারে। সন্নর দুচোখ বেয়ে ধারা গড়িয়ে পড়তে থাকলো। যীশুদারও। বলল, দ্যাখ্, বয়সতো কোম অয়নায়। অনেক দুঃখ কষ্ট, ব্যাথা ব্যাদনার মোকাবেলা করইয়া এই পজ্জন্ত আইছি। এহন মরলেই বা কী? বড়ো জোর টান্ই টুন্ইয়া পাঁচ, সাত বচ্ছর। ভাবি বাচ্ইয়া আর লাভ কী? এহন বাচমু কী এইসব দ্যাহার লইগ্যা? হাঃ কপাল! —হক তার হুতাশকে প্রশ্রয় দিল না। বললো, ও রহম ভাবলে বাচা যায় না। এর সবটাই জীবনেরই অঙ্গ। এক বুইনের সাময়িক সমস্যা অইছে, হ্যার চোক্ষের পানিও যেমন মোছাবার ব্যবস্থা করতে অইবে, অন্য বুইনের কপালে যেডুক সুখ শান্তি জোটছে, হেয়ার ভাগ লইয়া 'খুশিত'ও থাকতে অইবে? কিন্তু

যীশুদা, বেলা শ্যাষ—এবারতো ওঠথে অয়। অনেকদিন পর বড়ো আনন্দে কাডাইলাম আইজকার দিনডা।

আইজ্জগার রাইতটা থাইক্যা যায়েন। ছাড়তে ইচ্ছা করতে আছে না। কী? দয়ালে কিছু কয়না ক্যান? মুই একলা কইলে কী হেনারা থাকপেন?

দয়াল? দয়াল আবার কে? অনুমান হলো যীশুদাকেই বলছে সন্ন। যীশুদা ছোটবেলার মতো সন্নকে 'সন্ন' বলেই বলছিল। আমার স্মৃতিতে, তাদের সেই ঝোপের মধ্যের আবেগ ঘন মুহূর্তটা, সেই সংলাপসহ অতি দ্রুত, ছায়াছবির একটা ফ্ল্যাশ ব্যাকের মতো প্রকাশ হয়েই মিলিয়ে গেল। কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে লেপ্টে থাকলো তার রেশটা।

—'ক্যান সনুমনা', বাড়ির আর বাড়ির মানুষের বেয়াকের মালকিন্ তো তুমি। তুমি যহন আদেশ করছো, পালন করার আর করাবার দায়িত্ব তো স্যাবকের। অরগো থাহন আটকাইবে কোন্ হালায়।

আমরা যীশুদার কথায় আর সন্নর ভাবে মোহিত হয়ে বললাম, আমাগোও যাওনের যে তেমন ইচ্ছা আছে এমন না। তয় নছিফা আবার হয়তো অশান্তি করবে, হ্যার লইগ্যা—।

হোন্। তোর শহরের বাড়িথে তো এহান দিয়া বাসে যাইতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। বসুদেবরে পাডাইয়া খবরডা দেলেই তো মিড্ইয়া যায় ঝামেলা। অম্নে, ওহানের বাজার থিহা কিছু মাছ মাংস না অয় লইয়া আইবে হ্যানে। রাত্তিরে কী খাবি, মাছ না মাংস?—হক্, জবাব দিল, মাছ। ইলিশ পাইলে ইলিশ, না অয় পাঙ্গাস। হিন্দুরা মাংস রানথে পারে না। হেয়া ছাড়া তোরা কেউ খাওনা। সামনে বইয়া মোরা গিলি কী করইয়া?

আইজ যা থাকে কপালে খামু, বেয়াকেই খামু।

আমি বললাম, সাতখোপ্ কতৈর খাইয়া বিড়ইল বইছে তপস্বী অইয়া? মাছ মাংসের আবার বিদিনিষেদ কী? আর তোমরা আসলে কোন্ সম্প্রদায় হেয়াতো নিজেরাই জানো না। কহনো মতুয়াগো লগে আছো, কহনো বৈরাগি বৈষ্টমী, কহনো গেরস্থ কিঞ্চমন্তরি। আমি যেডুক খোজখবর রাহি, এ্যারগো মইদ্যেও হাজার মতামত। এহেক গুরুর এহেক বিদান। বইপত্তর ঘাড্ইয়া বা হরেক আখড়া আশ্রমে যাইয়া দ্যাখফা খালি কথার বাইশ পাহাড়ি, খালি কোন গুরু ভগবানের অবতার, কেডা আসলে শিব, কিন্তু এহন অমুক গুরুর রূপ ধারণ করইয়া মত্ত লীলা করতে আছে, আর কেডা কয়ডা মড়া বাচাইছে, অপুত্রার পুত্র আর নিদ্ধনের ধনের ব্যবস্থা করছে--হেই অলৌকিক কাহিনী।

যীশুদা আমার কথার তোড়ে একটু যেন আহত হয়েই বলে, এর মধ্যে ভাল কিছু তোর নজরে পড়ে না ?

পড়বে না ক্যান ? অনেক মানুষ এক জায়গায় জড়ো হইয়া যে নিজেগো সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে, হেডা এটটা মস্তো বড়ো ব্যাপার। অলৌকিক, অসম্ভব গপ্প কথার দরকার কী ? এইসব সম্প্রদায়ই আইছে সহজিয়াগো পথ ধরইয়া। হ্যারা মূলে আছিল বৌদ্ধগো একটা শাখা। কিন্তু হেসব ম্যালা কথা। হেসব প্যাচাল না পাড়ইয়া নিজেগো কথা কও।

হক বলল, হেইয়াই ভালো, আমরা যে যার মতো সহজিয়া থাকলেও ছওয়াব কও, পূইণ্য কও এটটুও কোম অইবে না। আসলে এই সব দলের বেশির ভাগ মানুষইতো গবীবস্য গরীব, হেকারণেই মাছ, মাংস না খাওনের বিদান। হিন্দুরাতো বেদের যুগে, হুনছি নাকি গরু খাইতো হোগাদ্দিয়া মুখ দিয়া। সুতরাং সন্ন বোইনডি যদি পাকটা ভাল করতে পারে, মুইও আইজ এই কিষ্টমন্তরির বাড়িতে গোস্ত খামু। হেয়া যে গোস্তোই হউক। এহন এসব প্যাচাল থোও ফ্যালাইয়া, বসুদেবরে ডাকো, আর ব্যবস্থাদি করো।— অর্থাৎ সেই যাজ্ঞবল্ক্যের নীতি।

উনিশ

পিছনের পিচ্ছিল পথ

যীশুদা, সন্ন, বিন্তিদিদি, ভূষণ—এরা যে কোনো ধর্মীয় আবেগে মতুয়া বা 'কিষ্ণমন্তরি' হয়েছে, এমন মনে করার কারণ নেই। নানান অজুহাতে সামাজিক নিপীড়ন, বিশেষ করে অসম বর্ণের বা জাতের সঙ্গে প্রেমের কারণেই তাদের যে এই পথ অবলম্বন করতে হয়েছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রগতিশীল সমাজসংস্কারের জন্য উপযুক্ত আন্দোলন করার উপায় বা উদ্যোগ না থাকায়, সংখ্যালঘুরা বহু বহুকাল আগে থেকেই এই ধরনের প্রতিবাদি কিন্তু শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, ছোট ছোট গোষ্ঠী গতভাবে করে আসছিল। এখন এ অঞ্চলে. বা গোটা এই দেশেই, যীশুদাদের মত লোক, অর্থাৎ যারা সংখ্যালঘু সমাজের মানুষ, তারা বলতে গেলে হাতে গোনা কয়েক জন। তাদের মধ্যে তথাকথিত উচ্চবর্ণ বা জাতের মানুষ প্রায় নেই আর এখন। সুতরাং আগেকার সামাজিক বন্ধন, জাতপাতের বিধি-নিষেধ এখন নেই বললেই চলে। তবে যীশুদাদের ঘর বাঁধার সময় পর্যন্ত যেটুকু ছিল, তাতে তারা মূল সমাজের বাইরে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছিল। এখন শুধুমাত্র প্রেম প্রণয়েরও ক্ষেত্রেই যে অসবর্ণ বিয়ে থা হয় তাই নয়, গ্রামে না হলেও শহরে এরকম বিয়ে, অর্থাৎ নমশূদ্র জাতের সঙ্গে তথাকথিত উচ্চবর্ণের বা জাতের মানুষেরা আনেকটা সহজ ভাবেই ঘটিয়ে থাকে। কারণ স্ব-জাতির ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রির সংখ্যাল্পতা। পুরোনো অভ্যাসে এখনো নমশূদ্র বলে তাদের প্রতি নাক সিট্‌কোয় অনেকেই, তবে ব্যাপারটা প্রাক্তন সমাজের চাইতে এখন অনেকই কম এবং আশা করা যায়, এটাও থাকবে না। কারণ গরজ বড়ো বালাই, বিয়ে থার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী কই? আরেকটা কথা, এবং সেটা এদেশীয় বর্তমান সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে, যারা জাতের দিক থেকে বেশির ভাগই নমশূদ্র, তাদের পক্ষে সুলক্ষণই বলতে হবে। তা হলো নমশূদ্ররা শিক্ষার দিক দিয়ে অনকটাই অগ্রণী, তথাকথিত উঁচু জাতের মানুষ

যারা এখানে আছে, তাদের চাইতে এবং সেটা অর্থনৈতিক দিক থেকেও। এটাকে সদর্থক দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত। অবশ্য এটাও মনে রাখা দরকার যে উঁচু ডিগ্রিলাভ করাটাই একমাত্র শিক্ষিত হওয়ার মাপকাঠি নয়।

যীশুদা সন্ন, তাদের প্রেম এবং টিঁকে থাকা জনিত সমস্যায় বাধ্য হয়ে নমশূদ্র সমাজের এই রকম একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা কেউই মূলত নমশূদ্র জাতের ছিল না। ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ তখনকার দিনেও খুব অপ্রচলিত ছিল না। এদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি গ্রামীণ অন্য জটিলতার জন্য, বিশেষ করে তাদের পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই এরকম হয়েছিল। সেখানে ব্যক্তিক এবং পারিবারিক মনোভাব যতটা কার্যকরী ছিল, সামাজিক বিধি নিষেধ ততটা ছিল না। সমাজকে উপেক্ষা করে যদি তারা তখন ঘর বাঁধতো, আস্তে আস্তে, একসময় তা সবাই মেনে নিত বলে আজ আমার মনে হয়। কিন্তু সেখানে সন্নর তৎকালীন আকাঙ্ক্ষাটাও প্রেমের সপক্ষে না থাকায়, তাদের লাঞ্ছনা বেশি হয়েছিল এবং সর্বশেষ এই পথ তারা অবলম্বন করে সমস্যার সমাধান করেছিল। সেদিক থেকে এই ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আজ যদি তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে যীশুদার পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করতে চায়, কেউই তাদের কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা করতে পারবে না বলে আমার মনে হয়েছে, বা যদি করও, তা আখেরে ধোপে টিকবে না।

যীশুদা বলে, না এই বেশ ভাল আছি, বোজজো। আবার পুরান জাগায় ফিরইয়া যাওন মানে, নতুন করইয়া ক্যাচালে পড়া। ভাইপো গুলান তো এ্যাটটাও মানুষ অয়নায়। জাগা জমি লইয়া রোজ মাইর পিট। বড়ডা অইছে এ্যাটটা টাউট। ছল্লিবল্লি, এ্যার ভিডা ওরে বেচে, হ্যার বাড়ির বিম, বরগা খুলইয়া বেচে। ভদ্দরলোক বাড়ির পোলা অইয়া হ্যারা যা করে, কইথে লজ্জা করে। দাদা বৌদি বাচইয়া থাকলে দ্যাখথে, আমারে যে কারণে খেদাইলে, হ্যার চাইতে কতোগুণ বেশি খারাপ কাম হ্যারগো পোলারা করে। অবইশ্য আমি মনে করি না যে, আমি কোনো অন্যায় বা খারাপ কাম করছেলাম।

হক বললো, তুমি যে কইলা, তোমার দাদায় তোমারে খেদাইছে, হেডা কী সয়ত্য? তুমি তো নিজেই সন্নরে লইয়া ভাইগ্যা আইলা। না-কী?

তোরা হে কাণ্ড জানো না। মুইও কইনায়। মুই বড়ো আঘাত পাইছেলাম। কাউরেই লজ্জায় কইতে পারিনায়। পরিবারের কতা, বেয়াক কী কওন যায়?

ঘডনাডা কী? কওন যায় না? অনেক দিন তো অইয়া গ্যালে।

ঘডনা লম্বা, আর হেসব কইয়া আইজ আর ফয়দাও নাই, দরকারও নাই। তমো যহন আইজ এ্যাদ্দিন বাদে গুরুর কিরপায় মোরা একলগে রাইত

কাডানের সুযোগ পাইছি, তহন হেই কাহিনীডাও কই, হোন। কিন্তু এহানে বইয়া বোধ হয় সুবিদা অইবে না। ল, যে আশ্রমে গেছিলাম হেহানে এ্যাটটা বড়ো পুহইর, পেরায় দিঘি মতন আছে, ঘাড্‌লাও আছে বাহারইয়া একখান। আইজ বোধায় চতুদ্দশি বা পুন্নিমা। হেহানে যাইয়া বই, যেমন গেরামের জমিদার বাড়ির দিঘির ঘাড্‌লায় বইথাম হেইসব দিনে, মনে আছে? হেইরহম, হেয়া ছাড়া। সন্ন, মাইনে সনু, এইসব কথা ওডলে এ্যাটটু অসোয়াস্তি বাসে।

বস্তি এলাকা থেকে আশ্রমটা মিনিট দশেকের পথ। সন্ধে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। পূবের আকাশে চাঁদটা সম্পূর্ণ নির্মেঘ একটি চন্দ্রাতপে বড়ো চমৎকারভাবে উজ্জ্বল! আশ্রমটা বেশ সুসজ্জিত। চারদিকে নানান ছোটবড়ো গাছপালা। ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা বেশ বড়ো সড়ো একটা আয়োজনের উত্তরপ্রান্তে আশ্রম গৃহটি। ভিতরে কিছু ভক্ত পাঠ শুনছে। দিঘিটি পুব দিকে এবং এখন নির্জন। গোটা জায়গাটির একটি তপোবন সুলভ ভাব আছে। গোটা প্রাকৃতমণ্ডল এবং কিছু দূর থেকে আসা পাঠধ্বনি এই পরিবেশটি সৃষ্টি করেছে। আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাব খেলা করছে। মনে হচ্ছে যেন, আমরা সেই পিছনের দিনগুলোতেই ফিরে গেছি। মঞ্জুদা এবং অন্যান্য যারা, সন্ন নিরঞ্জনের বিয়ের সময় আমাদের সঙ্গে ছিল, সবাই এখনই এসে পড়বে। মঞ্জুদা আমাকে হুকুম করবে, স্যানে তুইই জেডামণি আর মোতাকাকার ধারে যাইয়া ব্যাপারড ক। তোর কথা ফ্যালাইতে পারবেন না হেনারা। কথাটা বলতে, হক বললো, মঞ্জুদায় আইজ এহানে থাকলে হ্যানে জোমতো। যীশুদা জানালো, তার আর মঞ্জুদার মধ্যের বন্ধুত্বটা শুধু যোগাযোগের অভাবেই নষ্ট হলো। এতো কাছাকাছি থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন। আসলে এর অন্যতম কারণ মঞ্জুদায়ের স্ত্রী। যীশুদাকে সে দুচোখে দেখতে পারে না। সন্নকে, তার দুর্গতির দিনে পর্যন্ত মঞ্জুদা যে দেখতে যেতে পারেনি, সেটা তার বৌয়ের চোপার জন্যই। অত্যন্ত সন্দেহবাতিকগ্রস্তা মহিলা। সন্নকে প্রকাশ্যেই 'বাইর-ভাতারি মাইয়ালোক' বলে গাল পারতো। তার সঙ্গে মঞ্জুদার বোন ফুরকুতির ভাব ছিল বলে, ননদকে ভীষণ গঞ্জনা দিত সে। ঐ সময়ই ব্যাপারটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছোয় যে মঞ্জুদা যীশুদার সঙ্গে আস্তে আস্তে সম্পর্কটা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু প্রায় সমবয়সী হওয়ার সুবাদে তাদের যে ঘনিষ্ঠতাটা ছিল, তার রেশ আজ অবধি দুজনের মধ্যেই আছে। যীশুদা হককে অনুরোধ করলো যে যদি একবার মঞ্জুদাকে এখানে আনতে পারে। হক বললো, চেষ্টা করতে পারি, তয় লাভ আইবে বলইয়া মনে অয়না। মঞ্জুদা বাইরে যত রসিক আর মজাদার, মানুষ। ভিতরে ভিতরে

ততই য্যান্ ভাঙ্গাচোরা। কী করবে, ঐ রহম একখান বৌ সামলান কী সাধারণ কতা? কিন্তু যীশুদা, দাদার লগের যে কতাডা কইতে আছেলো, হেডার লইগ্যাইতো এহানে আইলাম। অন্য কথার তো শ্যাষ নাই। ঐডাই কও শুনি। কারণ, বেয়াকে যাই কউক, মুই কৈলোম একতাডা স্বীকার যাইনা যে সন্নর লইগ্যাই খালি তুমি গেরাম ছাড়াইয়া এহানে আইছ। তোমাগো ল্যাহান কাণ্ড গেরামে যে আর অয়নায় এমনতো না। হেরা কী বেয়াকে গেরাম ছাড়াইয়া পলাইছে?

যীশুদা এর পর যে কাহিনী বলে, সেটা এরকম। বিন্তিদিদিরা ঐ ভাবে চলে গেলে, যীশুদা নিজেকে নিতান্তই অসহায় বোধ করছিল। একথা সত্য ভূষণের সঙ্গে বিন্তি দিদির সম্পর্কটাকে ঐ মুহূর্তে সে মেনে নিতে পারছিল না। ঐ সময়টায় আমি তাদের বাড়িতে প্রায় নিয়মিত যেতাম। ঘটনার দিনও সেখানেই ছিলাম। কিন্তু সেদিন নৌকোটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে তার হুঁস ফেরে এবং প্রথমেই যে কথাটা তার মনে হয়, তা হলো, আজ থেকে সে একা। মায়ের স্মৃতি তার অতিক্ষীণ। বাবার মৃত্যু এবং মৃত্যুকালীন তার শারীরিক, মানসিক যন্ত্রণা সে প্রত্যক্ষ করেছে। সে যীশুদার দাদাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিল যে, তার অবর্তমানে বিন্তি এবং যীশুদাকে সে অনাদব করবে না। তারা কোনো অন্যায় করলেও জ্যেষ্ঠ হিসাবে সে তাদের যাতে মঙ্গল হয় সেটা করবে। তাদের কোনো কারণেই পরিত্যাগ করবে না। সে এটাও বলেছিল যে, বিন্তির পক্ষে বিপথে যাওয়া অস্বাভাবিক না। সে রকম অবস্থা যদি ঘটে, তাহলে ক্রুদ্ধ বা কঠোর না হয়ে, সহৃদয়তার সঙ্গে বিষয়টির সমাধান করবে সে। বিন্তির ওপর তার স্বামী গর্হিত অন্যায় করেছে। এরকম ক্ষেত্রে সংসারে নানান বিপত্তি ঘটতে পারে। বাবা অলস প্রকৃতির উদ্যোগহীন মানুষ ছিল বটে। কিন্তু তার বাস্তব জ্ঞান এবং মানবিক বিচার অনুদার ছিল না। যীশুদা পুরুষ মানুষ, তার বিষয়ে বাবা খুব চিন্তিত ছিল না। জায়গা জমি যখন ঠিকমতো ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, সে চালিয়ে নিতে পারবে। শুধু দাদা হিসাবে তাকে দায়িত্বটা পালন করতে হবে যাতে দেশের সেই সময়কার বিশৃঙ্খল অবস্থার ডামাডোল সে পথে না বসে, বা উচ্ছন্নে না যায়।

কিন্তু দাদা কী করলো? বৌদি পরের বাড়ির মেয়ে। তার চার চারটি ছেলে। সুতরাং তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে, স্বার্থপর হওয়া, অসহিষ্ণু হওয়া, বা দেওর ননদকে ভাগিয়ে দেওয়ার চিন্তা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। সংসারে

এরকম ঘটেই। কিন্তু দাদা সামান্য সুযোগেই বৌদির মতের পোষক হয়ে গেল? বিন্তি দিদিদের নৌকো ছাড়তে তো সময় কম লাগেনি। যীশুদা নিরুপায়ের মতো দিদির পায়ে পড়ে কতইনা আকুতি জানিয়েছিল, কিন্তু বিন্তিদিদির উপায় ছিল না। সে যীশুদার চাইতে অনেকটাই বড়ো এবং বুদ্ধিও তার অনেক বেশি পরিপক্ক ছিল। সে জানতো, এরপর যা হবে, তাতে তার সম্মানতো থাকবেই না, ভূষণেরও লাঞ্ছনা এমনকী শারীরিক নিগ্রহ পর্যন্ত ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে তার সমাজের মানুষেরাই হয়তো তাকে নিগ্রহ করবে সর্বাধিক। নমোশূদ্রদের ক্রোধ বড় ভয়ঙ্কর। সেটা মেনে নেওয়া বিন্তিদিদির পক্ষে অধর্ম বলেই সে জেনেছিল। তখন বলেও ছিল। এটা অসম্ভবও ছিল না যে দাদা, নমশূদ্র যে লোকেরা তাদের চাষের কাজ করে, তাদের দিয়েই ভূষণকে পিটিয়ে দেয়।

যীশুদার মনে তখনো আশা ছিল যে, যাইহোক, মায়ের পেটের বোনতো, দাদা নিশ্চয়ই খালের ঘাটে এসে, বোঝাবার চেষ্টা না করুক, অন্তত, ধমক ধামক দিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু না, না দাদা, না বৌদি কেউই আসেনি। বিন্তিদিদিরা চলে গেলে যীশুদাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে আমি নিজের বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। তার কিছুদিন পর আমাদের মেট্রিকের ফল বের হলে আমি কলেজে পড়ার জন্য শহরে চলে যাই। তার কিছুকাল পরে পশ্চিমবঙ্গে পাকাপাকি। সুতরাং পরবর্তী ঘটনা আমার আর জানা হয়নি। যীশুদার সঙ্গে সাক্ষাৎও হয়নি। সন্ন নিরঞ্জনের বিয়ে এসব ঘটনার মাস কয়েক আগেই ঘটে গিয়েছিল। এখন যীশুদার মুখে পরের ঘটনাগুলি প্রায় গল্পের মতো শুনছি।

যীশুদা সেদিন বাড়ি ফেরার পর দাদা বৌদি তাকেও অকথ্য গালিগালাজ করেছিল। তাদের অভিযোগ, পরিবারের মান সম্মান সে জেনে শুনে নষ্ট হতে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে এরকম কাণ্ড ঘটছে, সেটা না জানা কী তার পক্ষে সম্ভব? সন্নর বিষয়েও যেসব কথা তাকে জড়িয়ে তখন এলাকায় পল্লবিত, দাদা বৌদি তারও উল্লেখ করে বলেছিলেন, এ বাড়িতে আলাদাভাবে হলেও সে আর থাকতে পারবে না। সেও বিন্তির পথ ধরুক। কুচরিত্তর গিরি এ বাড়িতে চলবে না। সব শত্তুর একসঙ্গে বিদায় হোক। সন্নর জীবনে তখন লণ্ডভণ্ড অবস্থা। নিরঞ্জন সুবল রানিকে নিযে আদোকাঠির পাতার ঘর বাঁশের খুঁটির আস্তানাটা নরক করে তুলেছে। যীশুদা এর মধ্যে বারকয়েক তার দাদা এবং বড়ো ভাইপোর হাতে কয়েকবার মারধরও খেয়েছে। তাদের দাবি

একটাই। 'এটা ভিক্ষুতের বিয়াতো মাইয়ারে লইয়া যে ঢলাঢলি করে' তার এ বাড়িতে কেন, এই গ্রামেও থাকার অধিকার নেই। পড়শিরা এ ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হলেও প্রকাশ্যে যীশুদার সমর্থনে কেউই এগিয়ে আসছে না। সে এক করুণ অধ্যায় তার জীবনে তখন। এরই মধ্যে সন্নর জীবনের দুর্দৈবগুলি একের পর এক অতিদ্রুত ঘটে চলেছে। যীশুদা যত সন্তর্পণেই এ ব্যাপারে তাকে সহায়তা করুক না কেন, দাদাদের কাছে কিছুই চাপা থাকছে না।

এরই একটা সময়ে শওকত জ্বিহাদি ঢুকে পড়ে এই ঘোলা জলে। উদ্দেশ্যটা পরে বোঝা গিয়েছিল। যীশুদার বিষয় সম্পত্তি থেকে তাকে উচ্ছেদ করে, তার দাদাকে পাইয়ে দিয়ে মাঝখান থেকে কিছু সুবিধে করে নেওয়া। যীশুদা এবং ধলুর বিরুদ্ধে সন্নকে 'রেপ' করার কেস্এ থানা পুলিশ জামিন ইত্যাদি হওয়ার পর শওকতের মুরুব্বিয়ানায় একটা গ্রাম্য সালিশি বসে। হক তখন এখানে ছিল না। ছিল তার তখনকার চাকরিস্থল চট্টগ্রামে। সালিশীতে ইউনিযন কাউন্সিল যাতে না থাকে শওকত তার ব্যবস্থা করেছিল। মোতাকাকা তখন চেয়ারম্যান নেই। শওকত তখনকার পাকিস্তানি কায়দা অনুযায়ী শরিয়তি মাতব্বরদের নিয়ে সালিশি সভা বসিয়েছিল যীশুদাদের বাড়ির উঠোনে। তখন আইয়ুব খান সাহেবের আমল। বেসিক ডেমোক্র্যাসি চালু হয়েছে এবং বেশির ভাগ ইউনিয়ন কাউন্সিল শরিয়তিদের দখলে, কারণ তারাই তখন বি.ডি. বা বেসিক ডেমোক্র্যাট্। প্রকাশ্যে হানাহানি, কাটাকাটি ইত্যাদি সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী বন্ধ। তবে ডাকাতি এবং ধর্ষণ নিত্য ঘটনা। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক উৎপাতের কায়দাটা পাল্টেছে।

সন্নর ধর্ষণের ব্যাপারটাই শওকতি শরিয়তির সালিশিতে প্রধান অভিযোগ হিসাবে দাঁড়ায়। অথচ, উদ্দেশ্য ছিল যীশুদাদের সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিরোধের মীমাংসা। আলোচনা, তর্ক, বিতর্কে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে যীশুদা যেহেতু একজন 'জ্বেনাকারি', তাকে এই গ্রামে থাকতে দেওয়া, না দেওয়ার ব্যাপারটা তার পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবে। সমাজেরও এ ব্যাপারে বক্তব্য থাকতে পারে। এটা যেহেতু হিন্দু সমাজের ব্যাপার, মুসলমান সমাজের মুরুব্বিরা এখানে অপরাধ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু শাস্তি দিতে পারবে না। ঘটনাটা মুসলমান সমাজে ঘটলে, ব্যভিচারি মরদ আওরৎ উভয়েরই কী শাস্তি হতো, তা সবাই জানেন। আজকাল ইসলামের সেদিন আর নেই। তাই এসব ক্ষেত্রে আজকাল শুধু শ' খানেক ঘা কোড়া বা দোররা মেরেই ছেড়ে দেওয়া হয়। ইসলাম এখনও যেখানে প্রবল প্রতাপে আছে

সেসব স্থানে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করাই বিধি। যদিও এরকম একটা না পাক্ কাজ হিন্দু সমাজে হয়েছে, উপস্থিতজনেদের মধ্যে যাঁরা 'দীনের ভাইরা' আছেন, তাঁরা যেন ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখেন যে, পাশাপাশি থাকার বাবদে, এই ঘটনা মুসলমান সমাজের 'জুয়ান' পোলাপানদের কাছেও বদ্ নজির উপস্থিত করছে কীনা। সুতরাং ইত্যাদি। মোমেন ভাইরা সাবধান ইত্যাদি।

প্রধান বক্তা শওকত নিজেই। সিদ্ধান্তটাও সে-ই ঘোষণা করে। যীশুদা ঐ গ্রামে থাকতে পারবে কী পারবে না, সেটা তার পরিবারের জনেরাই ঠিক করবে। সমাজের মুরুব্বিদের যারা আছেন, তাঁরা যদি সেই সিদ্ধান্তে একমত হন, তবে যীশুদা তা মানতে বাধ্য থাকবে। যদি সে তার অংশের জমি, বাড়ি ইত্যাদি বিক্রি করে চলে যেতে চায়, সেক্ষেত্রে প্রথম অধিকার পরিবারস্বজনেদের। তারা অসমর্থ হলে, অন্য লোকের কাছে বিক্রি করা চলতে পারে। দাদা বলেছিল, অত সম্পত্তি কেনার মতো টাকা তার কাছে নেই, সুতরাং তাকে যদি সময় দেওয়া হয়, তবে সে আস্তে আস্তে টাকা দিয়ে দেবে। শওকত বলেছিল যে সেক্ষেত্রে যীশুদাকে বার বার এই গ্রামেই আবার আসতে হয়। সেটা বর্তমান সিদ্ধান্তের বিরোধী। তবে 'মজলিস' যদি চায়, সম্ভাবনার বশবর্তী হয়ে সে মধ্যস্থি হতে পারে। টাকা সে এখন দিয়ে দেবে এবং যতদিন না 'দাদা' সেই ঋণ শোধ করেন, ততদিন সে ভোগ দখল, বসবাস করতে পারবে। টাকা শোধ হলে, সে দলিল আবার দাদার নামে করে দেবে। গোটা ব্যাপারই আইন মোতাবেক হবে।

যীশুদা সরল সোজা এবং বোকাসোকা মানুষ হলেও শওকতের চালটা ধরতে পেরেছিল। বুঝেছিল, আজ যদি সে শওকতের কাছে সব বিক্রি করে, কাল সে এদের পরিবার শুদ্ধ উৎখাত করবে। সে কার্যতভাবে দাদাদের ওপর ক্ষুব্ধ হলেও, এটা চায়নি। অন্তরের দিক থেকে কোথায় যেন তার একটা টান রয়েই গিয়েছিল। বাড়ি, জমি এবং রক্তের টান। তাই গোটা সালিশি বিতর্কে সে আত্মপক্ষ সমর্থনেব জন্য একটা কথা না বললেও, জমি বাড়ি বেচার ব্যাপারে মুখ খোলে। সে বলে ওঠে যে দাদা যদি চায়, সে তার জমিজায়গা, ঘর বাড়ি, তার নামে লিখে দিয়ে চলে যাবে। তার টাকার দরকার নেই। তাতে যদি তাকে রাস্তায় ভিক্ষা করে খেতে হয় সেও ভাল। অন্তত দাদাদের কাছে তার যা ঋণ তাতো শোধ হবে। এই কথা বলে সে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। বোকা যীশুদার এই অভিমানের ব্যাপারটায় শওকত্তের চালটা মাঠে মারা গিয়েছিল।

সভা সালিশি তখন শেষ। আশ্চর্যের বিষয় এবং যেটা যীশুদার কাছে সবচাইতে কঠিন আঘাত বলে মনে হয়েছিল, সেটা হলো এর পরেও দাদা একখানি স্ট্যাম্প কাগজ যীশুদার জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরে ফেলে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, সে যেন তার বক্তব্য ঐ কাগজখানায় পরিষ্কার করে লিখে সই করে দেয়। কিছু লিখতে না পারলে, সাদা কাগজে শুধু সই করলেও চলবে। যীশুদা বুঝেছিল যে বৌদি দাদাকে দিয়ে তৎনগদ ব্যাপারটার ফয়সালা করতে চেয়েছিল। নইলে যে দাদা বাবার মৃত্যুকালে তাকে ঐসব কথা দিয়েছিল, সে কী এতটা পারে? সে যে ভাবেই হোক, যখন পেরেইছিল, যীশুদা আর বিলম্ব করেনি। কাগজখানায় সই করে দাদার ঘরের রোয়াকের ওপর একটুকরো মাটির ঢেলা চাপা দিয়ে রেখে সোজা বেরিয়ে এসে সন্নর খোঁজে গিয়েছিল। আসার সময় শেষ বারের মতো ঘরটার দিকে তাকাতে গিয়ে তার নজরে পড়েছিল, দাদার ঘরের দরজা খুলে বৌদি কাগজখানা তুলে হাসিমুখেই দরজাটা বন্ধ করছে। বোধহয়, ব্যাপারটা এরকমই ঘটবে বলে বৌদি জানতো। অথবা চুপিসারে নজর রেখে ব্যাপারটা দেখেছিল।

ধলু তখন সন্নর খবর জানতো। যীশুদা তার সঙ্গে এসে যখন আলাপ পরামর্শ করছে, তখন সে পরিষ্কার জানে না এখন সে কোথায় যাবে কী করবে। তখন প্রায় সন্ধ্যা। ধলু সেদিন একটু তাড়াতাড়িই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে যীশুদাকে নিয়ে তার বাড়িতে গেল। সেও ঠিক করতে পারছিল না যীশুদাকে নিয়ে কী করা যায়। ওদিকে সন্নর অবস্থাও অধীর চৌধুরির ওখানে টালমাটাল। প্রথমে অল্প বুদ্ধিবশত ধরা দিলেও পড়শীদের হট্টগোলে সে পালাবার পথ খুঁজছে।

পড়শিরা এসব ক্ষেত্রে সামাজিক শুদ্ধতা নিয়ে বড়ই চিন্তিত হয়ে থাকে। সেদিন রাতে ধলুর বৌ আলোচনা প্রসঙ্গে একটা সমাধান বললো। বললো, দুইজোনেরই যহন একই অবস্থা, তহন আর সোমাজের কথা ভাবইয়া কী অইবে? সোমাজ, আত্মীয় স্বজন, হ্যারাতো যে যার সাধ অনুযায়ী যা করার করছে। মুই কই কী? মুই কই যীশুদায় সন্নরে লইয়া শহরে যাইয়া ঘর বান্ধুক। দরকার অইলে কণ্ঠিবদল করইয়া কিষ্টমন্তরি অইয়া বিয়া করুক হ্যারে। মাইনসেতো হেরহমও বাচে? ধলুর বৌ অশিক্ষিত এবং ধোপার ঘরের মেয়ে হয়েও এই অবিশ্বাস্য বিধানটা দিয়েছিল।

কথাটা যীশুদারও পছন্দ হয়েছিল। বলেছিল যে সেই ভাল। ছেড়েছে যখন সবটাই ছেড়ে দিলে আর পিছুটান থাকবে না। তার তখন মনের যা অবস্থা

তাতে কিষ্টমন্তরি বোষ্টম কেন, তার মুসলমান হতেও আপত্তি ছিল না। বরং সে চেয়েছিল তাই হতে। কারণ, সমাজ এবং ধর্ম দুটোই যদি পাল্টাতে হয় বড়ো গাছে নৌকো বাঁধাই ভালো। ছোট খাটো সম্প্রদায়ের আশ্রয় হিন্দু মুসলমান কোনো সমাজের তরফ থেকেই নিরাপদ নয়। কিন্তু সেটা হলো না। হক বাঁধা দিয়েছিল, নানা কারণে। একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল সে। নিজের মনেই যেন সে প্রশ্ন তুলেছিল, ইসলাম বা মুসলমানি সমাজও কী শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দেয়? কথাটা গভীর।

হক এসেছিল ছুটিতে। তার ছুটি পড়ে গিয়েছিল অফিসে। ঈদের ছুটি। যীশুদা ধলুর বাড়িতে আশ্রয় নেবার পরদিনই হক এসেছিল। তারপর থেকে হকই যীশুদার ব্যাপারে হাল ধরেছিল।

এই পর্যন্ত টানা কাহিনীর মতো বলে বিষণ্ণ যীশুদা বললে, এই অইলো মোগো এ্যাতো দিনের হিস্টিরি। বাকি সব হক জানে। ওর মুখ দিয়াই শোন। মোর আর ভাল লাগে না এসব কইতে হক বললো হেয়া ক্যান? কইতে যহন আছো তুমিই কও। মুই যদিও জানি বেয়াক, তমো শোনতে বেশ ভাল লাগতে আছে। পুরান কথাতো। মনে অয় য্যান্ পুথি পড়তে আছি। আর তোমার এডা কওনও নিজের লইগ্যা ভাল। কী কইছি বোজজো? ব্যাপারডাতো পাথর অইয়া বুকে চাপাইয়া বইয়া আছেলে। এবার সুযোগ মতো যহন গলাইয়া দেতে পারতে আছে, গলাইয়া দেও। হাউলকা হবা হ্যানে।

হ, কথাডা সয়ত্য। এ্যাদ্দিন পর নিজের পেরানের মানুষ দুইজোনরে তো একলগে পাইলাম। মোরা এইডারেই গুরুর কিরপা বলইয়া মানি। এ্যাব লগে যদি মঞ্জুদারেও পাইতাম তো গুরুরলীলাডা পুরা অইত। জয়গুরু, জয়গুরু।

যীশুদা যেন কীরকম ভাবালু হয়ে পড়ে। বলে, তোরা হাসিস না। গুরু কইথে আমি কোনো বিশেষ মানুষরে বুঝাইতে আছি না। আমাগো জীবন যাপনে গুরু অইলে এ্যাট্টা ভাব, আশ্রয়। মোরা যে সম্প্রদায়ে আছি, হেহানে সাধু সন্ন্যাসী নাই। হেহানে বেয়াকেই সাধারণ গিরস্ত। তারগো হাতে কাম, মুখে নাম। নামডা ক্যান যদি জিগাও, তো কই, মনডারে আটকানের লইগ্যা। ওডা যে খালি দৌড়ায়, হে কারণে। হক বলে, বোঝালাম। যে যেভাবে শান্তি পায়। শান্তিডাইতো আসল। তয়, এহন বাহিডুক শোনলে মোগোও এ্যাটটু শান্তি অয়। হেইডুক কও। তোমার গুরুর লীলাডা পুরাই শুনি।

যীশুদা পুনরায় সোজা বিন্যাসে যেন তার বাকি ইতিহাসটুকু ঢালাই করে দেয়। কথাগুলো অত্যন্ত বেদনার। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, বলে ফেলতে পেরে, তার আরাম হচ্ছে, হৃদয়ের ভার লাঘব হচ্ছে। পরের কাহিনী এরকম এবং শুনে বুঝতে পারছিলাম যীশুদা কাহিনীর উপসংহারের দিকে যাচ্ছে। কারণ, খুঁটিনাটির মধ্যে গিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাইছে না।

হক পরেরদিন সকালে দেখা করতে এসেছিল ধলুর সঙ্গে। তার যাওয়ার দরকার ছিল গঞ্জে। পথে এখানে এসেছে। এদিকের খবর পরিষ্কার ভাবে তার কাছে ছিল না। জব্বারের চিঠিতে খাপছাড়া ভাবে কিছু শুনেছিল। কিন্তু যীশুদার ঘটনাটা সদ্য ঘটায়, সেটা আদৌ জানা ছিল না। ধলুর এখানে এসেই সে যীশুদার সাক্ষাৎ পায় এবং সব বৃত্তান্ত জানতে পারে। যীশুদা এখন হকের সামনেই বলে যে, আমাদের সবার মধ্যে হকই হচ্ছে প্রকৃত কাজের মানুষ। আমরা সবাই যখন প্ল্যান প্রোগ্রাম, আলাপ তর্ক করি, তখন সে চিন্তা করে সমাধানটা কীভাবে এবং কতো দ্রুত করা যায়। প্রথমেই সে বলে যে যীশুদার মুসলমান হওয়া চলবে না। কারণ ঐ অঞ্চলে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর থেকে ধর্মান্তরকরণের বা ধর্মান্তরিত হওনের কোনো নজির নেই। এ ব্যাপারে মুসলমান সমাজের লাভালাভ যাই থাকুক। একটা বদনামের ভাগীও হতে হয়। হক তখন আইয়ুবশাহি জমানায় যারা ক্ষমতার খুব কাছাকাছি, তাদের মধ্যে একজন মাতব্বর, যদিও চাকরির কারণে এবং কট্টর মৌলবাদিদের কার্যকলাপে সে মানসিকভাবে আস্তে আস্তে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে যাবার কথা ভাবছিল। কিন্তু সরকারি মহলে তার যোগাযোগটা সে হারাতে চায়নি এবং তখনও পর্যন্ত তা যথেষ্টই ছিল। সুতরাং এরকম একটা সময়ে তারই কোনো অন্তরঙ্গ হিন্দু বন্ধু যদি ধর্মান্তরিত হয়, তবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাবে তাকে বদনামের ভাগী হতে হবে। কারণ আগেই বলেছি, রাজনৈতিক ভাবে এইসব কাজ তখন রাষ্ট্রের প্রকাশ্য নীতি ছিল না। আন্তর্জাতিক স্তরে বদনাম ছড়িয়ে পড়ছিল। যীশুদাদের সমস্যাটা প্রেম এবং বিবাহ সংক্রান্তই শুধু। তার অতিরিক্ত কিছু না। সেটা আপাতত, বোষ্টম টোষ্টম হয়ে ফয়শালা করাই যায়। কিন্তু তার আগে সে চায় ইউনিয়ন কাউন্সিলে বিষয়টা তুলতে। যীশুদা তার বিষয়-সম্পত্তি স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিয়ে যতটা অভিমানের পরিচয় দিয়েছে, বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় তার মধ্যে একটুও নেই। এখন তার যা অবস্থা এবং সে যদি সন্নকে নিয়ে শহরে বা দূরে অন্য কোথাও ঘর বাঁধতে চায়, টাকার দরকার অবশ্যই আছে।

তার দাদা যদি অক্ষম হতো, তাহলেও অন্তত এই বদান্যতার একটা সার্থকতা থাকতো। কিন্তু তার যথেষ্ট সাধ্য আছে ঐ সম্পত্তি ন্যায্যমূল্যে কিনে নেবার। তার কাছে টাকা নেই, একথাটা সত্য নয়। বোকার মতো সেটা মাগ্‌না তার হাতে তুলে দেওয়ার কোনো মানে নেই। তাই ইউনিয়ন কাউন্সিলের সালিশি মারফৎ যীশুদার দাদাকে বাধ্য করতে হবে যীশুদার বাড়ি, জমি ইত্যাদির পুরো মূল্য তাকে আদায় দিতে। আজ রাত্রেই সে স্থানীয় হিন্দু মুরুব্বি যারা আছে, তাদের নিয়ে যীশুদার দাদার কাছে গিয়ে সইকরা স্ট্যাম্প পেপারটা নিয়ে আসবে। প্রয়োজনে জোর করে। বলে আসবে, শওকতের মাধ্যমে যে সালিশি হয়েছে, সেটা কোনো সালিশিই নয়। সেটা একটা একতরফা জবরদস্তি ব্যাপার এবং সম্পূর্ণ বে-আইনি। যদি সে প্রকৃত সালিশি চায়, তবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের মাধ্যমেই সেটা করতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত মানতে হবে। যদিও ঐ সময়টাতে শওকত আজকের মতো কট্টর জিহাদি হয়নি, তথাপি, তার কার্যকলাপ বিষয়ে হক বেশ চিন্তিতই ছিল। ক্রমশই তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা যাচ্ছিল। তার কাছে শওকত সম্বন্ধে নানান অভিযোগ আসছিল। তখনো শওকত হেলেনকে সাদি করেনি। কথাবার্তা শুধু চলছে। হকের সঙ্গেও সম্পর্ক বাহ্যত ভালই ছিল। নানা কারণে হক তাকে পছন্দই করতো এবং কোনো ব্যাপারে মতভেদ ঘটলে, শওকত কোনো প্রকাশ্য বিরোধিতায় না গিয়ে হকের কথাই মেনে নিত। হকও সংগঠনের কাজে শওকতের দক্ষতার গুণগ্রাহী ছিল। তাছাড়া লিগেরও এ ব্যাপারে কিছুটা ভূমিকা ছিল বলে বিয়েটা ঘটেছিল।

যাহোক, হক এটাও ঠিক করেছিল যে, সে শওকতকেও সঙ্গে নিয়েই যাবে। যাতে যীশুদার দাদা আগের সালিশির ব্যাপারে উল্টা পাল্টা কিছু না বলতে পারে। প্রথমে, সে বরিশাল গিয়ে মতুয়া বা বোষ্টমদের আখড়ায় যাবে এবং যীশুদা সন্নর কণ্ঠিবদল বা বিয়ের এবং থাকার বন্দোবস্তটা করবে। সেটা অবশ্যই একটু সময় সাপেক্ষ হবে। এই সময়টায় সন্ন এবং যীশুদা যে যেখানে আছে থাকবে। সব ঠিক হয়ে গেলে, হকই তাদের আখড়ায় নিয়ে যাবে। এই সব সবাইকে বুঝিয়ে হক চলে গিয়েছিল। ধলু, যীশুদা এবং ধলুর বৌ তার এই সমাধান সূত্রটিকে সঠিক মনে করে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

কিন্তু অধীর চৌধুরি সন্নকে নিয়ে তার বাড়িতে যে অকাণ্ড বাঁধিয়েছিল সেটা ঐ সময়ে প্রায় দৈবচক্রে একটা অন্য পরিণতি পায়। পড়শিরা অধীর চৌধুরি এবং সন্নর অসামাজিক আচরণ নিয়ে কথাকই এমন একটা পর্যায়ে

নিয়ে যায় যে সন্নর পক্ষে তা মোকাবিলা করার কোনো উপায় থাকে না। অধীর চৌধুরির বয়স তখন পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। তার স্ত্রী সন্তান সব পশ্চিমবঙ্গে। গ্রামে একা থেকে সে বিষয় সংরক্ষণ এবং সন্নর মতো অভাগিনীদের সুযোগমতো ভোগ করার খেলায় মত্ত ছিল। ঐ অঞ্চলে তখন সেরকম ভদ্দরলোক হিন্দু নেহাৎ কম ছিল না। যদিও সন্নর সেই সময়ের পরিণতির কথা আগেই বলা হয়েছে কিন্তু, তার কারণটা বলা হয়নি সবিস্তারে।

ছোটবেলা থেকেই, কোনো শাসন সংস্কারে সে মানুষ না হবার কারণে এবং মায়ের কুশিক্ষা, বাপের উঞ্ছ জীবনযাপন যেভাবে তৈরি করেছিল, সেটাই প্রধানত তার স্বভাব গঠন করেছিল। কোনোদিন নিজেকে নিয়ে সে কোনো গভীর চিন্তা করেনি। কিন্তু অধীর চৌধুরির ব্যাপারটা যখন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছালো, সে অত্যন্ত গ্লানিবোধ করতে আরম্ভ করলো। এখন তার মোটামুটি বোঝার বয়স হয়েছে। তার স্বাভাবিক বুদ্ধি কম ছিল না। অভাব ছিল শিক্ষার। কিন্তু একের পর এক দুর্দৈব যখন তাকে নাস্তানাবুদ করছিল, সে উপলব্ধি করতে পারলো যে সংসারে একমাত্র যীশুদা ছাড়া কেউ তাকে ভালোবাসেনি, যীশুদা ছাড়া তার প্রকৃত কোনো আশ্রয় নেই। বিনা দোষে মানুষটাকে যে হাজতবাস করতে হয়েছিল, তাও তারই জন্য। এই চিন্তা সন্নকে যেন আমূল পাল্টে দিয়েছিল। কিন্তু চৌধুরির ফাঁদ থেকে পালাবার কোনো উপায় সে খুঁজে পাচ্ছিল না। উপরন্তু সেই সময়টাতে সে বুঝতে পারলো যে সে অন্তঃসত্ত্বা। চৌধুরিকে জানাতে সে উল্টো তাকে জেরা করতে থাকলো এবং পরিষ্কার জানালো সে এ ব্যাপারে দায়ী নয়। সন্ন জিজ্ঞেস করেছিল,-তয় কেডা? মুইতো আর ক্যারো ধারে যাই নায়।

গেছ কী যাও নায় আমি দ্যাখথে গেছি? মুই সবসোমায় বাড়ি থাহিনা, হাল্ইয়া রাখালরা ইদিক উদিক ঘোরে, ক্যার লগে তুই শুইছো হেয়া মুই জানমু ক্যামনে? নাকী যীশুউয়াই তলে তলে আইয়া কাম সারইয়া গেছে, কেডা জানে? তোর লগে হ্যার ঢলাঢলির কথাতো বেয়াকেই জানে। তয় এহন তুই যদি মোর নাম দিয়া ক্যাওরে কিছু কওতো মাডিতে পুত্ইয়া থুমু। খান্কি মাগি, চৈদ্দজোনার লগে শুইয়া এহন মোর নামে বদনাম দেওয়ার মতলব? বাইর অ, মোর বাড়িতে তোর জাগা অইবে না। তোর ম্যাক্মেকির খাউজ্জ কদ্দুর হেয়া মুই জানি না?

—সন্ন বুঝলো চৌধুরি সুযোগ নিচ্ছে তার অর যীশুদার বাল্য সম্পর্কের।

সেই চিরাচরিত কাহিনী। কিন্তু সন্নর মধ্যে তখন একটা প্রতিবাদি সত্ত্বা গড়ে উঠেছে। সে সহজে এই সম্পর্কটাকে রেহাই দিতে চাইল না। সে জানে, এ অবস্থায় তাকে বদনাম দিয়ে বার করে দিলে, সে কোথাও আর আশ্রয় পাবে না। সুতরাং সে প্রথমে কাকুতি মিনতি এবং তাতে কাজ না হলে, চিৎকার করে লোক জড়ো করার প্রয়াস পেল। চৌধুরি বেগতিক দেখে এবং মাত্রাতিরিক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সন্নর পেটে একটা সজোরে লাথি কষালো। সদ্য পোয়াতি হতভাগী সন্ন একটা কাটা কলাগাছের মতো মেঝেতে পড়ে গেলো। তার গলা থেকে একটা আর্ত চিৎকার পর্যন্ত বেরোলো না। তখন রাত আটটা সাড়ে আটটা হবে। লণ্ঠনের আলোয় আতঙ্কিত চৌধুরি দেখলো, সন্নের কাপড় রক্তে চুবচুব্ করছে। অর্থাৎ লাথির আঘাতে সন্নর গর্ভপাত ঘটেছে।

হতভম্ব এভং ভীত চৌধুরি বুঝলো যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে সমস্যাটা শেষ পর্যন্ত খুনের মামলায়ও দাঁড়াতে পারে। গ্রাম গাঁয়ে এই সব সমস্যা থেকে উদ্ধার করে সাধারণত গ্রামীণ ধাত্রি বা হাতুড়ে ডাক্তারেরা। ধাই এর বাড়ি খুব দূরে ছিল না। অচেতন সন্নকে ঘরে রেখে সে ধাই এর খোঁজে ছুটলো।

ধাই এসে সন্নর অবস্থা দেখে, চৌধুরিকে যারপরনাই গালমন্দ করলো বটে, কিন্তু কিছু সুবিধে করতে পারল না। বললো, চৌধুরিমশায় যদি খুনের দায়ে না পড়তে চায়েন তো বাজার গোনে যোগেন ডাক্তাররে ডাকেন। মুই এহানে থাহি। সোমায় নষ্ট করবেন না। অবস্তা কৈলোম সাইদ্যের খারাপ। চৌধুরি বললো, যোগেন ডাক্তারের যা টাহার খাইস্, তুইই বরং দ্যাখ। যা চাও দিমু হ্যানে।

যোগেন কর্মকার বাজারে বসে। গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার হলেও নামডাক আছে। সম্প্রতি গর্ভপাত বিষয়ক চিকিৎসায় খুব পসার করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা তখন আইনসিদ্ধ না হওয়ার জন্য, তার খরচটা বেশ বেশি। ধাই বললো, উপায় নাই। টাহা আপনার অনেক আছে জানি। দেরি করলে কৈলোম টাহায়ও অইবে না। মুই পারুম না।

অগত্যা চৌধুরি ডাক্তারের খোঁজে যায়। ধাই তার জ্ঞান মতো শুশ্রুষা করতে থাকলে, খানিকক্ষণ পরে সন্নর জ্ঞান ফেরে। সদ্য গর্ভিণী হওযার সুবাদে, এক আঘাতেই গর্ভস্থ ভ্রূণের পূর্ণমোচন সম্ভব হয়েছিল। তার কাপড় চোপড় পরিবর্তন করিয়ে ধাই পরম স্নেহ এবং যত্নে সন্নকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, তার কাছ থেকেই আদ্যোপান্ত শুনে বড়ো মর্মাহত হলো। সন্নকে সে জানতো, জানতো তার দুর্দশার কাহিনীও। বড়োরায় মশায় তখন মৃত্যু শয্যায় না থাকলে, সন্নর

এই অবস্থাটা ঘটতো না। অধীর চৌধুরিকে তার কুৎসিত স্বভাবের জন্য কেউই পছন্দ করতো না। কিন্তু তথাকথিত ভদ্রবংশের মানুষ। অর্থাৎ যাদের শিক্ষিত বাঙালি ভদ্দরলোক বলা হয়। অর্থশালী, বিশেষ করে বড়ো রায়মশায় যখন চৌধুরিরই অনুরোধে সন্নকে সেখানে রেখেছেন, সেখানে এরকম ঘটনা ঘটাবার সাহস তার হবে, এটা আশপাশের কেউই ভাবেনি। কিন্তু লাঞ্ছনা জীবনে যাইহোক সন্ন বিতর্কিত যুবতি।

বুড়ি, সন্ন একটু ধাতস্ত হলে, বললো, কিন্তু মাগো, তোরতো এহানে থাহনডা আর উচিত অইবে না। ও লক্ষীছাড়ারে মুই ভালই চিনি। কাইলই বেয়ানে দেখফি হ্যানে পুরা দোষ তোর ওপরে চাপাইয়া কইবে, তুই নিজেই এই কেলেঙ্কারি বাজাইয়া, আবার নিজেই ইচ্ছা করইয়া পাছার খাইয়া এই কাণ্ডডা করছো। আর এই অজুহাতে তোরে বাড়ির থিহা খেদাইবে। মাইনসেরাতো তোর কতা বিশ্বাস করবে না। তুইতো বন্যার জলে ভাসা ট্যাপ্লোনা। আঃ হাঃরে। ভগমান, এই মাল্‌উয়া ভদ্দর লোকগুলা মরেও না।

ধাই এর কথা শুনে সন্ন চোখে অন্ধকার দেখল। অনেক ভেবে ধাইয়ের কাছে সে আবেদন জানালো, আমারে তোমার লগে থাকতে দেবা? তুমিও তো একলাই থাহ।

মুই যে ধোপা।

হেথে আমার এহন আর কী? তুমি আমারে ফেলাইয়া যাইও না মাসি। তুমি আমার ধম্ম মা। ধাই এর চোখ আর বাঁধা মানলো না, সন্নর আকুতিতে সেও অসহায়ের কান্না কাঁদতে লাগলো। অসমবয়সী দুইটি নারীর এই মর্মান্তিক কাহিনী, যীশুদার আগোছালো, অসংস্কৃত শব্দ, বাক্য এবং আবেগের আকুলতায় আমাদের চোখও সজল করে তুলেছিল।

তারপর?

তারপর আর কী? চৌধুরি যোগেন ডাক্তারকে নিয়ে এসে দেখল ধাই আর সন্ন একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কথা বলছে। কাঁদছে, ভাগ্যকে অভিশাপ দিচ্ছে। ঈশ্বরকে দিচ্ছে গালাগালি। চৌধুরি ঘরে ঢুকেই বুঝে গিয়েছিল, বিপদ কেটে গেছে। এইসব ক্ষেত্রে যা হয়, সে মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ডাক্তারকে সাক্ষি রেখে বললো, না ডাক্তার, তুমি নিজেই দেইখ্যা গেলা। নাইলে তো দশজোনের ধারে মোর কৈফিয়ৎ দেতে দেতে জান জেরবার অইয়া যাইতো। দেহছেন, মাগি কত্তোবড়ো খানকির খানকি, বেইশ্যার বেইশ্যা। এ্যাঁ, কোন হান দিয়া প্যাড্‌ বাজাইয়া আইয়া গেরস্থের বাড়ি এই কাণ্ড করইয়া বইছে।

এ্যারে বাড়িতে রাহন যায়? না, ও আইজই কোথাও যাউক্ গিয়া। মুই খারাপ মাইয়া মানুষরে বাড়িতে থাকতে দিতে পারমু না। যেহানে খুশি যাউক।

ডাক্তার তার কথার কোনো উত্তর দিল না। ধীরেসুস্থে পরীক্ষা নিরীক্ষা কিছু করে, ধাইয়ের কাছ থেকে জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে, বলল, আমার লগে আপনারে আবার একবার যাইতে অইবে। ওষুধ পত্তর কিছু দেওয়ার আছে। কিন্তু চোধ্রি মশায় এডা লইয়া এই কয়বার অইলো? মানইসে কিন্তু ঘাস খাইয়া চলে না। যাউক হেডা আপনে বোজবেন। ও এহানে থাকপে না থাকপে না, হেয়াও মোর দ্যাহার ব্যাপার না। টাহাডা দেন, আর লগে লয়েন, ওষুধ গুলা আনবেন। এট্টা ইনজেকশন দিয়াই যাই। বিশ্রামে রাখবেন অন্তত এক সপ্তাহ।

কত টাহা?

এক হাজার।

এক হা জা র? ডাক্তার তুমি মানুষ না চামার? হাজার টাহা দেতে পারমু না, এই দুইশো দেতে আছি, লও।

চৌধুরি মশায়, তয় বরং কাইলকেই দেবেন, বাজারে সবলোকের সামনে। ক্যান দেলেন হেডাও আমি কমু হ্যানে দশজনারে। আর হ। আমি চামারই, নাইলে এরহম চামারইয়া কাম-সামাল দেতে আই?

অগত্যা নিরুপায় এবং ক্রুদ্ধ চৌধুরি ভেতর থেকে টাকা এনে পুরো একহাজার টাকা ডাক্তারকে দেয়। ধাই বলে, অম্নে আমারডাও দিয়া দেন। রাইত অইছে।

তোমার আবার কী? তোমার তো কিছু করতে লাগে নায়, খালি আইছো, আর এটটু পাহাড়া দিলা, এইতো? হেয়া তো বিপদে আপদে পিরতিবেশীরা করেই, হ্যার লইগ্যা টাহা চায় কেউ?

ডাক্তাররে জিগায়েন, মুই কী করছি না করছি। বিপদ কাডইয়া গেলে হ্যার মাহাত্য কিছু বোজা যায় না, চোধ্রি মশায়। যায়েন, ঘর থিহা পাশ্শো টাহা আরো আনেন আর ছাপ জাগায় রাহেন! নাইলে ডাক্তারে যা কইলে, হ্যার থিহা এ্যাটটু বেশিই ক্যাচাল মুই যে করতে পারমু, হে ভস্সা মোর আছে। মুই কৈলোম বগলা ধোপাজির মাইয়া।—বগলা ধোপাজির নাম এককালে এ অঞ্চলে খুবই বিখ্যাত ছিল। সেও ধাই এর কাজই করতো। তবে সার্থক নামা। নামকরা লাঠিয়াল ছিল সে। লোকে বলতো দাই না 'নইগ্দা' লাঠি বাজ।

ধাই এর কথায় ব্যবহৃত যে সব শব্দ সম্ভার যীশুদা তার বর্ণনায় যথাযথ রেখেছিল, সেগুলো সঠিক বানানে লিখতে পারব না বলে উহ্য রাখলাম, তা বাংলা ভাষার অন্তর্গত অবশ্যই, কিন্তু তার অতি প্রাকৃত কুজ্ঝটিকা সরিয়ে অর্থগ্রহণ করা শিক্ষিত সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। ধাই আরও জানালো যে, পয়সাতো শুধু এটাই নয়, পয়সা চৌধুরিকে আরো দিতে হবে ক্রমশ। যদ্দিন না সন্নর একটা ব্যবস্থা হয়, এখানে সন্নর বিশ্রাম বা চিকিৎসা, ডাক্তার যেমন বলেছে, সেভাবে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু এরই মধ্যে যদি চৌধুরির 'কামবায়ু' পুনরায় চাগার দেয় তো মেয়েটা হয়তো মরেই যাবে। ধাই এর আর্জি, এইসব জেনেশুনে ডাক্তার বাবুও যেন তার পক্ষেই রায় দেন। সে চায় সন্নকে সে আজই তার বাড়িতে নিয়ে যাবে এবং ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই তার শুশ্রুষাদি করবে। সেজন্য উপযুক্ত ওষুধ, পথ্য ইত্যাদির খরচ চৌধুরিকেই দিতে হবে। নচেৎ — ? নচেৎ না বললেও চলে। সেটা যে ডাক্তারের ক্ষেত্রেও অর্শাবে একথাটাও ধাই পরিষ্কারই বলে দেয়। বলে, মুইতো সতারো ঘাডে জল খাওয়া মাইয়া মানুষ, মানুষ চিনি। বিশেষ করইয়া এইসব 'ছছইয়া মারানি' (অশৌচগামি) ভদ্দরলোকেগো মোর থিহা বেশি কেডা চেনে। কই যে, দুই ভদ্দর লোক এইহান দিয়া বাইর অইয়াই যে, ধাই মাথারিরে কায়দাকরণের শলা করবেন, হে চেষ্টাও য্যান্ না করেন। ভদ্দরলোকেগো সাথের পিরীত মুই ভালই জানি। হেথে কাম অইবে না। এ ছেম্‌ড়ি মোরে ধম্ম মা ডাকছে, হেয়া ছাড়া, ওডা মোর হাতেই অইছেলে, এ মাইয়ারে ছাড়লে মোর ধম্ম থাহেনা। সুতরাং তারা যেন বুঝে কাজ করে।

চৌধুরি বিধ্বস্ত। ডাক্তার বিড়ম্বিত। কেননা, ধাই তার অনেক কুকীর্তিই জানে। সুতরাং তার এই অদ্ভুত পূর্ব রণকৌশলের কাছে তারা হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

কুড়ি

তারপরের কাহিনীও বেশ বিস্তৃত। কিন্তু রাত বেশ গভীর হয়েছে। উপরন্তু বার কয়েক তলব পাঠাবার পর শ্রীমতী সন্ন স্বয়ং হাজির হয়েছে ঘরে ফেরার ডাক নিয়ে। যীশুদা তাই দ্রুত তার কাহিনীটা শেষ করে। কীভাবে ধাইমা সন্নকে সুস্থ করে তুলে, হক আর ধলুর সহায়তায় এই আশ্রমে এনে দুজনের কণ্ঠিবদল বিয়ের ব্যবস্থা করে, বস্তির এই বাড়িতে তাদের সংসার গুছিয়ে দেয়, কীভাবে হক যীশুদার দাদার কাছ থেকে সই করা স্ট্যাম্প পেপারটা আদায় করে, ইউনিয়ন কাউন্সিল মারফৎ তার প্রভাব খাটিয়ে যীশুদাকে ন্যায্য মূল্য পাইয়ে দেয়, কীভাবে ধাইমার ইচ্ছানুসারেই যীশুদা আর সন্ন, কণ্ঠিবদলের পর, নতুন বাসা পাওয়ার আগে কয়েকটা দিন ঐ শশীনাথ ধোপার বাড়িতে, ধলুদের কাছাকাছি ছিল, তারপর সেই আবার ডাকাতি ইত্যাদি ঘটে, সব সংক্ষেপে বলে শেষ করে যীশুদা। শেষ দিকটায় আমাদের খেতে যাবার জন্য ডাকতে এসে সন্নও বসে যায় কাহিনীটা শেষ হবার অপেক্ষায়।

যীশুদা বলে, এই হইলো মোগো জীবনের গপ্পোকথা। আইজ আর হেসব কিছু মনে রাহি নাই। কথা ওড্‌লো, হেইর লইগ্যা কইলাম। ক্যাওর উপার আইজ আর মান, অভিমান, রাগ বিদ্বেষ নাই। মোরা সবকিছু ছাড়াইয়া বৈষ্ণব অইছি। মোগো ধম্মে, রাগ দ্বেষ রাখথে নিষেধ আছে। গুরু গোসাইরা কইয়া গেছেন, গাছের ল্যাহান সহ্য শক্তি আর ফুলের ল্যাহান নরম হইতে হইবে। বেয়াকে হেয়া যে মানে, হেমন না। মোরা মানার চেষ্টা করি। মনে মনে নাম জপ করি, হাতে কাম করি আর কইলজার মইদ্যে প্রার্থনা চলে, বেয়াকে সুখি হউক। কেউ য্যান ক্যাওর শত্তুর না অয়। মোরা জানিনা এই যে জ্বলনডা জ্বলাইয়া মোরা এইহানে পৌঁছাইছি, এয়ার তাৎপজ্জ কী? তয়, মুই এটটা জিনিস বিশ্বাস করি,

আমি খাডি সোনাই পাইছি শ্যাষ তক্, হারাজীবন জ্বলাইয়া পুরইয়া আমার সন্ন খাডি সোনা অইয়াই আইছে মোর ধারে। জয় গুরু।

'জয় গুরু' বলে যীশুদা তার যন্ত্রণার পাঁচালি শেষ করে। তিনবন্ধু বসে নিশ্চুপ। ঘাটলার শেষ ধাপে গিয়ে সন্ন দাঁড়িয়েছে যেন কখন। কেউই কোনো কথা বলছি না। যেন কেউ সামান্য একটু শব্দ করলেও এই নিটোল পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মৌন ভেঙে যাবে। একটা অপ্রীতিকর কেজো কোলাহল নষ্ট করে দেবে প্রকৃতিব এই মহা আয়োজন। জ্যৈষ্ঠের নির্মল আকাশটা কী প্রকাণ্ড হয়েই না মাথার ওপর বিরাজ করছে, আর তার মাঝখানে থেকে রুপোর থালার মতো চাঁদটা দুধ জ্যোৎস্নার বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে চরাচর। সামনে বিশাল দিঘিটার জলের রঙ জ্যোছনার আলোতে সঠিক বোঝা না গেলেও, অনুমানে নীলই মনে হয়। ইতঃস্তত শালুক ফুলগুলো ফুটে আছে যেন পদ্ম। তাদের রঙ সাদা নয়। মেজেন্টা বলে মনে হয় এই রঙটাকে। নীল সায়রের শালুকের আবেষ্টনীতে পেছন দিক থেকে দেখা সন্নর অবয়বের 'সিল্যুয়েট' গোটা নিসর্গকে আরও পরিপূর্ণ ও নিটোল করেছে।

খুব সন্তর্পণে, কোনো কথা না বলে উঠে, পায়ে পায়ে সন্নর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। সন্ন বলে, দ্যাখছেন কী সুন্দার! আমার মতো পাপী মানুষও যহন এই রহম জাগায় আইয়া দাড়াই, মনডা ভরইয়া যায়। তহন আর আদোকাডির পাতার ঘর ভাইঙ্গা যাওনের লইগ্যা কোনো আপশোষ থাহেনা। হারা জীবনে যে কষ্ট লাঞ্ছনা পাইছি, হে সবও আর মনে পড়ে না। ক্যারো উপর রাগও নাই। গুরু বেয়াকরে ভাল রাহুক, যেমন আমরা আছি।

-যীশুদা মানুষটা বেশ ভাল, না রে?

-ভালতো অনেকেই অয় সোংসারে। হে অইলে বড়ো, এত বড়ো যে হারাজীবন ধরইয়া যদি মাপতে থাহি, তমো ফুরাইয়া ফ্যালাইতে পারমু না। গুরু মোর জীবনডারে সাথক করছে। অবুজ বয়সে যতো ভুল করছি, হেয়া শোধরাইয়া দেছে।

ফিরে আসার সময় হক আর আমি দু একটা চটুল কথা বলে পরিবেশের গাম্ভীর্যটা একটু তরল করতে চাইছিলাম। সন্নকে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যারে, যীশুদা কী এহনো তোরে আগের মতো কয়, এক গেলেস জল দে দেহি মাগো। সন্ন খুব সপ্রতিভ জবাব দেয়, কয়না আবার,

তিষ্টা তো মেডে নায়। হেয়ার লইগ্যা, কহনো কয়, মাগো, কহনো বুইনডি, কহনো হেডাতো বোজ্জেনই।

যীশুদার দিকে তাকাতে সেই মুখ ঠোঁট টেপা হাসি নিয়ে সে বলে মা, কমু কী তয়? মা কও, বুইন কও, আর বৌ কও, ঐতো সব। য্যারা ভাবের মানুষ, হ্যারা এই ভাব বোজে। তোরা পোলাপান বুজবি ক্যামনে? আর তিষ্ণা? হেডা যদি মিডইয়াই যায়, হেলে আর থাহে কী? তয়তো ভবলীলা শ্যাষ। ভবলীলা ছাড়া আতো কোনো লীলা নাই। মোরা পরপারের লীলা কিছু জানি না।

দিঘির শালুক ফুল গুলো যেন এবারের সফরে এসে পাওয়া একেকটা মুখ। সেগুলো বিগত দিনের মুখ গুলোর সঙ্গে মিলেমিশে একটা মেলার সৃষ্টি করে যেন অতীত বর্তমানের যোগসূত্র তৈরি করতে চাইছে। কিন্তু হায়! আজকের এই চমৎকার অনুভবের বর্তমানটাতো, রাত পোহালেই অতীত হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে দুঃখ নেই। তখনতো আবার অন্য ভবলীলা, তার পরম্পরাতো চলতেই থাকবে।